বাংলার আধুনিক গল্প।

— প্রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পাদিত

অতীত হইতে ভাবীকালের
লেখকদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি, এম, লাইব্রেরী

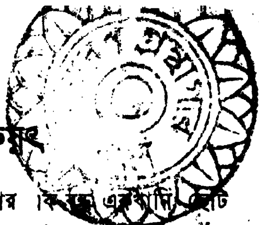
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল পাব্লিশার্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা।



সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল আমার কোনো বন্ধু একখানি ছোট গল্পের সঙ্কলন প্রকাশ ক'রতে উদ্যোগী হন এবং উক্ত বইখানির জন্য বাঙ্‌লার বিভিন্ন রস-রচনাকুশল প্রথিতযশা কথাশিল্পীদের একটি ক'রে শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহের ভার দেন আমার উপরে। আমিও সাগ্রহে সেই গুরুভার গ্রহণ করি।

সঙ্কলনখানি আজ থেকে প্রায় এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হ'বার কথা ছিল। অথচ, অদ্যাবধি তা' সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। তাই সে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলা দরকার।

প্রথমেই ব'লে নিচ্ছি যে, এটা কোনো বিশিষ্ট মতবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সঙ্কলন নয়। ধর্মগত, সমাজগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত, পরিবারগত দলাদলি, সাহিত্যগতও যে ছিল না তা' নয়। দলাদলি করা আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। অতি প্রাচীনকাল থেকে তা' চ'লে আসছে। কিন্তু সর্ববিষয়েই দলাদলির প্রভাব বর্তমান যুগে যে-রূপ নিয়ে বিস্তারলাভ ক'রেছে, এমন ধরণের কখনও ছিল ব'লে মনে হয় না। তাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা মতবাদ, সাহিত্যের স্বাস্থ্যকর প্রচারের পক্ষে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে ব'লেই আমার ধারণা। সাহিত্যের এই মত-বিরোধ, আমাদের সাহিত্যকে কোন্ পর্যায় নিয়ে ফেলবে তা' বলা আজ শক্ত; আর সে বিচারের সময় বোধ হয় এখনও আসে নি। তাই আমাদের এই সঙ্কলনখানি সর্বদলীয় চিন্তাশীল প্রবীণ ও নবীন লেখকদের বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রসূত রচনায় সমৃদ্ধ ক'রবার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে জানাতে হ'চ্ছে যে, স্থানাভাবে এবং অনিবার্য কারণে কোনো কোনো খ্যাতনামা লেখককেও বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে' পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধ অবিরাম গতিতে চ'লেছিল, তার তাণ্ডব-নৃত্যের পদধ্বনি আমরা স্বকর্ণে শুনেছি। স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদীদের লালসাকে চরিতার্থ কর্তে গিয়ে পৃথিবীর সবই ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। অবশ্য বিশ্বগ্রাসী সেই যুদ্ধ আজ আর নেই। স্থায়িভাবে কি না ব'লতে পারব না, তবে

সাময়িকভাবে আপাততঃ মিটে গেছে সত্য—কিন্তু জিনিষের মূল্য আজও কিছু-মাত্র কমে নি। কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না, ছাপাখানায়ও প্রচুর ভিড়। তাছাড়া অকস্মাৎ সমগ্র দেশ-ব্যাপী সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য নানাপ্রকারের বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হওয়ায়, গ্রন্থখানির অবয়ব আর অধিক বর্ধিত করা সম্ভব হ'ল না এবং প্রকাশেও এত বিলম্ব হ'য়ে গেল। অপ্রত্যাশিত এই বিপদজনক অবস্থার মধ্যে কাজ করার ফলে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটিও যে না রইল তা' নয়। আশানুরূপ সুন্দর ক'রে একে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হ'ল না।

বহুবার বহু তাগিদের পরেও গল্পগুলি ঠিক সময় মত সংগ্রহ ক'রতে পারি নি। তাই লেখকদের লিপিকুশলতার বিচার ক'রে, বা প্রবীণতার অনুপাতে, কিম্বা নামের আদ্যক্ষর অনুসারে না সাজিয়ে, গল্পগুলি যেমন পাওয়া গেছে ঠিক সেই ভাবেই পরের পর সাজিয়ে মুদ্রিত হ'ল।

আর একটা কথা, এই সঙ্কলনের প্রথম গল্প "সনাতন" যেখানে ছাপা শেষ হ'য়েছে, তার পরপৃষ্ঠাটি একেবারে শাদাবস্থায় বাদ রেখে দিয়ে আরম্ভ হ'য়েছে পরের গল্প। জিনিষটা দেখতে খুবই বিশ্রী হ'য়েছে আর হ'য়েছে সেটা ছাপাখানার অনবধানতার জন্যই; অথচ এই দুর্দিনের বাজারে ওই ফর্মাটা আবার নতুন ক'রে ছাপা সম্ভব হয় নি। তাই অজ্ঞাত এই ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা চাইছি।

পরিশেষে—যে সমস্ত প্রতিভাশালী খ্যাতনামা চিন্তাশীল কথাশিল্পীদের লেখনী স্পর্শে গ্রন্থখানির কলেবর ধন্য হ'য়েছে তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ব্লক্ তৈরী ক'রে দিয়েছেন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পাণীর পক্ষে শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত। এঁদের সকলকেই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাছাড়া, প্রকাশক বন্ধুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় যে ভার গ্রহণ ক'রেছি তাতে আমার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছি কতটুকু এবং নানারকমের অপরিহার্য অসুবিধার মধ্যেও কতটুকু কৃতকার্য হ'তে পেরেছি তা' আমার চাইতে বাঙলার রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকাগণই ব'লতে পারবেন ভালো।

আশাকরি সহৃদয় সুধী-সমাজ দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝে এবং চারিদিক বিবেচনা ক'রে আমাদের এই অকৃত্রিম চেষ্টালব্ধ সঙ্কলনখানির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা ক'রবেন।

ইতি—

সম্পাদক।

ভূমিকা

বঙ্কিম হইতে আজ পর্য্যন্ত ছোট গল্পের জীবন-ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আর তা' লিখিতেও বসি নাই। তবে তাহার ক্রমোন্নতির কথা আমি অতি সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব তাহাই এখানে বলিবার চেষ্টা করিব।

ছোট গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে গোড়াতেই আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবকে মানিয়া লইয়া দেখিতে হইবে, বাঙালী শিল্পীদের হাতে তাহা কতখানি পুষ্টিলাভ করিয়া কি ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেইদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রথমেই আমাদের চোখে ঝলক্ দেয় রবীন্দ্রনাথের শতমুখী প্রতিভার অসামান্যতা—যেখানে ছোট গল্প তাহার বাল্য আর কৈশোর অতিক্রম করিয়া একেবারে আসিয়া পৌছিয়াছে যৌবনের পূর্ণতায়। সেই পূর্ণতার মাঝখানে শরচ্চন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী আমাদের সমগ্র পাঠক সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। প্রাথমিক এই যুগে আঙ্গিকের কাহিনী-প্রাধান্য, যাহার চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা প্রভাত কুমারের মধ্যে দেখিতে পাই। তখনকার দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল বেদনাময় এক সহানুভূতি আর ছিল সাধারণ মানবতাবোধ। তারপর হঠাৎ ছোট গল্পের একটা মোড় ফিরিল প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায়—যেখানে ভারের চাইতে ধারটাই হইল বেশী। তীক্ষ্ণধার বুর্জোয়া অস্ত্র বিলম্বিত তাল, কাহিনী-প্রধান আঙ্গিককে যেন চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিল এবং বক্তব্যে নিক্ষিপ্ত হইল সেই পরিমাণ বিদ্রূপ, কশা আর বিক্ষুব্ধ আঘাত। আঙ্গিক আর বক্তব্য দু'দিক হইতেই সূত্রপাত হইল অতি আধুনিক এই যুগের। এরই মধ্যে আবার জটিলতাও যে না বাড়িল তাহা নহে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া যখন বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ এক নূতন মানস মাথা তুলিয়া উঠিতেছে—তখন বাঙলার শিল্পীদের কাছেও আসিল তাহার আহ্বান। তীক্ষ্ণধার বুর্জোয়া আঙ্গিক আর নূতন মানস এই লইয়া শুরু হইল সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা। নানান্ জনের হাতে চলিল তাহার পরীক্ষা ও নিরীক্ষার কাজ, আজও তাহা চলিতেছে। চলিতেছে নানান্ দিকে, নানান্ ভাবে। আমাদের সঙ্কলনখানি এই যুগের।

এ যুগের প্রতিভার বিরাটত্ব কোথায়ও দেখা যাইতেছে না—এই অভিযোগই বর্ত্তমানে অতি সাধারণ এক মন্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি ক্ষুদ্রত্ব কোথাও দেখা যাইতেছে?

আমার মনে হয়, না। ক্ষুদ্রত্ব এর কোথায়ও নাই। বরং আধুনিক শিল্পীদের পরীক্ষা ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া চলিতেছে বিক্ষুব্ধ এক জন-সমাজের সঙ্গে অনাগত এক বৃহত্তর কল্যাণের সমন্বয় সাধন। এ যুগের বিক্ষুব্ধ গণ-মানস এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই—যাহার বিরাটত্বের প্রতিফলন তাই সাহিত্যে এখনও শুধু আভাষ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সেইদিক হইতে বলিতে পারা যায়, এ যুগ আর এক যুগের অভিযাত্রী-কাল,—নূতন কালের নব নির্ম্মাণশালা।

বোধহয়, শিল্প-তত্ত্ব লইয়া বিরোধ তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট করিয়া দেখিতে গেলে, দলাদলির অন্ত নাই। অতীত ও ভাবীকালের বহু দৃষ্টিভঙ্গী, রস ও রাজনীতি, রোমান্টিক্ ও রিয়ালিষ্ট, সব কিছু মিলিয়া নানান্ বিরোধী ধারার মধ্যে দল ছাড়াইয়া যেটি বড় হইয়া উঠিয়াছে—সে হইল বিরোধ-মুখর এই যুগের বিচিত্র এক সমগ্রতা। এর মধ্যে কোন্ ধারা টিকিবে—কোন্টা টিকিবে না, একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া এই সঙ্কলনে তাহার 'রায়' আমি দিতে চাহি নাই। শিল্পীর সৃষ্টিতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াই সমস্ত ধারাগুলিকে এক সঙ্গে করিয়া একটি যুগের সমগ্রতাকে আমি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমানের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া ইহা হইতে প্রগতির ধারাটিকে চিনিয়া লইতে যেমন কষ্ট হইবে না, তেমনই কষ্ট হইবে না বিদায়ী এক যুগের রোমান্টিক্ সকরুণতাকে চিনিতে। শিল্পীর নিষ্ঠায়, সৃষ্টির আবেগে যখনই তাহা সার্থক হইয়াছে—তখনই তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রশ্ন জাগিয়াছে, কিন্তু পরমায়ু? নাই বা থাকুক তাহার পরমায়ু—তবু এটা নির্ম্মম সত্য যে, শক্তি হিসাবে তাহার অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান। প্রবীণ ও নবীনদের সহযোগিতায় সেই অস্তিত্বের সত্যকে যেমন পাইয়াছি, তেমনই তুলিয়া ধরিয়াছি বাঙলার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে।

অক্ষয় তৃতীয়া
[illegible] বৈশাখ, ১৩৫৪
[illegible] যশোহর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

সনাতন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, রোগটা কি ?

ননীবাবু প্রবীণ চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর বংশগত বিদ্যা, তিন পুরুষ ধরিয়া এ বংশের প্রত্যেকেই চিকিৎসক হিসাবে শুধু জীবিকাই নয়, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। এ বিদ্যার সঙ্গে ইহাদের একটা যেন জন্মগত পরিচয় আছে। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত নাড়ী দেখিতে জানে। আকস্মিক আপদ-বিপদে দুই চারিটা টোট্‌কার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহারা দিয়া থাকে। ননী ডাক্তার কবিরাজি ও ডাক্তারি দুই জানেন। ধীর গম্ভীর লোক, এ অঞ্চলে লোকে বলে—ধন্বন্তরি। অবশ্য ননী ডাক্তারের হাতে সকল রোগীই যে বাঁচে তাহা নয়, তবে ননীবাবু ভুল করেন না ; ক্ষেত্রবিশেষে সসম্ভ্রমে মৃত্যুকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান।

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, রোগটা ? কালরোগ আর কি ! কালরোগ !

হ্যাঁ। বয়স যে অনেক। পঁচাশির কম নয়। কাল মানে বয়সই এখন ব্যাধি। ননীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

শিবনাথের বাড়ীর চার পুরুষের চাকর।

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়ীতে বাহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ীর ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথার

এক মাথা কোঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ গঠন, গরুর রাখালি করিবার জন্য বাহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন, কিন্তু মোটাসোটা চেহারার জন্য কর্ত্তা নাম দিয়াছিলেন, কুমড়ো।

ছোট ছোট চোখে অনেকক্ষণ কর্ত্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, বাবুমশাই! কর্ত্তাবাবু!

কি—রে?

কর্ত্তার পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা কুমড়োর মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল, অদ্ভুত, বিস্ময়কর, দুর্ব্বোধ্য! কুমড়ো বিহ্বল করুণভাবে সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমাকে মারবা না কত্তাবাবু?

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ও সস্নেহে হাসিয়া কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, না, মারব কেন?

ঘরের ভেতর ভ'রে রাখবা না?

না, না। বরং ভাল ক'রে কাজ করলে বকশিস দেব।

বসকিস দেবা? কি দেবা?

কি নিবি?—কর্ত্তা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

চাপরাসীর লাল শালুর পাগড়িটা দেখাইয়া কুমড়ো বলিয়াছিল, অমুনি লাল টুপি একটো আমাকে দিও।

ঠিক সেই সময়েই বাড়ীর ঝি আসিয়া কর্ত্তাকে দেখাইয়া সসম্ভ্রমে ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে জানাইয়াছিল, বাজার যাইবার জন্য লোক প্রয়োজন, লবঙ্গের অভাব পড়িয়াছে। পান সাজা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চাকরটা কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, চাপরাসীরও কার্য্যভার লইয়া বাহিরে যাওয়ার কথা, কর্ত্তা কুমড়োকেই পাঠাইয়াছিলেন, লবঙ্গ নিয়ে আয় চার পয়সার, বুঝলি?

কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা হাতে কুমড়ো বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়াছিল, এই ল্যান গো।

ঠোঙায় এক ঠোঙা নুন।

বাড়ীতে হাসির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।

গিন্নী সেবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, খেতে ঝাল লাগে, লবঙ্গ, লবণ নয়, বুঝলি ? লঙ্গ। লঙ্গ।

দ্বিতীয় বারে আরও একটা বড় ঠোঙা হাতে কুমড়ো ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার ঠোঙায় এক ঠোঙা লঙ্কা। সেবার আর হাসির ধ্বনি বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কাছারি-বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কুমড়ো বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, বললা যি, ঝাল!

কর্ত্তার খড়ম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এত উচ্চ হাসির জন্য বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া উচ্চ হাসিতে তিনিও গোটা পাড়াখানা সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরেও সনাতনের সে কথা এ বাড়ীতে সকলেই জানে; পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আরও একটা কথা—সেই প্রথম দিনেরই কথা—বাঁচিয়া আছে। বাড়ীর গরু-বাছুর গোয়ালে বন্ধ করিয়া, সনাতন বাড়ী যাইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া সরবে কাঁদিয়াছিল, ও—মাগো! ওগো—মাগো!

কর্ত্তা নিজে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কে মেরেছে ?

হাতের মুঠোয় চোখ মুছিতে মুছিতে কুমড়ো বলিয়াছিল, 'আনার' হয়ে যেল যি!

কি ?

আঁদার।

আঁধার ?

হ্যাঁ, আমি কি ক'রে বাড়ী যাব ? 'মোলকিনী' পুকুরের পাড়ে ভূত আছে যি! ভাগাড়ে গো-দানা আছে গো!

কর্ত্তা হাসিয়া চাপরাসী সঙ্গে দিয়া কুমড়োকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সনাতনের সঙ্গে সে কথা আজও বাঁচিয়া আছে। তাহার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ভূতের আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছে।

শুধু ভূত নয়, দেবস্থান এবং দেবতাকেও তাহার ভয় ছিল। বিষম, সে ভয় আজও তাহার যায় নাই। আর একটা নূতন ভয় তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইল চাকরির কয়েকদিন পরেই।

বড় বাবু অর্থাৎ কর্ত্তাবাবুর ছেলে শিবনাথের পিতামহ কাছারিতে বসিয়া একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, মাতব্বর প্রজাটি কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ফেলিল। কুমড়ো কয়েক আঁটি খড় লইয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে থমকাইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা গুপ্ত-বহ্নির উত্তাপের মত তাহাকে স্পর্শ করিল।

বড় বাবুর থমথমে মুখ, মোড়ল মহাশয়ের সোজা বসিবার ভঙ্গি এবং সতেজ কণ্ঠস্বর তাহাকেও উত্তেজিত ও কৌতূহলী করিয়া তুলিল। সকল কথা মনে নাই, কিন্তু ঘটনাটার শেষ দুইটা কথা সনাতনের বার্দ্ধক্যজনিত বধির কানে আজও বাজে—পারবে না ?

সমান তেজে প্রজাটি উত্তর দিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে বড় বাবুর এক লাথিতে এত বড় মানুষটা উল্টাইয়া দাওয়া হইতে একেবারে নীচে আসিয়া পড়িল।

কুমড়োর সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পলাইয়া আসিল। বড় বাবুর প্রতি দুরন্ত একটা ভয় তাহার বুকে চিরদিনের মত বাসা বাঁধিয়া বসিল। দীর্ঘদিন চাকরির মধ্যে সে ভয় তাহার আর যায় নাই।

এই কয়টি ভয় বাদ দিয়া সনাতনের দুর্দ্দান্ত সাহস। বাবুদের 'উদাসী ডাঙা'য় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত প্রান্তরে গো-চারণের মাঠ—সেখানে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া সাপ যথেষ্ট। গোচারণের ছোট পাচনি লাঠি ও ঢেলার সাহায্যে কত সাপ যে সে মারিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শুধু মারাই নয়,

সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে নিজেই সাপকে বন্দী করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। নেকড়ে জাতীয় হিংস্র হোঁড়োলের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া হোঁড়োলের বাচ্চাও সে ধরিয়া আনিয়াছে।

একবার বড় একটা নেকড়ে একটা বাছুর আক্রমণ করিয়াছিল; তখন অবশ্য কুমড়ো আর কুমড়ো নয়, সে তখন আঠারো—উনিশ বছরের কাঁচা জোয়ান; দৈর্ঘ্যে প্রায় সাধারণ মানুষের হাতের সওয়া চার হাত অর্থাৎ ছয় ফিটেরও বেশি। পাচনিটা লইয়াই সে নেকড়েটার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নেকড়েটার টুঁটির উপর যখন সে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত; সে ক্ষত চিহ্ন তাহার লোল চর্ম্ম দেহে আজও অক্ষয় হইয়া আছে। জানোয়ারটাকে সে কাঁধে তুলিয়া লইয়া আসিল। চামড়াটা ছাড়াইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মনিব বাড়ীর চাপরাসীটা সেটাকে লইয়া গিয়া হাজির করিল কাছারিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক পড়িল।

কর্ত্তাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। বলিলেন, বেটা অসুর! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন নায়েবকে, বেটাকে একটা পাগড়ি কিনে দাও তো। আমার মনে আছে, প্রথম দিনই বেটা আমার কাছে লাল পাগড়ি চেয়েছিল।

বড়বাবু গম্ভীর ভাবে হুকুম দিলেন, আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাক, যে রকম কেটে গেছে, আর নেকড়ে টেকড়ের দাঁতে বিষ আছে শুনেছি।

সনাতন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া আড়াল পড়িতেই একেবারে সোজা দৌড় মারিল। বাপ রে! ডাক্তার ছুরি চালাইয়া দিবে, আষ্টে পৃষ্টে ন্যাকড়ার ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিবে, বাপ রে! পলাইয়া আসিয়া সে একেবারে গোয়াল ঘরের মাচায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। চাপরাসীটা বার দুয়েক ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। পাখীর কলরবে সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া মাচা হইতে চুপি চুপি নামিয়া গরুগুলোকে গোয়ালে পুরিয়া দিয়া বাড়ী পলাইল। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, সম্মুখে মোলকিনী পুকুরের পাড়ের বট-গাছটায় ভূত আছে। ঝাঁকড়া অন্ধকার বটগাছটার পাশেই বাঁশের ঝাড়, ভূত বাঁশ হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, কেহ সেটাকে পার হইতে গেলেই তড়াক করিয়া বাঁশটা সোজা উপরে উঠিয়া যায়; বাঁশের সঙ্গে মানুষটাও ওই উপরে উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া মরে। শতেক ছলনা ভূতের, ভাদ্র মাসের পাকা তাল হইয়া গাছ হইতে একেবারে নির্ঘাত ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। কখনও বা হঠাৎ একেবারে তালগাছের মত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পথের উপর দাঁড়ায়। এই তালগাছের মত মূর্ত্তিকেই সনাতনের বেশি ভয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? এ পথে তো তাহাদের জাতি—জ্ঞাতি ছাড়া বড় কেহ যায় না। আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ এই অংশটা পার হইয়া তবে তাহাদের পল্লী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সনাতন কাহারো সঙ্গ পাইল না। তাহাদের অন্য সকলে এতক্ষণে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজতলার বট-গাছটির নীচে ঢোল লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈশাখে বোলান গান, জ্যৈষ্ঠে পাঁচালি, আষাঢ়ে পঞ্চমী হইতে নাগ পঞ্চমী পর্য্যন্ত মনসার ভাসান, ভাদ্রে ভাদু, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত পাঁচমিশালী, চৈত্রে ঘেঁটু।

সনাতন নিজে গান গাহিতে পারে না। কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু উৎসাহ তাহার প্রবল। কোনরূপে সে বুক বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক করিল, বটগাছ তলাটার আগে হইতেই সে চোখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মোলকিনীর পাড়ে আসিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ সে আপনার অজ্ঞাতসারেই বার বার খুলিয়া ফেলিতেছিল। ও কে? বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকি দিয়া কেহ হৃৎপিণ্ডটাকে কুটিতেছে! সাদা কাপড় পরা ছোট আকারের ও কে ওখানে ঘুরিতেছে! সে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, কে?

মূর্ত্তিটা এতক্ষণ বোধ হয় তাহাকে দেখে নাই, তাহার অদ্ভুত বিকৃত

স্বরের সাড়ায় এবার সে ঘুরিয়া খানিক আগাইয়া আসিয়া খিল খিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। সনাতনের চেতনা লোপ পাইতেছিল, প্রাণপণে সে চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মূর্ত্তিটা আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া নাকী সুরে বলিল, আঁমি ভূঁত। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে একটা অতি উত্তেজনাময় উষ্ণ চেতনার প্রবাহ ভয়ের হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া গেল।

নন্দ! ভূত নয়, নন্দরাণী—তাহাদেরই সেই ডাকাবুকো মেয়েটা—কষ্টি পাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম—সেই মেয়েটা! ভয় সনাতনের কোথায় চলিয়া গেল, সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; বিপুল উত্তেজনাময় উল্লাসে সেও হো—হো করিয়া হাসিয়া নন্দর দিকে ছুটিল। মুহূর্ত্তে মেয়েটাও ছুটিল। সুদীর্ঘ সনাতন, আর নন্দ ছোটখাটো মেয়েটি, সে কতক্ষণ তাহার আগে আগে ছুটিবে! সনাতন লম্বা হাত বাড়াইল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশল এই মেয়েটার—চট করিয়া সে পাশ কাটাইয়া এমন মোড় ফিরিল যে, সনাতন শূন্য হাত বাড়াইয়া গতির আবেগে চলিয়া গেল—নন্দ অন্যদিকে সরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনই একবার নয়, বার বার। অবশেষে নন্দকে সে যখন ধরিল, তখন নন্দ এলাইয়া পড়িয়াছে। সনাতন হাঁপাইতেছিল। তবুও সে শিশুর মত নন্দর ছোট দেহখানি দুই হাতে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া বলিল, দি, ফেলে দি আছিড়ে?

সুকৌশলে ঈষৎ ঝুঁকিয়া নন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কই, দে দেখি।

ভাদ্র সন্ধ্যায় নন্দ তালের খোঁজে আসিয়াছিল।

এই নন্দকেই সে বিবাহ করিল। সেও একটা কাণ্ড।

নন্দর বাপ পণের দাবি করিল অনেক—এক কুড়ি পাঁচ টাকা।

পরের দিন নন্দকে আর পাওয়া গেল না। সে এক হৈ—চৈ ব্যাপার।

সনাতন কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে মনিব বাড়ীতে কাজ করিতেছিল। ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে থানা পুলিসকে লোকে এড়াইয়াই চলিত, আইন—কানুনও জানিত না। নন্দর বাপ-মা বড় বাবুর কাছে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

বড় বাবু কড়া লোক, সূক্ষ্মবিচারক; কর্ত্তাবাবুর সব তাতেই হাসি। আজ্ঞে হুজুর, ওই—ওই শালার কাজ।

বড় বাবু হুকুম দিলেন, ডাক তো বেটাকে। কিন্তু সনাতন তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চাপরাসীটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে কোথাও পেলাম না। সবিস্ময়ে বড় বাবু বলিলেন, আরে, এই তো ছিল। একান্ত নিরুপায় ভঙ্গিতে চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম।

ঠিক এই সময় কর্ত্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলেন, সে বেটা অসুর গেল কোথায়?

এই ছিল, কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্ত্তাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ীর বাগানের গাছগুলোর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন গোয়াল বাড়ীর দিকে। গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, এই বেটা অসুর!

গোয়ালের মাচার উপর খস খস শব্দ হইতেছিল, শব্দটা থামিয়া গেল।

এবার কর্ত্তা ঈষৎ কঠোর স্বরে ডাকিলেন, সনাতন!

মাচার উপর হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন দাঁড়াইল।

কর্ত্তা আবার একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই হারামজাদী হাড়িনী, নাম মাচা থেকে।

বিড়ালীর মত কড়িকাঠ আঁকড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এবার নন্দ লাফাইয়া নামিল।

কর্ত্তা বলিলেন, আয়।

নিঃশব্দে পোষা জানোয়ারের মত কর্ত্তাবাবুর পিছনে পিছনে কাছারিতে

আসিতেই নন্দর বাপ-মা দারুণ ক্রোধে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। বড় বাবুর চোখ দুইটাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সনাতন যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল। কর্ত্তাবাবু গম্ভীর স্বরে নন্দর বাপ-মাকে বলিলেন, চেঁচাস নি। তারপর নায়েবকে বলিলেন, পঁচিশটা টাকা আমায় দাও তো।

বড় বাবু প্রশ্ন করিলেন, আজ্ঞে?

পঁচিশ টাকা! কর্ত্তাবাবু নায়েবের দিকে চাহিলেন।

নায়েব বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিল। কর্ত্তাবাবু নন্দর বাপকে ডাকিয়া বলিলেন, নে, গুনে নে। আজ রাত্রেই বিয়ে দিতে হবে, বুঝলি?

বিবাহের পর সনাতন গোল বাধাইল। যে সনাতন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনিব বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত, সেই সনাতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ী পলাইতে আরম্ভ করিল। সনাতন এই আছে এই নাই।

শুধু তাই নয়, সেদিন চাপরাসীটা সনাতনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সনাতন তাহাকে বেশ ঘা-কতক লাগাইয়া দিল। ইহার পর তিন চারজন চাপরাসী গিয়া সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া আসিল।

বড় বাবু তাহাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কর্ত্তাবাবু কি সুনজরেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে দণ্ড মাপ করিয়া বলিলেন, দে, নাকে খত দে বেটা শুয়ার।

মাটির উপরে নাক ঘসিয়া সনাতন চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত নাকটা দেখিয়া এবার বড় বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খবরদার, এমন কাজ আর যেন করবি না।

সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ছেলাম না বাড়ীতে, প্যায়দা কেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছিল মশায়?

বড় বাবু এবার কঠিন দৃষ্টিতে চাপরাসীটার দিকে চাহিলেন। কর্ত্তাবাবু বিচিত্র মানুষ, তিনি এক কথায় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া বলিলেন, তোর

বউকেও আজ থেকে কাজ করতে হবে এখানে, বুঝলি? সকাল বেলা থেকে খোকাকে নিয়ে থাকবে। আর দুপুর বেলায় তুই গরু নিয়ে যাবি মাঠে, ঝুড়ি নিয়ে বউ যাবে তোর সঙ্গে, গোবর কুড়িয়ে মাঠে জড়ো করবে, বুঝলি? দুবেলা খেতে পাবে, বছরে পুজোর সময় একখানা কাপড়।

সনাতন উল্লাসে যে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। গোয়াল বাড়ীতে আসিয়া বড় মহিষটার গলা ধরিয়া দশটা চুমা খাইল। খানিকটা নাচিল, ভেড়ার পালের মেড়াটার সঙ্গে ঢুঁ খেলিয়া উপর হাতের পেশীতে কালসিটে পড়াইয়া ফেলিল। আঃ, কর্ত্তাবাবুকে কাঁধে করিয়া সে যদি নাচিতে পাইত! অথবা বাবুর পায়ের তলাটা যদি জিব দিয়া চাটিতে পাইত! সে ছুটিয়া গিয়া নন্দকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

অতর্কিত আকর্ষণে নন্দ বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সনাতন তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

ইহার পর নন্দ সকাল হইতে বড় বাবুর খোকাকে—শিবনাথের বাপকে লইয়া বসিয়া থাকিত, খেলা দিত। সনাতন কাজ করিত, মধ্যে মধ্যে খোকাকে কাঁধে লইয়া নাচিত, কখনও কখনও খোকার পিঠে মৃদু মৃদু কিল চড় মারিত, কান মলিয়া দিত। বলিত, দু-চার ঘা মেরে রাখি নন্দ; বড় হ'লে তখন তো চোখ লাল করবে, দেবে ক'ষে জুতোর বাড়ি।

নন্দ হাসিত মৃদু হাসি, সনাতনের হাসি অট্টহাসি।

দুপুরে নির্জ্জন উদাসীর প্রান্তরে সনাতন বটগাছতলায় বসিয়া থাকিত; নন্দ তাহার পাচনি লাঠিটা লইয়া গরু-মহিষগুলাকে আগলাইয়া ফিরিত।

লাঠি হাতে নন্দকে এমন সুন্দর মানাইত!

খাটো মোটা কাপড় পরা, মাথায় খাটো নন্দর হাতে সনাতনের লাঠি-গাছটা নন্দর মাথার উপরেও খানিকটা উঠিয়া থাকিত। নন্দ নির্ভয়ে প্রকাণ্ড কালো মহিষ দুইটাকে দুম দাম করিয়া পিটিত। কখনও কখনও সে সুকৌশলে উঠিয়া বসিত মহিষের পিঠে। মহিষটা চলিত, নন্দ এমন দুলিত সেই

চলার সঙ্গে সঙ্গে যে, সনাতনও ছুটিয়া গিয়া চড়িয়া বসিত অন্য মহিষটার পিঠে।

মহিষের পিঠের উপর হইতেই নন্দ প্রথম দিনই চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! আলান!

প্রকাণ্ড বড় আলান—অর্থাৎ আল কেউটে চলিয়া যাইতেছিল। নন্দর চীৎকারে সেটা অল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দেখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিয়া বলিল, ওর নাম কালকুটি, কিচ্ছু বলে না বুড়ী। বুঝলি, ওকে যেন মারতে টারতে যাস না। তারপর সে হাতে তালি দিয়া বলিল, যা যা বুড়ী চলে যা। সাপটা আর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সনাতন এখানকার কীট পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটেটার রীতিনীতি, গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত, এমন কি কালকুটির গর্ত্তটাও সে চেনে।

কালকুটির বহু শাবককে সে হত্যা করিয়াছে। সেগুলার স্বভাব মায়ের মত নয়। সনাতন জানে, বয়স হইলে উহারাও এমনই ধীর স্থির হইবে, কিন্তু বয়স হইতে হইতে যে কত জীব-জন্তু মানুষ মারিবে তাহার কি ঠিক আছে? আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই সে সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গর্ত্তটার আশে পাশে। সহসা একদিন দেখা যায়, কালো কালো সর্প শিশুতে চারি পাশ ভরিয়া গিয়াছে। সাপের ডিম, গরম-খোলায় দেওয়া ধান হইতে খইয়ের মত ফোটে যে! ডিম ফাটিয়া ছটকাইয়া বাহির হয় সাপের বাচ্চা। নহিলে উহার মা ওই কালকুটিই যে খাইয়া ফেলিবে উহাদের।

গর্ত্তের ভিতর উদ্যত গ্রাসে বসিয়া থাকে কালকুটি, উপরে থাকে সনাতন লাঠি লইয়া। তবুও যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা বড় হইয়াও প্রাণ দেয় সনাতনের হাতে।

নন্দ সেদিন কালকুটিকে চিনিল, ক্রমে ক্রমে আরও অনেককে চিনিল।

কত নূতনকে আবিষ্কার করিল। প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত, সেগুলো মরা কাঁচ পোকা। নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল। দুইজনে মিলিয়া গোবর কুড়াইয়া বানাইয়া তুলিল প্রায় একটা পাহাড়।

কর্ত্তাবাবু খুশি হইয়া গোটা একটা টাকা বকশিস দিলেন। সনাতন সেদিন নন্দকে আদর করিল, তু আমার আনার ঘরের আলো!

নন্দ অবাক হইয়া গেল।

সনাতন সেই দিনই কথাটা শিখিয়াছে বড় বাবুর কাছে। পূজার কাপড়ের প্রকাণ্ড গাঁটরি মাথায় সনাতন বড় বাবুর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল। বড় গিন্নী অন্ধকার বড় ঘরের দরজা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও, আলো জ্বেলে দেই। বড় বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, দরকার নেই, তুমি আমার আঁধার ঘরের আলো!

কথাটা সনাতনের বড় ভালো লাগিয়াছে।

বছর দশেক পরে সেই নন্দ একদিন সনাতনকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িল। সনাতনের সে অবস্থা বর্ণনার অতীত, কর্কশ উচ্চ কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন আর্ত্ত চীৎকারে সমস্ত গ্রামখানাকে নিশীথ রাত্রে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কর্ত্তাবাবু তখন মারা গিয়াছেন, বড় বাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকের সঙ্গে শিবনাথের বাবাও গিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি বড় ভালবাসেন, সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে। শবদেহের পাশে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, উঠানে সে আলো বিশেষ আসিয়া পড়ে নাই। অন্ধকার উঠানে অসুরের মত প্রশস্ত প্রকাণ্ড বুকে বাঘের থাবার মত হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে সনাতন, চোখের জলে চোখ মুখ ভাসিয়া যাইতেছে

সৎকার করিয়া পরদিন সে যখন মনিব বাড়ীতে আসিল, তখন চোখ দুইটা তাহার কুঁচের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভাবিল, সনাতন পাগল হইয়া যাইবে।

সেই দিন গভীর রাত্রে সে যখন ছুটিয়া আসিয়া কাছারির দাওয়ায় চাপরাসীটার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাগল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া চাপরাসীটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

সনাতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, নন্দ, প্যায়াদা, নন্দ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াইছে।

মাসখানেক পরেই একদিন সকালে চাপরাসীটা বলিল, সনাতন আসে নাই।

বড় বাবু বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয়।

চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, রাত্রে উঠে সে কোথা চ'লে গিয়েছে। এইখানে আমার কাছেই তো শোয় এখন। ভোর রাত্রে উঠে গেল, তারপর আর আসে নাই।

কড়া মেজাজের মানুষ বড় বাবুও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।—নন্দর শোকে সনাতন দেহত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু পরের দিনই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি?

সনাতন জবাব দিল, গেয়েছিলাম যেখানে মন হলছিল।

আবার দিন দুই পরে দেখা গেল, সনাতন নাই।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নিখোঁজ। যে সনাতন নন্দর প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যাতেই ভয়কাতর শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়ে, সে রাত্রির অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চার দিন পর সে ফিরিল। বড় বাবু এবার রুষ্ট ভাবেই বলিলেন, এমনি করবি তো কাজে জবাব দে। সন্ন্যাসী হতে চাস তো সন্ন্যাসীই হয়ে যা। আর নয় তো আবার বিয়ে থা ক'রে ঘর-সংসার কর, কাজ কর্ম্ম কর।

সনাতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড় বাবু বলিলেন, কি বলছিস?

নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে খুঁটিতে সনাতন বলিল, আজ্ঞে—

বুঝলি আমার কথা?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সনাতন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। একেবারে সটান অন্দরে আসিয়া বড় গিন্নীর সম্মুখে জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। দু' কুড়ি টাকা আপুনি গ্যান। লইলে বড় বাবুকে ব'লে গ্যান।

বড় গিন্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, দু'কুড়ি টাকা নিয়ে কি করবি তুই? তীর্থে যাবি না কি?

সনাতন মাথা চুলকাইয়া বলিল, বড় বাবু বলছেন বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে?—সস্নেহে হাসিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, ভালই বলছেন রে। মরণকে ঠেকিয়ে তো সংসার করা যায় না বাবা, তার জন্য বিবাগী হ'লে কি চলে?

পরম আগ্রহে সম্মতি জানাইয়া সনাতন বলিল, আজ্ঞে হঁ্যা।

খুসি হইয়াই গিন্নী বলিলেন, বেশ কনে ঠিক কর, টাকার জন্যে বলব আমি বড় বাবুকে।

আজ্ঞে, কনে আমি ঠিক করেছি, টাকা হ'লেই হয়।

বাড়ীর মেয়েরা বিস্ময়ে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া উঠিল, ও মাগো!

কোথায় রে, কোথায়? কবে ঠিক করলি রে এর মধ্যে? কেমন কনে রে? কত বড়? দেখতে কেমন?

সনাতন বসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পুলকিত লজ্জার সহিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

মেয়েটির বাড়ী ক্রোশখানেকের মধ্যেই—যুগলপুর। অনেকদিন হইতেই

সনাতন চেনে। হাটে সে নিয়মিত আসে। সনাতন বলিল, কনে আজ্ঞে ভারী সোন্দর। আর বয়েস, তা খানিক হবে বই কি!

সনাতন বর্ণনায় অতিরঞ্জন করে নাই। মেয়েটি সত্যই সুন্দর দেখিতে। বর্ণে সে গৌরী, মুখশ্রীতে লাবণ্যময়ী, কেবল চোখ দুইটি খয়রা রঙের; গঠনে সে দীর্ঘাঙ্গী, বয়সে বাইশ—চব্বিশ। সনাতন বৈরাগ্যের বশে মধ্যে মধ্যে নিখোঁজ হয় নাই, মেয়েটির প্রেমের আকর্ষণেই সেখানে ছুটিয়া গিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটি সধবা। অনেক কাণ্ডের পর, তাহার স্বামী দুই কুড়ি টাকার বিনিময়ে তাহাকে ছাড়-পত্র দিতে রাজী হইয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহাদের দুইজনকে একত্র পাকড়াও করিয়া সনাতনকে তাহারা দুরন্ত প্রহার দিয়াছিল। সনাতন সে গ্রাহ্য করে নাই, মার খাইয়াও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, ছেড়ে দিস তো দে, নইলে আমি নিয়ে পালাব। শুধো কেনে ওকে, উও থাকবে না তোর কাছে।

মেয়েটার লজ্জার আবরণ নিঃশেষে খসিয়া গিয়াছিল। বলিল, আজই যাব আমি উয়োর সঙ্গে।

শেষ পর্য্যন্ত দুই কুড়ি টাকায় সনাতন রফা করিয়া আসিয়াছে।

* * * *

আবার সনাতন ঘর বাঁধিল, সংসার পাতিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া সে নূতন ঘর তৈরি করিল বাবুদের গোয়াল বাড়ীর পাশেই। পুরাণো বাড়ীতে নন্দ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনদিন রাত্রে কড়ি কাঠে বসিয়া সে দদি তালগাছের মত মোটা পা বাহির করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে চাপাইয়া দেয়, তবে—! ঝাঁকড়া চুল ভর্ত্তি মাথাটা বার বার নাড়িয়া সনাতন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাই সে নূতন করিয়া ঘর গড়িল—সে ঘরে নন্দর এতটুকু জিনিসও সে রাখিল না, আপনার সামগ্রীর লোভে নন্দ যে নিশ্চয় এখানে আসিয়া হাজির হইবে।

নূতন বউয়ের নামটিও বড় ভাল, পেরভাতী অর্থাৎ প্রভাতী। মেয়েটি কিন্তু বিলাসিনী। চলনে-বলনে, আহারে-রুচিতে, পোষাকে-প্রসাধনে সনাতনের

বিপরীত। মেয়েটি চলে হেলিয়া দুলিয়া, কথা কহিতে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, পোড়ানো সামগ্রী তাহার মুখে রোচেনা, সে পান খায়, দোক্তা খায়; কাপড় পরে পা ঢাকিয়া পরিপাটী ছাঁদে, চুল বাঁধে বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের মত আলবোট কাটিয়া। অথচ সনাতন ভালবাসে পোড়ানো জিনিষ খাইতে, রুক্ষ চুল টানিয়া মাথার উপর ঝুঁটি খোঁপা তাহার সবচেয়ে ভাল লাগে। নন্দর মত গোবর প্রভাতী কুড়াইবে না। ছেলের ঝি হইতে আপত্তি ছিল না কিন্তু বাবুদের বাড়ীতে শিশু ছেলেও কেহ নাই।

তবুও সনাতন অবনত মস্তকে মন্ত্রমুগ্ধের মত পেরভাতীর আনুগত্য স্বীকার করিল।

প্রভাতীর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে ওখানে সে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মনিব বাড়ীর কাজের উপর আর একটা কাজ পাইল, ও পাড়ার হীরু চাটুজ্জে বিদেশে চাকরি করে, এবার সে মেয়েছেলে লইয়া গিয়াছে, রাত্রে তাহার বাড়ীতে পাহারা দিবার কাজ লইল সনাতন। প্রভাতীকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধ্যার পর চাটুজ্জের বাড়ী যাইত। আবার ভোর বেলায় উঠিয়া চলিয়া আসিত।

মাস কয়েক পর—

সেদিন পেরভাতী কোন ভদ্রলোকের বধূ বা কন্যার পরণের শাড়ী দেখিয়া বলিল, ওই শাড়ী আমার চাই।

সনাতন মাথায় হাত দিয়া বসিল!

মনিব বাড়ীতে বিবাহের ঋণ জমিয়া আছে, এখানে ওখানে যে ঋণ করিয়াছে সেও শোধ হয় নাই, এখন টাকা কোথায় মিলিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আসিল ছোট বাবু অর্থাৎ শিবনাথের বাপের কাছে। ছোট বাবুকে নন্দ ও সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে আর ছোট বাবু এখনও পুরা বাবু হইয়া উঠে নাই, জুতা মারিবার বয়স হয় নাই, সনাতন ছোট বাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে টিপিতে সলজ্জভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিল।

ছোট বাবুও একটু লজ্জিত হইলেন, টাকা ত আমার কাছে নেই সনাতন। গিন্নীমাকে চাও, নয় তো বউরাণীর কাছে নাও। আমাকে কিন্তুক দিতে হবে ছোট বাবু। ছোট বাবুর তখন বিবাহ হইয়াছে, দশ এগার বছরের বধূ। আচ্ছা, কাল বলব তোকে।

সনাতন খুশী হইয়া আসিয়া পেরভাতীকে বলিল, কাল।

পরদিন সকালেই ছোট বাবু টাকা লইয়া গিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

সনতান বসিয়া আছে, তাহার সে মূর্ত্তি অদ্ভুত। চোখ দুইটা রাঙা, মুখখানা ভীষণ, আর প্রভাতী দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে উপুড় হইয়া অসম্বৃত বেশে, অনাবৃত গৌরবর্ণ পিঠখানায় প্রহার চিহ্ন রক্ত-মুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছোট বাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আজ আধ-মরা করে ছেড়েছি, একদিন কিন্তুক নিদ্দম মেরে ফেলব ছোট বাবু।

প্রভাতীর পিঠের প্রহার চিহ্নগুলি দেখিয়া ছোট বাবু সনাতনকেই তিরস্কার করিলেন—ছিঃ, এমনই ক'রেই কি মারে রে!

প্রভাতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সনাতন গর্জ্জন করিয়া বলিল, রেতের বেলায় চাটুজ্জের বাড়ীতে আমাকে একখানা বস্তা দিয়ে বলে কি, বাখার থেকে ধান বার করে লে। আমি চুরি করব ছোট বাবু!

ছোট বাবুর মনে পড়িল, ছেলেবেলার কথা। তাঁহাদের বাড়ীর আম গাছটায় আম পাকিত সকল গাছের আগে। যতটা আম গাছ হইতে পড়িত সনাতন কুড়াইয়া বাড়ীতে দিয়া আসিত, কখনও তিনি সনাতনকে কুড়াইয়া লইয়া আম খাইতে দেখেন নাই। একবার তিনি চাহিয়াছিলেন একটা আম। সনাতন বলিয়াছিল, বাড়ীতে লেবা?

ছোট বাবু কাপড়ের টাকা দিতে গেলে সনাতন লইল না। বলিল, এক ছুঁচ ওকে আমি দোব না।

প্রভাতীও সহ্য করিবার মেয়ে নয় ; মাস খানেক পরে সে পলাইয়া গেল। বাবুদের বাড়ীর চাপরাসীটার সঙ্গে—সনাতনের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে সনাতনকে পাওয়া গেল আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। বঁটির একটা কোপ তাহার ঘাড়ে বসাইয়া দিয়াছিল। দশ দিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সনাতন বাঁচিল। সে দশ দিন অচেতন সনাতনের কি চীৎকার !

নিশীথ রাত্রে ঘুমন্ত মানুষ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিত, সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ— ।

দশ দিন পর চেতনা পাইয়া সনাতন বড় বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বড় বাবু গো ! আমি আর বাঁচব না গো !

তাহার সে কাতরতায় বড় বাবুও বিচলিত হইলেন। সনাতন তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে, আজ সে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে একান্ত আপন জনের মত।

ছোট বাবুকে সে বলিল, বাঁচি তো আর মেয়ের মুখ দেখব না ছোট বাবু।

সনাতন বাঁচিল।

* * * *

সনাতন বাঁচিল এবং মাস খানেক না যাইতেই আবার সে বিবাহ করিল। অত্যন্ত কুৎসিত দর্শনা একটা মেয়ে। অতুল স্বাস্থ্য এবং আকারে সে সনাতনেরই যোগ্য।

কর্ত্তাবাবু সনাতনের নাম দিয়াছিলেন—অসুর, এবার ছোট বাবু সনাতনের নূতন বধূর নাম দিলেন—হিড়িম্বা।

সনাতন অতি সলজ্জ ভাবে পুলকিত হইয়া হাসিল। নূতন বধূটিও হাসিল—হি—হি করিয়া, হাসিল—নির্ব্বোধের মত; সে হাসি দেখিয়া ছোট বাবুর গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল—হাসির সঙ্গে মেয়েটার মুখ দিয়া লাল গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হিড়িম্বা অদ্ভুত, কিছু দিনের মধ্যেই সে সনাতনকে ঠাকুর করিয়া তুলিল।

সনাতনকে সে সকাল বেলায় গোয়াল পরিস্কার করিতে, গোবর ঘাঁটিতে দেয় না, নিজেই সে গোবর পরিষ্কার করে; নন্দর মত সেও ঝুড়ি লইয়া সনাতনের সঙ্গে মাঠে যায়, সেখানে সনাতন ঘুমায়—একা হিড়িম্বা গরু-মহিষ আগলায়, গোবর কুড়ায়, কুঁচি কাঠি সংগ্রহ করে, জ্বালানি কাঠ জড়ো করে। জ্বালানি কাঠের জন্য অবলীলাক্রমে সে তাল গাছে উঠিয়া যায়। কুঁচি কাঠি বিক্রি করিয়া সে পয়সা আনে, বাড়ীতে ঘুঁটে দিয়া—ঘুঁটে হইতেও মাসে এক টাকা দেড় টাকা হয়।

সনাতনের অদৃষ্ট! এই হিড়িম্বাও তাহার অদৃষ্টে সহ্য হইল না; অদৃষ্টের তাড়নায় সে নিজেই একদিন দুর্দ্দান্ত প্রহার দিয়া শেষে গলায় হাত দিয়া হিড়িম্বাকে বাহির করিয়া দিল।

হিড়িম্বার সে কি কান্না!

ছোট বাবু মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল। সনাতন বলিল, সন্দেশের রস রাক্ষুসী চুষে মেরে দিলে! সনাতন কয়েকটা রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়াছিল, হিড়িম্বা লোভের বশে গোপনে রসগোল্লাগুলি চুষিয়া খাইতেছিল, সনাতন সেটা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ছোট বাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সনাতন বলিল, ভাত-ডাল যা হয় ঘরে আগে-ভাগে চুরি ক'রে খায়! মারের চোটে আজ নিজেই বলেছে।

ছোট বাবু বলিলেন, আচ্ছা, আর খাবে না!

তবুও সনাতন অটল। বলিল, উওর এত বড় বাড়, আমাকে 'মর' বলে! আমি মরব! আমি ম'রে যাব ছোট বাবু!

ছোট বাবু হাসিলেন, আবার খানিকটা বিরক্তও হইলেন। 'মর' বললেই কি মানুষ মরে সনাতন?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া সনাতন তবুও বলিল, আজ্ঞে না। আমাকে 'মর' বললে উ!

এবার ধমক দিয়া ছোট বাবু বলিলেন, 'মর' বললে তো হ'ল কি? তুই অমর নাকি? মরবি না তুই?

ছোট বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন বলিল, আপুনি আমাকে 'মর' বলছ ছোট বাবু।

সে এত দিনের মনিব-বাড়ীর কাজে জবাব দিয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল।

* * *

ফিরিল সে দীর্ঘ দিন পর।

আজ হইতে বৎসর খানেক আগে। তখনও সে সমর্থ, এত বড় দেহ আশির উপর বয়সেও প্রায় সোজাই আছে; অল্প একটু নমিত হইয়াছে মাত্র, আর চলিবার গতি মন্থর হইয়াছে।

এক মাথা পাকা চুল, প্রকাণ্ড বড় পাকা গোঁফ, স্থবির অসুরের মত দেহ সনাতন একেবারে মনিব-বাড়ীর অন্দরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। কাছারিতে যাইতে সাহস হয় নাই। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিবে বড় বাবুর কাছে! ছোট বাবুর সম্মুখে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

শিবনাথের বধূ, শিবনাথের ভগ্নী সকলে বিস্ময়ে ভয়ে চকিত হইয়া উঠিল।

সনাতনও হতভম্ব হইয়া গেল। কাহাকেও সে চেনে না, ইহারা সব কে?

শিবনাথের মা আসিয়া অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সনাতন? বালিকা বয়সে তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি এ বাড়ীতে আসিবার পর, বৎসর দুয়েক সনাতন এ বাড়ীতে ছিল; কিন্তু তবু তিনি তাহাকে চিনিলেন, সনাতনের আকৃতির জন্য।

সনাতন এক মুখ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ। একবার গিন্নীমাকে আর বউঠাকরুণকে ডেকে ত্যান তো। বলেন—সনাতন আইচে।

শিবনাথের মা অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমিই বউঠাকরুণ সনাতন। গিন্নীমা তো নেই।

সনাতন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে, চাহিয়া রহিল।

এই প্রৌঢ়া বিধবা—তাহার ছোট বাবুর কচি বউটি! গিন্নীমা নাই! তবে কি, তবে কি—! সে দ্রুত উঠিয়া কাছারি বাড়ীতে আসিল।

শিবনাথ নূতন, নায়েব নূতন, চাপরাসী নূতন, চাকর নূতন। সকলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে তুমি?

সনাতন চারিদিক খুঁজিতেছিল। কোন উত্তরই সে দিল না। উত্তর দিলেন শিবনাথের মা। তিনি তাহার পিছন পিছন আসিয়াছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, শিবু, এই সনাতন। সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, এই আমার ছেলে।

সনাতন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, বড় বাবু নাই? ছোট বাবু নাই?

* * *

গোয়াল বাড়ীর একখানা ঘরে সনাতন আশ্রয় লইল। শিবনাথের বাড়ীতেই অন্নের বরাদ্দ করিয়া দিলেন শিবনাথের মা। প্রথম দিনই পাচিকা ভাত দিয়া গালে হাত দিল। সনাতন ভাত লইল তিন বার। শিবনাথের মা হাসিলেন। সনাতনের আহার এখনও প্রায় সমানই আছে। খাইতে বসিলে শিবনাথের মা প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলে সনাতন?

প্রকাণ্ড হাতে বিপুল এক গ্রাস ভাত তুলিয়া সনাতন বলিল, দু'তিন জায়গায় মা।

ছেলেপুলে কি? ঘরকন্না করেছ?

বাঁ হাতে মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, ছেলে অ্যানেক গুলান মা। তিনটে পরিবারের ছেলে।

আরও তিন বার বিয়ে করেছিলে?

মেয়েরা সকৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন বলিল, হ্যাঁ মা। তা সে সব চুকিয়ে দিয়েছি। ছাড় পত্ত ক'রে সব তাড়িয়ে দিয়েছি।

সনাতনের এখানকার ইতিহাস এ বাড়ীর সকলেই জানে, সনাতন এ বাড়ীর কাহিনীর মানুষ। শিবনাথের বোন মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার আবার ঘর-দোর পাতাও সনাতন। আপন ভিটেতে ঘর কর, বিয়ে কর।

সনাতন নির্ব্বোধের মত খানিক হাসিয়া বলিল, আর লয় মা। সে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

বউদের তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা ?

আর একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, সবাই মরণ ডাকায় মা। মর, মর, মর—ছাড়া বাক্যি নেই, তিনটে বউয়েরই ওই এক রা।

সনাতন তৃতীয় বারের ভাতটা আর শেষ করিতে পারিল না। ভাতের অপচয়ে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, খেতে পারি মা, ই ভাত কটা আমি খাই। তা আজ লারলাম।

সনাতন বাড়ীতে থাকিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, মধ্যে মধ্যে গ্রাম প্রান্তর ঘুরিয়া আসিত। উদাসীর ডাঙায় দীর্ঘ দিন ঘুরিয়াও সে কালকুটিকে দেখিতে পাইল না।

মধ্যে মধ্যে ডাক্তার খানায় গিয়া ওষুধ লইয়া আসিত। তাহার ক্ষুধা হয় না।

আজ কয়েক দিন সনাতন বিছানাতেই শুইয়া আছে। খাবার পাঠাইয়া দিলে অল্প স্বল্প খায়। না পাইলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অভাবও বোধ করে না।

শিবনাথের মা এ অঞ্চলের প্রধান বিচক্ষণ ডাক্তার ননী বাবুকে ডাকাইয়া ছিলেন। ননী বাবু হাসিয়া বলিলেন, কালরোগ।

শিবনাথ দেখিতে গেলেন।

কঙ্কালসার সনাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক পাষাণ-দুর্গের মত

পড়িয়া আছে। মোটা মোটা হাড়গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাহিয়া আছে।

শিবনাথের মা সেখানে ছিলেন, তিনি ডাকিতেছিলেন, সনাতন! সনাতন!

সনাতন যেন শুনিতে পাইতেছে না।

শিবনাথ কাছে আসিয়া কণ্ঠ-স্বর উচ্চ করিয়া ডাকিলেন, সনাতন! সনাতন!

এবার সনাতনের দৃষ্টি ফিরিল। সে দৃষ্টি যেন খুঁজিতেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সনাতন!

এবার দৃষ্টি শিবনাথের দিকে রাখিয়া ক্ষীণ-স্বরে বলিল, দেখতে পেছি না। সে হাতের ক্ষীণ ইঙ্গিতে ডাকিল, আরও কাছে এস।

শিবনাথ সরিয়া গেলেন।

খোকা বাবু।

হ্যাঁ। কেমন আছ?

ভাল আছি।

কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

ঘাড় নাড়িয়া সনাতন জানাইল, কিছু না।

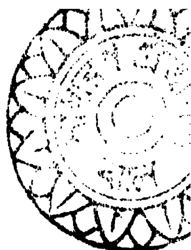
তারপর ক্ষীণ-স্বরে বলিল, দেখতে পেছি না ভাল, শুনতে পেছি না।

শিবনাথের মা এবার বলিলেন, ভয় নেই সনাতন। সেখানে তোমার নন্দ আছে, কর্ত্তা বাবু আছেন, বড় বাবু আছেন, গিন্নীমা আছেন, ছোট বাবু আছেন।

সনাতন কাহারও সন্ধানে কোন দিকে চাহিল না—শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—অন্নকার।

অর্থাৎ অন্ধকার।

রাজার জন্মদিন



রমেশ চন্দ্র সেন

মধ্যযুগের কাহিনী।

প্রথমে ছিল বার জন রাজ-বন্দী, প্রত্যেকেই যুবক, সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়। প্রতি বৎসর রাজার জন্মদিনে এক এক জন করিয়া খালাস পাইয়া তখন ছিল মাত্র তিন জন।

রক্ষীদের সঙ্গে কথা বলিবার হুকুম নাই। প্রকাণ্ড এই দুর্গে তাদের সঙ্গী ছিল তারা নিজেরা আর ছিল গাছের পাখী, আকাশের তারা, চন্দ্র-সূর্য্যের আলো।

পূর্ব্বে রাজ-বন্দীদের রাখা হইত পৃথক্ পৃথক্ কুঠরিতে কিন্তু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং এতদিন কারাগারের নিয়ম-কানুন ভালভাবে প্রতিপালন করায় কর্ত্তৃপক্ষ খুশী হইয়া তাদের এক সঙ্গে থাকিবার হুকুম দেন।

গল্প-গুজব করিয়া, তাস ও পাশা খেলিয়া, দৌড়-ঝাঁপ করিয়া সময় তারা একরূপ কাটাইয়া দেয়। কখনও প্রেমের গল্প করে, কখনও আলোচনা করে রাজনীতি ও সাহিত্যের।

রাজশেখর মাঝে মাঝে গান গায়, কোন সময় স্তোত্র আবৃত্তি করে, কখনও বা বন্ধুদের শুনায় তার স্বরচিত চম্পূকাব্য। একটি বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় কারাধ্যক্ষ আসিয়া খবর দিলেন, রাত্রি প্রভাতে রাজশেখর মুক্তি পাইবে।

জয়ন্ত ও জীমূতবাহন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, জয় রাজশেখরের।

তাদের আনন্দের আর সীমা নাই, জয়ধ্বনি করিয়া, চেঁচাইয়া, গান গাহিয়া তারা ঘর খানাকে সরগরম করিয়া তুলিল।

জয়ন্ত বলিল, মুক্তি ত পাচ্ছ, কিন্তু মনে থাকে যেন চম্পার খবর আমাকে দিতে হবে।

রাজশেখর কহিল, নিশ্চয়।

জয়ন্ত একটু হাসিল। মুক্তি প্রাপ্ত আরও দুই একজন বন্ধুকে এইরূপ অনুরোধ করায় তারাও কথা দিয়াছিল চম্পার খবর পাঠাইবে। কিন্তু খবর সে পায় নাই।

রাজশেখর, জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিল, তার কোনও সংবাদ দিবার আছে কিনা?

জীমূতবাহন বলিল, না।

প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী দরজা খুলিয়া দিলে তিন জনেই উঠানে আসিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে জয়ন্ত, মধ্যে রাজশেখর, শেষে জীমূত-বাহন। রাজশেখরের গলায় একটা ফুলের মালা।

চলিতে চলিতে সে গান ধরিল, নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।

বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল, নমস্তে—

দুর্গের ফটকে আসিয়া রাজশেখর দুই বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল। তিন জনেই নির্ব্বাক। তিন জনেরই চোখ আর্দ্র।

বাষ্পাকুল-কণ্ঠে রাজশেখর কহিল, আসি ভাই।

বিদায়ের পালা বোধ হয় আর একটু দীর্ঘ হইত, কিন্তু প্রহরী বলিয়া উঠিল, সময় সংক্ষেপ।

প্রহরীরা রাজশেখর ও তার বন্ধুদের মধ্যে লৌহ কপাটের যবনিকা টানিয়া দিলে জীমূতবাহন ও জয়ন্ত পরস্পরের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে ছিল গভীর হতাশা এবং একের প্রতি অপরের একান্ত নির্ভরতা।

সেদিন আর তাদের বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

এতদিন তবু ছিল তিনজন। জীবন আজ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল।

দুইটী প্রাণী থাকে পরস্পরের ছায়ার মত। গোপন তাদের কিছুই নাই; চিন্তায়, কর্ম্মে সকল বিষয়েই একটা খোলাখুলি ভাব।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে মাঠে দৌড়ায়, দুপুরে সাঁতার কাটে, খাওয়ার পর তাস খেলে, কখনও বা নিদ্রা যায়।

জীমূতবাহন চাপা ধরনের লোক, এতদিন নিজের প্রেমের ইতিহাস সে গোপন করিয়াই আসিয়াছে। এবার একদিন জয়ন্তের কাছে সে ধরা দিল, বন্ধুকে বলিল—তার প্রেমের গল্প, জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। ঘটনাটি এইরূপ—

জীমূতবাহনের প্রেমাস্পদ ছিল তারই কোন এক বন্ধুর আত্মীয়া। পাছে বন্ধুর প্রাণে আঘাত লাগে, পাছে তার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় সেই জন্য প্রেমের প্রতিদান পাইয়াও সে পিছাইয়া আসিল।

সেই হইতে নারী সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য কি কৌতূহল তার নাই।

ব্যথা সে পাইল খুবই কিন্তু উপায় ছিল না, একদিকে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা, আর এক দিকে প্রেম।

জীমূতবাহনের উপর জয়ন্তের অনুরাগ সেই হইতেই যেন আরও বাড়িয়া গেল। সেও যে প্রেমিক, সেও যে তার সহধর্ম্মী!

আগে মনে করিত, লোকটা বেরসিক তাই চম্পার কথা ততটা প্রাণ খুলিয়া বলিত না। কিন্তু এখন আর দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই।

কিছুদিন পরে জীমূতবাহনের অসুখ করিল—জ্বর, বমি, মাথার যন্ত্রণা। প্রথমে মনে হইল, অল্পেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু উপসর্গ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

রাজধানী হইতে বিচক্ষণ বৈদ্য আসিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু বলিলেন, ব্যাধি গুরুতর, জীবনের আশা কম।

জয়ন্ত জননীর মত সেবা করিতে লাগিল। বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, নিজ-হাতে সে মল-মূত্র পরিষ্কার করে, রোগীর শয্যা ছাড়িয়া বড় একটা ওঠে না।

রাত্রে ঘুম নাই, অনেক সময় খাইতেও ভুলিয়া যায়।

তার অনলস এই সেবা দেখিয়া কারারক্ষীরাও মুগ্ধ হয়, পরস্পর বলাবলি করে, এই দৃশ্য অপূর্ব্ব।

বৈদ্য তার এইরূপ সেবার জন্যও ভীত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এরূপ ভাবে চললে তোমার ও অসুখ করবে।

কিন্তু জয়ন্ত ভ্রূক্ষেপ করে না, সেবার নেশা তখন তাকে পাইয়া বসিয়াছে। তার শুধু চেষ্টা কিসে জীমূতবাহন একটু আরাম পায়।

বন্ধুর শুশ্রূষা গুণে দু'মাস ভুগিয়া জীমূতবাহন নীরোগ হইয়া উঠিল, পথ্য পাইল। জয়ন্তের আনন্দ আর ধরে না। সে যেন একটা অকূল-পাথারে পড়িয়াছিল, এবার তার কূল মিলিয়াছে।

জীমূতবাহন কহিল, আর জন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে।

জয়ন্ত হাসিয়া উত্তর করিল, এ জন্মেই বা কম কিসে?

এইরূপ সৌহার্দ্দের আনন্দে তাদের দিন কাটিয়া যায়। তারা ভুলিয়া থাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট।

জীমূতবাহন বলে, এই বন্ধুত্ব আমাদের কারা-ক্লেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মাঝে মাঝে হয় মুক্তির কথা। সেই প্রসঙ্গ উঠিলে এক জন অপরের মুক্তি কামনা করে।

জীমূতবাহন বলে, একজন নারী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে অতএব মুক্তি পাওয়া উচিত তোমার।

এতদিন যখন করেছে আরও এক বছর না হয় করুক। তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি খালাস হতে চাই না।

জীমূতবাহন বলে, প্রেমিকের জীবনে এক বছরের মূল্য ত বড় কম নয়।

সময় কাটাইবার আর পাঁচটা উপাদানের মধ্যে একটা উপায় তারা অবলম্বন করিল—নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা। রাজার জন্মদিনে মুক্তি মিলিবে কার?

পরীক্ষা করে তাম্র কি রৌপ্য মুদ্রা ঘুরাইয়া, পাশার ঘুঁটি চালিয়া এবং আরও অনেক কিছুর সাহায্যে।

ভাগ্য-লক্ষ্মী কখনও প্রসন্ন হন এক জনের উপর, কখনও অপরের প্রতি। যার নাম ওঠে সে অপরকে বলে, না ভাই আমি চাই, এ বছর তুমি খালাস হও।

মুক্তির দিন ঘনাইয়া আসে, মাত্র মাস দেড়েক বাকী।

একদিন জয়ন্ত শৌচাগার হইতে ফিরিতেছিল, তার কানে গেল দুইটি প্রহরীর কথোপকথন।

একজন বলিল, এবার বন্দী ত খালাস পাবে এক জন, আর এক জন থাকবে কি করে?

কেন?

একা থাকা যে ভারী কষ্টের। এখানেই বছর পনর আগে একটি বন্দী নিঃসঙ্গ কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল, ঐ ওদেরই ঘরে।

জয়ন্ত চলিয়া আসিল।

কিন্তু এই কথা কয়টা তার হৃদয়ে পাথরের দাগের মতন গাঁথিয়া রহিল।

সে অনেক চেষ্টা করিল এই দুর্ভাবনাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার। কিন্তু যখনই একা থাকে তখনই মনে পড়ে প্রহরীদের সেই কথাবার্ত্তা।

ব্যাপারটাকে সে এভাবে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। অবশ্যম্ভাবী নিঃসঙ্গ কারা-জীবনের বিভীষিকার কথা মনে হয় নাই দু'জনের কাহারও।

জয়ন্তের মনে পড়িল, তাদের গ্রামের এক ভূস্বামীর কথা। নির্জ্জন কারাবাসের ফলে ছয় মাসের মধ্যে তার মাথা এতদূর খারাপ হইয়া যায়, যে নিজের পুত্র-কন্যাকেও সে চিনিতে পারে নাই।

জয়ন্ত মানুষটাকে দেখিয়াছিল—আজন্ম মস্তিষ্ক-হীনের চেয়েও কৃপার পাত্র। অথচ এই মানুষই বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, ধন-দৌলতে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে একদিন সমাজের শিরোমণি ছিল।

জয়ন্তের ভয় হয়, তারও ত এইরূপ হইতে পারে! মাঝে মাঝে একলা বসিয়া কি যেন ভাবে।

জীমূতবাহন ব্যাপারটা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, কি হয়েছে তোমার?

জয়ন্ত সব কথা খুলিয়া বলিল।

জীমূতবাহন উত্তর করিল—আচ্ছা, দু'জনের কারও যদি মুক্তি না মেলে?

জয়ন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিল—সে খুব ভাল কথা, তবুও এক সঙ্গে থাকতে পারব।

কিন্তু ভীতি তার কাটে না। সে ভাবে জিনিসটা কি সম্ভব? উভয়েরই মুক্তি অথবা উভয়েরই আর এক বৎসর একত্র কারা-বাস যেন কল্পনারও অতীত।

তার এই হতাশ ভাব জীমূতবাহনের মনেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়। সেও মনে করে, সত্যই ত এদিকটা একেবারে উপেক্ষার নয়।

একদিন প্রাতে সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশে একটা বাজ উড়িয়া যাইতেছিল।

জয়ন্ত বলিল, ওটা যদি দক্ষিণ দিকে যায় আমি মুক্তি পাব, বাঁয়ে গেলে তুমি।

উড়িয়া উড়িয়া পাখীটা প্রান্তরের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া বাঁ দিকে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মুখখানা ম্লান হইল। ঐ যে পাখীটা—অনন্ত নীল আকাশে একটা শিশির-কণার মতো সেও মুক্ত, সেও বিচরণ করে স্বাধীনভাবে।

ঐ পাখীর সঙ্গে তুলনায় তার নিজের জীবন?

কিন্তু এইখানেই ত ইহার শেষ নয়। গভীরতর দুঃখ লইয়া ভবিষ্যৎ তাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

ঠিক এই সময় জীমূতবাহন গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং"—

সেও ভাবিতেছিল মুক্তির কথা। ভগবানকে স্মরণ করিয়া মেঘের মত নিজের মনের গ্লানিটুকুকে উড়াইয়া দিবার জন্যই স্তোত্র আবৃত্তি করিল।

কিন্তু কারও মন হইতে সেই কালো মেঘটুকু উড়িল না। বরঞ্চ ক্রমেই উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল।

সেই হইতে আর তারা ভাগ্য পরীক্ষা করিতে সাহস করে নাই, মুক্তির কথা পর্য্যন্ত মুখে আনে না।

সেই অকপট বন্ধুত্ব, প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা একে একে সবই নষ্ট হইয়া গেল, রহিল ভদ্রতার একটা বহিরাবরণ মাত্র।

সেদিন দুপুরে তারা দাবা খেলিতেছিল।

খেলাটা বেশ জমিয়াছে, দু'ঘণ্টা চলিয়াছে একটা বাজি, শেষ আর হয় না।

জয়ন্ত একটা বোড়ের চাল ফেরত চাহিলে জীমূতবাহন বলিয়া ফেলিল, শুধু এ ব্যাপারে নয়, তোমার প্রকৃতির পরিচয় পাই প্রতি মুহূর্ত্তে।

কি রকম?

তুমি মনে কর, আমি তোমার মুক্তির প্রধান অন্তরায়।

জয়ন্ত কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল—যাক্, নিজের পরিচয় তুমি ভাল করেই দিলে।

খেলা আর শেষ হইল না। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাদের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

কথা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই পূর্ব্ব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তারা স্নান করে পৃথক্ সময়ে, আহার করে পৃথক্ স্থানে, যথাসম্ভব একে অপরকে এড়াইয়া চলে।

রাত্রে এক ঘরে না থাকিলেই নয়, তাই থাকে, কিন্তু পৃথক্ থাকিতে পারে না বলিয়াও পরস্পরের প্রতি রাগিয়া যায়।

মন তাদের বিষাইয়া ওঠে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অবলম্বন করিয়া।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেহই ভাবে না যে সে নিজেও মুক্তি পাইতে পারে। একে ভাবে মুক্তি মিলিবে অপরের।

কাল রাজার জন্মদিন। আজ সন্ধ্যার পর মুক্তির সংবাদ আসিবে। দু'জনেই সাগ্রহে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। মুক্তি এক জনের হইবেই, যার হয় হউক কিন্তু এ সংশয় আর ভাল লাগে না।

সন্ধ্যার কিছু পরেই কারাধ্যক্ষ আসিয়া ঘোষণা করিলেন, 'অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীমন্মহারাজের পবিত্র জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জীমূতবাহন মুক্তি পাইবেন। প্রভাতে কারা-গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।'

রাজাদেশ শুনাইয়া কারাধ্যক্ষ চলিয়া গেলেন।

জীমূতবাহন কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল না, মুক্তির এই বাণী আনন্দের না বিষাদের।

আর জয়ন্ত ?

প্রথমে সে যেন ঘোষণা-বাণীর অর্থই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে কথাগুলি দুই দুইবার আওড়াইয়া সে হাসিয়া ফেলিল, নিজের অন্তহীন দুঃখের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রূপের সুরে।

বাহিরে চাঁদের আলোর উপর শীতের কুয়াসা একটা পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির রূপ সদ্য শোকাতুরা শ্বেত-বসনা বিধবার মত।

জয়ন্ত এবং জীমূতবাহনের মনের উপরও কুয়াসার পর্দ্দারই মতন একটা আবরণ।

দু'জনে দু'টা জানালায় দাঁড়াইয়া। একজন পূবের, একজন দক্ষিণের।

জয়ন্তের কাছে সবই অর্থহীন, সবই অস্পষ্ট, রাত্রি প্রভাতে মাতাল যেমন জড়তা বোধ করে তার মন ও শরীরের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

আর জীমূতবাহন?

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই সে স্বাধীন ইহা ভাবিয়াও তার শান্তি নাই। জয়ন্তের নিকট সে যেন কত অপরাধী। ইচ্ছা হয়, একবার তার হাত ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে, কিন্তু ভাষা যোগায় না।

দু'জনেই নির্ব্বাক। একজন হতাশায়, অপরে সৌভাগ্যের সঙ্কোচে।

জয়ন্তের চোখের সামনে তখন ভাসিয়া উঠিল নিঃসঙ্গ কারাবাসের ছবি।

তার মনে পড়িল, নিজের পরিচিত সেই হতভাগ্য ভূস্বামীকে, মনে পড়িল এই কক্ষে যে বন্দী গলায় দড়ি দিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছিল তাহাকে।

ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের চোখ দু'টো লাল হইয়া উঠিল।

তার দিকে চাহিয়া জীমূতবাহনের আশঙ্কা হইল—মানুষটা বুঝি বা পাগল হইয়া গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কতক্ষণ তার হিসাব নাই।

একটা পাখীর ডাক শুনিয়া দু'জনেরই চমক ভাঙ্গিল। এই পাখী ডাকে প্রতি প্রহরে।

এটা কোন্ প্রহরের ডাক, প্রথম না দ্বিতীয় প্রহরের?

অন্যবার এইদিন কত উৎসব, কত আনন্দ হয়। বন্দীরা আনন্দ করে, মুক্তি প্রাপ্তের জয়ধ্বনি করে।

জীমূতবাহন একটা তোরঙ্গের উপর বসিয়া ভাবিতেছিল, বাহিরে যাইয়া জয়ন্তের মুক্তির জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিবে, কাহাকে ধরিবে, কোন্ প্রতিপত্তিশালী অভিজাতের মারফত রাজার নিকট আবেদন করিবে। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পাখীর ডাকের পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

জয়ন্ত তখনও ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিল।

মাথা একটু নাড়িতে নাড়িতে আপন মনে কি বকে, একবার ঘরের এদিক হইতে ওদিক যায়, আবার ফেরে।

কখনও হাত তার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসে, কখনও বা ওষ্ঠ প্রান্তে ফুটিয়া ওঠে একটু হাসি।

হাঁটিতে হাঁটিতে জয়ন্ত একবার জীমূতবাহনের দিকে চায়, কি যেন ভাবিয়া দেওয়ালের উপর ঘুষি মারে, হাত ক্ষত বিক্ষত হয়।

রাজার জন্মদিন—

জয়ন্ত দরজার কাছে একটা চারপাইর উপর বসিয়া আছে। পরনে জীমূতবাহনের পোষাক। মাথায় তারই উষ্ণীষ।

দরজা খোলা মাত্রই সে বাহির হইয়া যাইবে। যদি কেহ বাধা দেয়, তবে রক্ত-গঙ্গা বহাইবে।

কিন্তু এ কী!

অন্যবার ভোরের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা দরজা খুলিয়া দেয়। এবার এত বিলম্ব কেন?

ঘর যে আলোয় ভরিয়া গেল, এ আলো ত তার সহ্য হয় না।

এক দৃষ্টে সে চাহিয়া রহিল দরজার দিকে।

দূরে পদ-শব্দ শোনা গেল, একজন, দু'জন—বহু লোকের পদ-শব্দ।

শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হইল, একেবারে দরজার বাহিরে।

লৌহ কপাট ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল।

প্রথমে রাজার জন্মোৎসবের উপযুক্ত উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত কারাধ্যক্ষ, পিছনে প্রহরীর দল।

চৌকাঠের উপর পা দিয়াই কারাধ্যক্ষ বলিলেন, শ্রীমন্মহারাজ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। আপনারা দু'জনেই মুক্ত।

জয়ন্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দু'জনেই ?

কারাধ্যক্ষ তার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একটু আগাইয়া আসিয়া দেখিলেন, মেজের উপর জীমূতবাহনের দেহ পড়িয়া আছে। তার মুখে, বুকের উপর এবং চোখের কোণে জমাট বাঁধা রক্ত। একটা কষ বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া কালো শিরার মত দাগ পড়িয়াছে।

জয়ন্ত তখন ধীরে ধীরে আপন মনে বলিতেছিল—আমরা দু'জনেই মুক্ত !

চিরদিনের ইতিহাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে গা চুলকোবার জোগাড় করছে, এমন সময়ে ওপরে আওয়াজ হল—"হুম্, হুম্।"

দিন দুপুর হ'লে কি হয়—জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চমকে এদিক—ওদিক চেয়েই উর্দ্ধশ্বাসে দে লাফ। এ ডাল থেকে আর ডালে, সে ডাল থেকে একেবারে আর এক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে! আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি! গেছো প্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হোক, দিন-কানা বলে আর কখন তাকে হনু ক্ষেপাবে না।

শিকার ফস্কে চিতা চক্‌চকে ছুরির মতো চোখ তুলে একবার গেছো প্যাঁচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে, একবার চুক্‌লি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছো প্যাঁচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যান-গম্ভীর বুদ্ধ মূর্ত্তি যেন। আধবোজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্ত ভাবে তাকিয়ে বললে—"কাজটা কি ভাল হচ্ছিল বন্ধু—বিশেষ এই দিন দুপুর বেলা?"

চিতা নীচে থেকে ফ্যাঁস্ করে উঠল—"দিন দুপুর বেলা মানে?"

হুতুম গম্ভীর ভাবে বললে—"মানে, আজকাল তোমরা বনের শান্তর-টান্তর

সব উল্টে দিলে কিনা! দিন-রাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনী রাতে পর্য্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চটে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বললে—"রেখে দাও তোমার ও সব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস করে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের ত আর আমার মত সাত সন্ধ্যে নিরম্বু উপোস করতে হত না, ক্ষিদেয় পেট পিট একও হয়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হোক একটা খরগোসও ত মিলত।"

হুতুম চোখ বুঁজেই বললে,—"এত অধর্ম্ম ছিল না বলেই মিলত।"

চিতা চটে কাঁই হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চুকলি খাবার পর পেঁচো প্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাৎ উঁচু আর পলকা বলেই তাকে এবার একটা হাই তুলে সরে পড়তে হ'ল। যাবার সময় শুধু একবার বলে গেল.—দিনের চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক তোর।"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বললে,—"হুম্।"

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক—ওদিক তাকাতে তাকাতে হনু এসে হাজির। মৌতাতে গেছো প্যাঁচার চোখ তখন আবার বুঁজে আস্‌ছে।

হনু বললে,—"দেখলে দাদা, চিতার নেমকহারামিটা! তুমি না থাকলে ত সাবড়েই দিয়েছিল!

হুতুম বাজে কথা বেশী কয় না, বললে,—"হুম্।"

হনুর একটু বেশী কিচির-মিচির করা স্বভাব। সে বলেই চ'লল,—

অথচ এই আর অমাবস্যায় ওর কি উপকারটা না করেছি। বারশিঙার জলায় মাছের লোভে গেছলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চা-বাচ্চা সমেত ঐখানেই আড্ডা গেড়েছে সে খবর ত রাখেন না। জাম গাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাত্তেই হ'য়ে গেছল আর কি!"

হুতুমের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে হনু আবার বললে,—"আমিই প্রাণ বাঁচালাম আর আমাকেই কিনা ভাগ্‌।"

হুতুম এবার চোখ খুলে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে,—"এ ত আর নতুন দেখছিস না বাপু! ও জাতের ধারাই ত এই। থাবায় যারা নোখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম!"

হনু পিঠ চুলকে বললে,—"কিন্তু কি করা যায় বল ত দাদা? বনে ত আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! এক রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নীচে কেঁদো; দাঁড়াই কোথায়?"

হুতুম বললে,—"হুম্।"

হনু হতাশ ভাবে বললে,—"একটা উপায় বাৎলাতে পার না হুতুমদা? তোমার এমন মাথা!"

মাথার প্রশংসায় একটু খুসী হয়ে হুতুম বললে,—"উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?"

—"পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমার নয় ত, বনের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই ত কাল কেঁদো, বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা-রফা করেছে। বয়ার ত রেগে আগুন হয়ে গেছে; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।"

হুতুম তাচ্ছিল্য ভাবে বললে,—"ও সব চারপেয়ের কর্ম্ম নয়।"

হনু, হুতুমের এই দুর্ব্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ, খুব ধীর; কিন্তু মানুষের মত দু'পায়ে হাঁটে বলে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বললে আর রক্ষা নেই।"

হনু নরম হয়ে তোষামোদ করে বললে,—"দু'পেয়ে বলেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।"

হুতুম খুসী হয়ে বললে,—"তবে শোন!"

কিন্তু কথা আর কিছু হয় না। দূরের মাদার গাছের ডালের ওপর বুঝি একটা কেন্নোর মত পোকা একটুখানি উঁকি মেরেছিল। শোঁ করে একটা শব্দ হল; আর পরেই দেখা গেল, হুতুম উড়ে গেছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল।

কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে সরে পড়ল। হুতুমের মরজির খবর সে রাখে।

তরঙ্গিয়ার জঙ্গলে সত্যিই বড় গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সে কথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করে নি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে বসে শলা-পরামর্শ, শোনা যায় হা-হুতাস, কিন্তু সব চুপিচুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওঁৎ পেতে কে জানে! কে জানে কোন ডালে চিতা আছে ঘুপটি মেরে।

এ বছর ভয়ানক খরা।

বারশিঙার জলা ছাড়া সব জায়গায় জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ান যায়, কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখন হয়নি। কোঁদো তখন বনে এসেছে, দু' দশটা মেরেছে আবার চলে গেছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর কদিন থাকা যায়! তেষ্টায় পাগল হয়েই বুনো মোষের মা কাকিনী গেছল মরিয়া হয়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পেছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দান গেল ভেঙে।

সেই দেখে বনের আর কেউ ঘেষতে চায় না সেদিকে। হুনু পাহাড়ে চিকারার দল ছটফট করছে, জলে নামতে সাহস হয় না। কলজে ফেটেই কটা মরল। ঝাকাল হরিণের নতুন লোমের জৌলুষ নেই—সেই ক্যাকাসে হলদেই দেখায়। মেটে কালো গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে গাদ্ধি নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে, গায়ের লোম গেছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল বসে।

ঢুলানি নীচে দিয়ে যেতে যেতে ওপরে খস্‌খসে আওয়াজ শুনে চম্‌কে কাণ খাড়া করে দাঁড়াল।

হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে,—"না গো না, চিতা নয়, আমি হনু!"

হতাশ ভাবে ঢুলানি বললে,—"আর চিতা হলেই বা কি! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বললে,—"অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে?"

ঢুলানি এ কথায় সান্ত্বনা পায় না। বললে,—"থাকবে বলেই ত মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে?"

হনু গম্ভীর হয়ে বললে,—"আছে বই কি, কিন্তু উপায় করতে হবে।"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হয়ে বললে,—"উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি?"

—"সেদিন গেছলাম ত তাই হুতুমের কাছে। কিন্তু জান ত ওদের চাল? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি ওপর দিকে চেয়েছিল এতক্ষণ। এবার বললে,—"দু'টো পাকা নোনা ফেলে দাও ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার ত ভুলেই গেছি।"

হনু কটা পাকা দেখে নোনা ফেলে দিয়ে বললে,—"আচ্ছা, ঝোপে-ঝাড়ে ঘোর, চন্দ্রচুড়ের দেখা পাও না, না হয় কাল-কেউটের? ওদের বলে দেখলে বোধ হয় কাজ হয়; এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে চিবোতে ঢুলানি বললে,—"পাগোল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুবলে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে,
ডিমের ছা মাকে কাটে।

—ওরা ত আর মার দুধ খায় না।”

হনু মাথা নেড়ে বললে,—“তা বটে। তা না হ'লে ওই বারশিঙার জলার বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তা ত দেবে না—তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙ্‌বে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। না, হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।”

ঢুলানি গাছের গায়ে দু'বার শিঙ্ ঘসে চলে যেতে যেতে বললে,—“কি হয় না হয় খবরটা দিও।”

হনু এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে বসে বললে,—“সন্ধ্যে-বেলায়ই থলায় গেলেই পার ত?”

ঢুলানি বিষণ্ণ ভাবে বললে—“থলায় কি আর কেউ যায়? সে আমাদের দিন গেছে। খবর দিও দুন্ পাহাড়ের তলায়....”

ঢুলানি আরও কিছু হয়ত বলত কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল, কাছেই কেঁদোর কাসি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দিলে ছুট।

হনু দু'টো ডাল আরো ওপরে বসেছে ততক্ষণে।

কদিন বাদে আবার হুতুমের সঙ্গে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে। আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভাল রকমই হয়েছে মনে হ'ল। দু'চোখ বুঁজিয়ে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসেছিল।

আগের রাত্রে নতুন শিঙের চামড়া ঘসে তোলবার সময় কালো শিঙে চিতার হাতে মারা গেছে। হনু সেই খবরটা দুন্ পাহাড়ে চিতারাম দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল। হঠাৎ গাছের কোটর থেকে “হুম” শুনে চমকে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বললে,—“এই যে দাদা! কদিন ধরে তোমাকে বাদাম খোঁজা করেছি।”

হুতুমের মেজাজটা আজ ভাল, বললে,—“কেন হে?”

—"কেন, আবার বলতে হবে? তোমার মত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু' পেয়ে থাকতে এ বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও? দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাৎলাও।"

হুতুম বললে,—"হুম, বলবখ'ন।"

হনু অস্থির হ'য়ে উঠছিল। বললে,—"না, বলবখ'ন নয়, এখনই বল। তোমার দেখা ত আর তপিস্তে করলেও মেলে না। এখন যখন পেয়েছি আর ছাড়ছি নে।"

হুতুম বললে,—"হুম্! বলছি, উপায় ত বলতে পারি, কিন্তু লাভ কি?"

—"কি যে বল হুতুমদা! লাভ কি? এই নখ-চোরা দু'টো মরলে আর আমাদের ভাবনা কি?"

হুতুম গম্ভীর ভাবে বললে,—"আর ভাবনা থাকবে না ত?"

—"নিশ্চয়ই না!"

হুতুম বললে,—"হুম্, তবে শোন। বারশিঙার জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে সে দু'পেয়েদের গাঁ চিনিস্?"

হনু বললে,—"খুব চিনি, আমার ভাই খাটো-ল্যাজকে সেখানেই ত ধরে রেখেছে!"

হুতুম বললে,—"হুম! সে গাঁ থেকে দু'পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হয়ে বললে,—"বাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বললে,—"হুম্, আসবে রে আসবে, দুন্ পাহাড়ের রাঙা নুড়ি দেখেছিস্—ভোরবেলার সূর্য্যির মত লাল। সেই নুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে ত অবাক! বললে,—"সে নুড়ি ত চোখে দেখেছি, না যায় দাঁতে ভাঙ্গা, না আছে কোন রস। সেই নুড়ি নিয়ে কি হবে দু'পেয়ের?"

হুতুম একটু চটে উঠে বললে,—"তুই দু'পেয়ের হাল-চাল কি জানিস?"

হনু অগত্যা চুপ করল।

হুতুম আবার বললে,—"কসাড় বনের ধারে গারোবাদার পাশে দু'পেয়েরা আসে বেত কাটতে, তাদের সেই নুড়ি দেখাতে হবে।"

—"কেমন করে দেখাবো ?"

—"কেমন করে আবার দেখাবি! বেত-বনে নুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা ; এদিকে-ওদিকে আর কিছু ছড়াস্। দু'পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হয়ে বললে,—"তা না হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে? কেঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে ?"

হুতুম গম্ভীর হয়ে বললে,—"সে ভাবনা তোর কেন? যা বললাম কর আগে, তারপর বসে বসে দেখ্ কি হয়। অতই যদি বুঝবি তা'হলে গায়ে পালক গজাবে যে !"

হাজার হলেও হুতুম জ্ঞানী-গুণী লোক। এ ঠাট্টা নীরবে হজম ক'রে হনু বললে,—"তবে কুড়াইগে নুড়ি, কেমন ? ঠিক বলছ ত হুতুমদা, এতেই হবে ?"

হুতুম শুধু বললে, "হুম্।"

তারপর ক'বছর কেটে গেছে। তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের আর সে চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ্ হয়ে গেছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। দুন পাহাড়ের ওপরে আর নীচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু'পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খান্ খান্ করে। পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে। হনুর আজকাল ভারী বিপদ। বন্ধু-বান্ধব কেউ আর বড় তরঙ্গিয়ায় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোনরকমে সে পড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদাম গাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গেছে কমে ; দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড় কম দেখে।

হনু দাদা বলে ডাক দিতে প্রথমটা ত চিনতেই পারল না। তারপর মিট্ মিট্ ক'রে খানিক ঠাউরে বলেল,—"কে হনু নাকি! আছিস্ কেমন?"

হনু ম্লান ভাবে বললে,—"আছি আর কেমন দাদা!"

হুতুম আবার চোখ বুঁজবার উপক্রম করছিল। তখন হনু বললে,—"তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের কি হাল হয়েছে, দেখেছ ত দাদা!"

হুতুম একটু অবাক হয়ে বললে,—"কেন, কেঁদো আর চিতা; অনেকদিন মারা পড়েছে! সেই খরার বছরেই না?"

—"তা ত পড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও যে লোপাঠ হয়ে গেলুম। সারাদিন ঘুমোও খোঁজ ত আর কিছুই রাখ না? ডুন পাহাড়ের চিতারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু'পেয়ের যে বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে, তাতেই চিতারার দফা-রফা। গাউজদের যে কটা বাকী ছিল, কোন বনে যে গেছে কোন পাত্তা নেই। ঝাকাল দু'একটা আছে এখনও, কিন্তু আর বেশী দিন নয়; বাজ-লাঠিতে গেল বলে। বুড়ো ময়াল পর্য্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে। দিন-রাত গুড়ুম্ গুড়ুম্ দিন-রাত খটখট। এ গাছ পড়ছে, ও গাছ পড়ছে। দু'দণ্ড ত আর স্বস্তি নেই।"

হুতুম বললে,—"হুম্।"

—"তোমার কথায় নুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা ত ভালই হ'ল। আজ দু'জন, কাল চারজন, দু'পেয়েরা ক্রমে ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল তরঙ্গিয়ায়। তারা কেঁদোকে মারল বাজ-লাঠিতে চিতাকে মারল ফাঁদে। আমরা ত একেবারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা, তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? ডুন পাহাড়ে তারা যেদিন বাসা বাঁধল তারপর থেকেই আমাদের হ'ল সর্ব্বনাশ! কেঁদো আর চিতা তবু একটা দু'টোর বেশী মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়!"

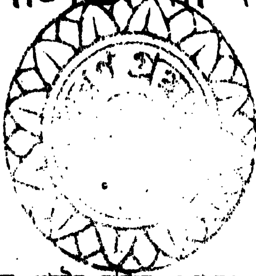
হুতুম গম্ভীর মুখে বললে,—"হুম্।"

—"ভাল করতে গিয়ে এ কি হ'ল বল ত?"

হনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে,—তরঙ্গিয়ায় এ দশা ত আর চোখে দেখা যায় না !"

হুতুম চোখ বুঁজে প্রশান্ত ভাবে বললে,—"যা হবার ঠিক তাই হয়েছে, চোখ বুজে থাকতে শেখ, কিছু দেখতে হবে না !"

সালতামামি



সুশীল জানা

লক্ গেটের বাইরে—ক্যানেলের মুখে বিদেশী মহাজনি নৌকো দুটো নোঙর করেছে এসে।

খবর নিয়ে এলো রাখাল দাস।

সাত-আট শ' ক'রে মাল পড়বে এক একটায়।

আমাদের এদিকেই আসবে তো?

কিছু ভাবতে হবে না বড় বাবু, ইদিকেই আসতে হবে। উদিকে আর আছে কি! শ্মশানের মতো তো নোনা ধরে খাঁ খাঁ ক'রছে সব। আমাদের এই ভেতরের দিকে আসতে হবেই।

ডেকে দে দেখি একবার নায়বকে।

তার পর নায়েব এল হন্তদন্ত হ'য়ে।

আমাকে ডাকছিলেন বড় বাবু?

রাখাল নাকি দেখে এল—দুটো মহাজনি নৌকো ঢুকছে ক্যানেলে। এই মত্তকায় ধান না ছাড়তে পারলে দাম পাবে না। সরকারী হাঙ্গাম শুরু হবে সব। কিন্তু এদিকে ধান কাটতে তো কেউ হাতই দিল না।....

হবে—ঠিক হ'য়ে যাবে সব পনেরো দিনের মধ্যে। দেরী হ'য়ে গেল এবার একটু। চাষীরা মরে গেল কতক—কতক পালালো, বাকী কটা তো ধুকছে ম্যালেরিয়ায়। তা হ'য়ে যাবে সব।

কিন্তু পনেরো দিন যে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে! বাইরে থেকে লোক এনে লাগাও না হয়। যা ছাড়তে—এই বেলা। বুঝলে—

বুঝেছে নায়েব—ভালো ক'রেই সে বুঝেছে। হুকুম দিল গোমস্তাদের—হাত নাগাদ সব হিসেব-পত্র পরিষ্কার করে ফেলতে। কার কাছে কত পাওনা দেনা আছে—তার সুদ শুদ্ধ হিসেব। ধান ভাল হয়েছে এবার। অভাব-অনটন অনেক গিয়েছে যথা রীতিতে, তারপর প্লাবন গিয়েছে, দুর্ভিক্ষ গিয়েছে—পাওনার অঙ্ক মোটা হ'য়ে বসেছে চাষীদের নামের পাশে পাশে। গোমস্তারা হিসেব করে খাতায়—

মহেন্দ্র দাস।

ফৌত। পঞ্চাশ মণ তিন কাঠা।

ব্রজেন দাস।

ফৌত। সাতচল্লিশ....

ব্রজেন দাস ফৌত মানে? তার বৌটা গেল কোথায়?

কি জানি। লেখ না বাবা জৈগুন বিবি ষাট মণ।

ফৌত?

ফৌত—সব ফৌত? যা বলি লেখ। জৈগুন বিবির টকটিকির মতো দু'টো ছেলে আছে না?

ওরা হিসেব করে বছরের। মাঠের ধান পেকে উঠেছে শেষ কালে—অনেক দিন পরে—অনেক দিন ধরে। বড্ড যেন দেরী হয়ে যায়। মোবারক চেয়ে চেয়ে দেখে।

ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলো মোবারক, বাপজান।...

বুড়ো ইস্‌মাইল মোবারকের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভাগাড়ের কাছে জমিটায় কত ধান হবে?

তা হবে—মণ বারো হবে।

হাড়ের সার পাওয়া জমি—হবেই তো। হাসলো মোবারক—ব'ললো,

আসছে বছর দেখবি—সব জমিতে, সকলের জমিতে ভালো ধান হবে, এ-বছর কম হাড় ছড়ান চার দিকে। সব জমিতে সার পাবে—এ একেবারে মানুষের হাড়ের সার। কতখানি ধান কাটা হ'য়েছে আমাদের?

বিঘে দেড়েক হবে।

মোটে! বিষণ্ণতায় মোবারকের কণ্ঠ ভরে উঠলো, আমি আর ধান কাটতে পারলুম না। মাঠের আর সকলের ধান কাটা হ'য়ে গিয়েছে বাপজান?

না, এই তো সব নামলো মাঠে জ্বর গায়ে। ইদিকে নায়েবের হুকুম হয়েছে সাত দিনের মধ্যে কেটে তুলে মাড়িয়ে সব শেষ করতে হবে।...

তাই তো!.... আমি আর ধান কাটায় লাগতে পারলুম না। এ যেন মস্ত একটা ক্ষোভ মোবারকের। একটু হেসে বলে, বর্ষার সময় তোকে ছুটী দিয়েছিলাম—এখন কাট বাপ্‌জান। অতো দুঃখের দু'টি ধানের চাল শেষ পর্য্যন্ত পেটে পড়বে কি-না কে জানে!....

বাজে বকিস্ নি তো।....

হাসলো মেবারক। বললো, আমাকে বাইরে একটু নিয়ে চল্ না বাপ্‌জান।....

ডাক্তার যে বারণ করেছে ঠাণ্ডা লাগাতে!

করুক বারণ। মাঠের দিকে কতদিন যে দেখি নি চোখ তুলে···নিয়ে চল্ একটু বাইরে।

বাইরের দাওয়ায় একটা চাটাই পেতে ইসমাইল মেবারককে এনে শুইয়ে দিল।

ম্লান আর বিষণ্ণ হয়ে এসেছে শীতের গোধূলি। দুরন্ত মাঠের দিকে মেবারক চেয়ে রইলো। সারা বর্ষাটা সে খেটে এসেছে ওই মাঠে আধপেটা খেয়ে। চাষের কাজ কোন রকমে সেরে তারপর বিছানা নিয়েছে সে। মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে ওই মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে। কচি ধানগাছগুলি বড় হয়ে উঠেছে—উছলে পড়েছে উচ্ছ্বসিত গভীর সবুজের বন্যায়। তারপর এসেছে

কেশর। আর মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে রোগে জীর্ণ হয়েছে মোবারক। স্ত্রী মারা গিয়েছে তার চিকিৎসার অভাবে, একে একে শেষে ফুলে মরেছে ছেলে দু'টো। তবু পাকে নি মাঠের ধান। বড্ড দেরী করে এলো ধান কাটার দিন। শয্যাশায়ী মোবারক—শেষকালে শীতের মাঝামাঝি ধরলো তাকে নিমুনিয়ায়।

শীতের সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলো—সমস্ত কিছু দুর্নিরীক্ষ হয়ে এলো ধোঁয়াটে কুয়াশায়। তবু যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মোবারক পাকা ফসল ভরা দুরন্ত মাঠের মাঝখানে তার জমির টুকরোগুলো। ওই ধান ঘরে উঠবে তার শেষ পর্য্যন্ত।...

ইস্‌মাইল ব'ললো, চল এবার ঘরে।

বাইরে বেশ লাগছে বাপজান।...

বেশ লাগছে! এদিকে ভাল মানুষ আমরা, শীতে হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু ভয়ানক ভালো লাগছে মোবারকের। অন্ধকারাচ্ছন্ন পাকা ফসলের ক্ষেতের দিকে চেয়ে মন ভরে ওঠে তার। মনে হয় তার, এতদিনে সব কাজ যেন তার শেষ হয়েছে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি একটি একটি ক'রে ফুটে ওঠে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমিনার কথা মনে পড়ে তার। গোর-দেওয়া হয় নি তাকে—ভাসিয়ে দিয়েছিল খালের জলে। সেখান থেকে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে পড়েছে সে—সে কি অনেক দূরে!....সে নিজেও হয়তো বাঁচবে না। মরে যাবে হয়তো মোবারক। ঐ ক্ষেতের দিকে চেয়ে চেয়ে মরে যাবে—তারা যেমন ক'রে মরে গিয়েছে একে একে। ইস্‌মাইল আত্মগত হয়ে ব'ললো, কেমন ক'রে সে সব শেষ হবে সাত দিনের মধ্যে!...কেন, মালিকের অতো তাড়া কিসের?

রাখাল দাস নাকি দেখে এসেছে, মহাজনি নৌকো আসছে দু'টো। ধান বেচবে—তাই অতো তাড়া হুড়ো।....

এই ধান বেচে দেবে,—আমাদের এত দুঃখের ধান!

ধানের দাম আছে—ছেড়ে দেবে এই সময়ে। তা কম ধানও তো পাবে না এবারে! আধা-আধি ভাগ, তারপর তিন বছরের ঋণ, তারপর তার সুদ।

চাষীর ঘরে, সেই নেই নেই। বেচে দেবে সব ধান!···মনে মনে বলে মোবারক।

আমাদেরও তো দু'-এক মন ছাড়তে হবে।···

ধান বেচবি!—কেন?····

কাপড় চোপড় আছে, ঘর-সংসারের জিনিষ-পত্র কেনা কাটা আছে।

আমিনা মরে গেছে, তার ছেলে দু'টো মরে গেছে—তাদের ধানটা বেড়ে যাবে, না। হেসে শুধালো মোবারক।

বুড়ো ইস্‌মাইল চটে উঠলো, না বেচলে টাকা পাবো কোথায়। তোর চিকিচ্ছে আছে—ডাক্তার এমনি আসতে চায় না। দুটি করে টাকা নেয়—তবে আসে। নামে সরকারী রিলিফের ডাক্তার—কিন্তু টাকা ছাড়া আসতে চায় না। দেখ্‌লিতো আমিনার কলেরার সময়। তারপর তোর ওষুধের দাম।

এক কাজ কর বাপজান। ওষুধ আর ডাক্তারের দরকার কি। আমিনা গেছে, ছেলে দু'টোও গেছে। তারপর আমি মরে গেলে—যে ধানটা বেড়ে যাবে তোর হিসেবে—দিল্ ভরে বেচিস তখন।····

তারপর চুপ করে যায় দু'জনে।

মেবারকের মনের সমস্ত প্রশান্তি যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় নিমেষে।

ইস্‌মাইল মুখ ভার ক'রে নিঃশব্দে উঠে গেল মোবারকের কাছ থেকে।

ওদের মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত একটা কলহ হ'য়ে গিয়েছে যেন—এমনি ভাবে মোবারক আর ইসমাইল মুখ ভার ক'রে থাকে। রাত্রিতে শুতে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত কেউ কারুর সঙ্গে আর কথা বলে না। বুড়ো ইস্‌মাইল মুখ ভার ক'রে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো একপাশে।

গা হাত পা কেমন যেন ব্যাথা ইস্‌মাইলের। ঝুঁকে ঝুঁকে ধান কাটা

সারাদিন। বিছানায় শুয়েও পেশীগুলো শরীরের যেন খিঁচে থাকে। তবু শেষ করতে হবে তাকে—সাত দিনের মধ্যে, মালিকের হুকুম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ইস্‌মাইলের—একটা অস্ফুট আর্তনাদ!

মোবারক অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মেবারকের। বাঁশের কবাটটা খুলে কে যেন বেরিয়ে গেল বাইরে। ভাঙ্গা ফুটো খড়ের চালা দিয়ে অনন্ত আকাশের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। তরল অন্ধকারে চেয়ে দেখলো মোবারক, ইস্‌মাইল বিছানায় নেই। কোথায় গেল এত রাতে সে! মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। অনেক্ষণ জেগে রইল মোবারক। ক্লান্তিতে এক সময় তার নিদ্রা এলো।

তারপর খস্ খস্ শব্দে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল তার। ইস্‌মাইল নিঃশব্দে একটা থলের ওপরে অক্লান্ত ভাবে পা ঘষে চলেছে—আর খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে একটা। যেন খড়ের মস্ মস্ শব্দ হয় আর পরিপূর্ণ নিটোল ধানগুলির পরিচিত মিঠে শব্দ একটা লাগে এসে কানে। অন্ধকারে কি ক'রছে ইস্‌মাইল কি জানি!

মোরগ ডাকে সেরআলি খাঁর: এ পাড়ায় শুধু তারই একার মুরগী আছে। আর সকলের গরু-ছাগল-মুরগী একটীও নেই। শেরআলির মুরগী চীৎকার করে থেকে থেকে।

হয়তো ভোর হ'য়ে এলো।

ইস্‌মাইল তখনও থলেতে পা ঘষে চলেছে।

তারপর এক সময়ে ইস্‌মাইল নিঃশব্দে এসে শুয়ে পড়লো।

শেষ রাত্রির অন্ধকার নিঃশেষ না হ'তে হ'তেই উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে ইস্‌মাইল আবার। হাতে কাস্তে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

মোবারক দেখে নিঃশব্দে। তারপর উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে—বাইরে কার সঙ্গে যেন কথা কাটা-কাটি হচ্ছে ইস্‌মাইলের।

এই রকম চুরি কবে থেকে শুরু ক'রেছ মিঞা ?—এঁ্যা, তুমি তো কই এ-রকম ছিলে না।

চুরি মানে !

চুরি মানে ? বলি এই যে এক্ষুনিকার কাটা খড়গুলো ঢাকবে কোথায় ? আমার এক কাঠা জমি একেবারে সাব্ড়ে দিয়েছ !···

অমনি মুখে ব'ললেই হ'লো !

কেন, তোমার জাতভাই শেরআলি দেখেছে তো। কেন, তোমার নিজের ধান হয় নি ? না সেটা বেচবে আর পরের ওপর দিয়ে যতোটা পারো—উসুল ক'রছো। আচ্ছা, নায়েবকে ব'লছি গিয়ে সব আমি।...

বুড়ো ইস্মাইলও চীৎকার করে। কোনো নিদর্শন নেই তার চুরির। এক কাঠা জমির ধান কেটে উঠিয়ে নিয়ে এলো—আর রাতারাতি মাড়িয়ে লুকিয়ে ফেললো সে ! কই, একটা ধানের কণা বাইরে পড়ে থাকতে দেখাক কৈলাস। সদ্য কাটা খড় কি তার নিজের জমির হ'তে পারে না !····

কৈলাস ব'ললো, কতদিন ধরে তোমার এই কাম হ'চ্ছে—কে জানে। আজই তো পড়লো চোখে। যাক, চললাম আমি নায়েবের কাছে।

কৈলাস অল্প কথায় আসন্ন বিপদের আভাস দিয়ে চলে গেল। ইস্মাইল দাঁড়িয়ে রইল ঠায়।

মোবারকের কণ্ঠস্বরে—চমকে উঠলো ইস্মাইল। মোবারক ডাকছে তাকে। যেতে ইচ্ছে করে না ইস্মাইলের—কেমন যেন হঠাৎ ভয় করে তার। তবু যেতে হয়।

মোবারক ক্লান্তকণ্ঠে ব'ললো, কি বলে কৈলাস ?

ও কিছু না।

কিন্তু মোবারকের কাছে বিষয়ের গুরুত্বটা স্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে এতক্ষণে। থলের মধ্যে ধানের শীষ শুদ্ধ খড় ভরে পা দিয়ে মাড়িয়েছে ইস্মাইল—শুধু আজ নয়, একদিন—দু'দিন—তিনদিন। কয়েকদিন ধরে রাত্রিতে উঠে

এই করছে ইস্‌মাইল। দেখেছে মোবারক—বুঝতে পারে নি কিছু অন্ধকারে। গাজ সবটা তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

যে ধানের জন্যে এত কাণ্ড, তাকেই তুই আবার বেচতে চাস বাপজান্!

বুড়ো ইস্‌মাইল হঠাৎ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো, সে আল্লা জানে—কন চুরি করি। কেন বেচতে চাই। একে একে সব গেছে—তুই গেলে ার আমার থাকবে কে!....আমার তো মরণ নাই।....

ইস্‌মাইল দাঁড়ায় না আর। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় কাস্তে নিয়ে।

মনটা ভারি হ'য়ে যায় মোবারকের।

তারপর সে একটা সন্ধির সূত্র খোঁজে।

মধ্যাহ্নে মাঠ থেকে ফিরে এল ইস্‌মাইল। ফিরে এসে রান্নার জোগাড় 'রতে লাগলো।

মোবারক ব'লে উঠলো, বাপজান্—আমি আজ ভাত খাব দুটী।....

ভাত! মোবারকের কথায় হঠাৎ প্রাণ মন যেন হেসে উঠলো ইস্‌মাইলের -কেটে গেল একটা দুঃসহ গুমোট মন কষা-কষির। হেসে উঠলো ইস্‌মাইল। ললো, ভাত খাবি—কিন্তু ডাক্তার যে···

মরুক তোর ডাক্তার। নতুন চাল পেটে পড়ুক দুটী—দেখবি, সব অসুখ ামার সেরে যাবে। আমি ভাত খাবো বাপজান্।

খা তবে।

শুধু ভাত আর নুন। মাটির সানকিতে ক'রে খাওয়া। পেতল-কাঁসার সন-কোসন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বহুদিন। মনের আনন্দে পাশাপাশি খেতে সলো ওরা।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে মাঠের কাজে বেরুচ্ছিল ইস্‌মাইল। মোবারক ব'লে উঠলো, আমাকে বাইরে শুইয়ে দিয়ে যা বাপজান্।

ইসমাইল বাইরে বিছানা পেতে মোবারককে শুইয়ে দিয়ে মাঠে চলে গেল।

ভাত খেয়েছে মোবারক, ভাল হ'য়ে উঠবে মোবারক। ইস্‌মাইলের স্থবির পদক্ষেপে হঠাৎ যেন দ্রুততা আসে। আমিনা মরে গেছে—যাক। আর একটি কচি মেয়ের মুখ ভাসে বুড়োর মনে। অনেকগুলি মৃত মুখের মাঝখানে একটি জীবন, কচি সুন্দর মুখ।

মোবারক শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকে মাঠের দিকে। বহুদূরে অস্পষ্ট কালো মুর্তিগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে ধান কাটছে। অনেক দিন পরে ধান কাটছে। গোরস্তানের কিছুটা দেখা যায় এখান থেকে। মাঠ থেকে চোখ ফিরিয়ে কখন চেয়ে থাকে সেই দিকে মোবারক। নিঃশব্দ নির্জন ছায়াভূমি। আমিনার কথা এসে পড়ে, ছোট দুটো ছেলের কথা এসে পড়ে। সে অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের কথায়—হৃদয় মন ভরে ওঠে মোবারকের। তারপর এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নেয় মাঠের দিকে।

সমস্ত দুপুরটা কেটে গেল এমনি ভাবে।

শীতের বিষণ্ণ-সূর্য্য অস্তে নামলো।

ইস্‌মাইল মাঠ থেকে ফিরলো যখন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মোবারকের।

ভাত দেওয়ার পর ভয় ভয় ক'রছিল ইস্‌মাইলের। মোবারকের গায়ে হাত দিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার।

মোবারক তবু হাসলো।

সন্ধ্যা উৎরে রাত হ'লো গভীর। ক্রমশ আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো মোবারক ভোরে উঠে দেখলো ইস্‌মাইল, মোবারক নিঃশ্বাস নিচ্ছে হাঁ ক'রে।

তখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ইস্‌মাইলের—কিন্তু টাকা, টাকা কোথায় পাবে সে! মাত্র দুটো টাকা। বার্ধক্যজীর্ণ শরীরে যেন ওর শেষবারের মতো সমস্ত শক্তি ফিরে আসে। কেউ যদি মজুর খাটাতো তাকে, আর দিত দুটো টাকা—

ডাক্তারের ফি। কিন্তু এ গ্রামের চাষীরা তাকে ধান কাটায় মজুর হয় তো নেবে এখুনি, টাকা দেবে না—বদ্‌লি দেবে। গ্রামে টাকা নেই।

তবু উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়ালো গিয়ে সে ডাক্তারখানার সুমুখে। ভয়-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, ডাক্তারবাবু—যেতে হবে একবার।....

যাবো। ডাক্তার নির্লিপ্তকণ্ঠে কম্‌পাউণ্ডারকে দেখিয়ে ব'ললো, বলো ওকে।

অর্থাৎ কম্‌পাউণ্ডার এখানকার স্থানীয় লোক, বিদেশাগত ডাক্তারের আর্থিক সুবিধে ক'রে দেয় এই লোকটা।

কম্‌পাউণ্ডার ব'ললো, কি হয়েছে ?....

সেই যে নিমুনিয়া হ'য়েছিল মোবারকের !...

ও। টাকা দে।....

টাকা এখন নেই ডাক্তারবাবু। ধান বেচলে দেবো। নৌকো আসছে।

যা ভাগ...

কমপাউণ্ডার অন্য রোগী নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। কোন কথার উত্তর দেওয়ার মতো সময় হয় না আর তার।

হঠাৎ চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে ইস্‌মাইলের। শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে।

আল্লা !...

তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে সে ডাক্তারখানার ভিড়ের ভেতর থেকে। নত মুখে স্থবির পদক্ষেপে এগিয়ে চললো বাড়ীর দিকে।

মোবারক মরে গেল—যেমন ক'রে তার স্ত্রী মরেছে, যেমন করে তার কচি দুটো ছেলে মরে গিয়েছে। চাটাই মুড়ে খালের জলে ভাসিয়ে দিল তাকে ইস্‌মাইল। কবর খোঁড়ার লোক নেই—জোর নেই এ পাড়ার মুসলমানদের হাতে; জোর নেই আর স্থবির ইস্‌মাইলের হাতে।

ভাটায় ভেসে গেল মোবারক। আর বুড়ো ইস্‌মাইল ধান কাটে ঝুঁকে

ঝুঁকে। ছ-দিন—সাত দিন—আট দিন কেটে গেল, এখনও হ'লো না তার শেষ।

ধান কাটতে কাটতে কখনো কখনো অন্যমনে চেয়ে থাকে সে খালের দিকে—যেখানে ভাসিয়ে দিয়েছিল মোবারককে। কাজে যেন মন বসে না। ইস্‌মাইল ফেরে একা খালের দিকে চেয়ে চেয়ে।

হঠাৎ একদিন সে চমকে উঠলো দূরে একটা মহাজনি নৌকো দেখে। তাই তো! তার কাজ শেষ হয় নি এখনও।

নৌকোর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো সে। কতকগুলো লোক, বিভিন্ন বয়সের—বস্তা বস্তা হাড় এনে ফেলছে নৌকোতে। মাঝিমাল্লারা পশ্চিমা মুসলমান। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলো ইস্‌মাইল, ধানের নৌকো দুটো কত দূরে?

জানি না তো। আমাদের দু-খানা নৌকাই তো ঢুকেছে শুধু ক্যানেলে।

পাঁচখালিতে ছিলে তোমরা?

হুঁ, সেখান থেকে একখানা নৌকো পশ্চিমদিকে চলে গেল—আমরা এইদিকে আসছি।

আর কোন নৌকো নাই?

নাঃ। আট-দশ দিনের এদিকে কোনো নৌকো দেখি নি।

তবে এরাই!....মনে মনে বলে ইস্‌মাইল। হঠাৎ হাসি পায় তার। ক্যানেল পাড় থেকে নেমে মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে সে—আর হাসে।

হাস কেন মিঞা?

মাঠের চাষীরা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে।

হাড়—হাড়ের নৌকো নিয়ে এসেছে পশ্চিমা মুসলমানরা। ধানের নৌকো নয়।

মানে?

দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞেস ক'রে এই তো জেনে আসছি।

হাড়!

পাকা ফসলের সারা মাঠ ভরে' মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে একটি কথা। াষীরা সোজা হ'য়ে কাস্তে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন বুঝতে পারছে া কথাটা কেউ।

ইস্‌মাইল হাসতে হাসতে এগিয়ে চললো মাঠ ভেঙ্গে জমিদার বাড়ীর দিকে।

কর্মচঞ্চল বৈঠক সেখানে। গোমস্তারা বছরের হিসেব ক'রে চলেছে।

গোফুর খাঁ।

ফোত। পঁচিশ মণ।

সেক্ রমজান।

ফোত। চল্লিশ মণ।

সেক্ মোবারক।

চল্লিশ মন।

ফোত। ইস্‌মাইল ব'লে উঠলো দরজার পাশ থেকে।

মানে?

বুড়ো হরিশ গোমস্তা খেঁকরে উঠলো ভবানীর উপরে।

ভবানী ব'ললো, আজ্ঞে আমি বলিনি—ওই ব'লেছে।

সকলে হিসেব থেকে মুখ তুলে দেখলো ইস্‌মাইলকে।

ইস্‌মাইল ব'ললো, কাল মরে গিয়েছে মোবারক।

হুঁ। হরিশ ব'ললো, লেখ তাহ'লে—ফোত নয়, ইস্‌মাইলের নাম।

ইস্‌মাইল বেঁচে আছে এখনও একা—বুড়ো ইস্‌মাইল।

ইস্‌মাইল ব'ললো, নৌকো এসেছে—ক্যানেলে দেখে এলাম।

একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল সারা বৈঠকখানা ভরে।

দেখলি,—ধানটান পড়েছে কিছু এ্যাঁ?

আজ্ঞে না; হাড় পড়েছে। হাড়ের নৌকো।

সমস্তটা শুনে গোমস্তারা লম্বা হিসেবের খাতা মেলে রেখে হাত গুটিয়ে ব'সলো।

ইস্‌মাইল তারপর বেরিয়ে এলো পথে। খালের ধারে ধারে এবার চললো সে ঘরের দিকে এগিয়ে।

সুমুখে চোখ পড়ে তার। দুটো লোক—অপরিচিত মুখ—আসছে তার দিকে এগিয়ে।

সুমুখে এসে শুধালো, ভাগাড় কোন দিকে মিঞা—ব'লতে পারো?

হাড়?

হুঁ।

গোরুর হাড়—মানুষের হাড় বাছবে কি ক'রে? হাসে ইস্‌মাইল।

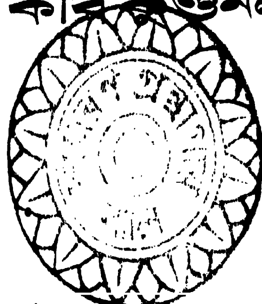
ওরা হাসলো—ব'ললো, সব—সব।....

তবে এগিয়ে যাও এই খাল ধারে ধারে।

এই খাল গিয়েছে ইস্‌মাইলের ঘরের পাশ দিয়ে। অনেক চাষী, জেলে, তাঁতী, কুমোরের ঘরের পাশ দিয়ে—অনেক গ্রামের মাঝখান দিয়ে। এইখানে আমিনা গিয়েছে, তার ছেলে দুটো গিয়েছে, মোবারক গিয়েছে, মোবারক!··· মোবারক হ'য় তো গিয়ে ঠেকেছে কোথাও—ছিঁড়ে খেয়েছে কুকুর—শকুন—শেয়ালে। হাড় পাবে—অনেক হাড় খালের দু'ধারে—ইস্‌মাইলের রাঙ্গী গাইয়ের হাড়, শিং ভাঙ্গা বলদটার হাড়—অনেক হাড়!

এগিয়ে যাও···এগিয়ে যাও এই খাল ধ'রে পশ্চিম দিকে।....

কবি কুণ্ডনলালের মেঘদূত



শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের শেষের কয়েকটা মাস আমায় বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে কাটাইতে হয়। কোন সামরিক কারণে দ্বীপটার নাম বা প্রবাসের উদ্দেশ্য আপাতত অপ্রকাশ রাখিতে হইবে।

জায়গাটি অপূর্ব্ব। একটা উঁচু কোন টিলার উপর দিয়া দাঁড়াইলেই তৃতীয়ার চাঁদের আকারে নীল সমুদ্রের রেখা দেখা যাইবে, তাহার তটদেশ হইতে চারি দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ—সবুজ—আর সবুজ। ধানের ক্ষেত, তাহারই মাঝে মাঝে নারিকেল এবং সুপারি গাছ—একখানি নিরবচ্ছিন্ন সবুজের আস্তরণ আর এই আস্তরণটি সমস্তক্ষণই একটি চঞ্চল হাওয়ায় দোল খাইতেছে। অপরূপ!

কিন্তু সেই সঙ্গে অসহ্যও। সমস্ত দ্বীপটাতে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কৃষক-পল্লী। তাহারা শুধু ধান রোয় আর ধান তোলে, এর অতিরিক্ত তাহাদের কোন কাজ নাই। অল্প দিনের মধ্যে এই সব সঙ্গীর একটানা চরিত্র-মাধুর্য্যে প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কাউপারের কবিতার আলেকজান্দার সেলকার্ক বনিয়া গিয়াছি।

এই সময় একদিন কুণ্ডনলাল আসিয়া উপস্থিত।

আমি ক্যাম্পে বসিয়া নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্যই কতকগুলা পুরাণ

হিসাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, হঠাৎ কানে আওয়াজ আসিল—"রাম রাম বাবুজী!"

খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখি একজন অপরিচিত ভদ্রলোক;—ঘুন্টি দেওয়া জামা পরা, পায়ে স্প্রিংওলা জুতা, মাথায় হলদে রঙের মাড়োয়ারী পাগড়ী। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম। দেশে বাঙালী—মাড়োয়ারী—আমরা আলাদা আলাদাই থাকি, কিন্তু এখানে মনে হইল যেন কত বড় আত্মীয়—.

"আসুন আসুন শেঠজী, হঠাৎ এখানে কি করে আসা হ'ল!..."

—ইত্যাকার প্রাথমিক আলাপে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি ক্যাম্প চেয়ারে বসাইলাম।

পরিচয় হইল। কুণ্ডনলালের বাড়ী আজমীঢ়ে, কিন্তু কয়েক পুরুষ লইয়া এখন কলিকাতাতেই বসবাস। নানা রকম জিনিসের ফলাও কারবার সমস্ত বাংলা জুড়িয়া। চার ভাই, অনেকগুলি ভাইপো, অনেক আত্মীয় স্বজন—সবাই মিলিয়া এই বহুমুখী ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এই দ্বীপটিতেও তাঁহার এই প্রথম আসা নয়, প্রতি বছরই বার দু-এক করিয়া আসেন, একবার এই সময়—ধানের অবস্থা দেখিয়া দাদন দিয়া যান, আবার একবার আসেন ফসল তোলার সময়, নিজের হিস্তের ধান চালান দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য।

বেশ চমৎকার লোকটি, খুব ঘনিষ্ঠতা জমিয়া গেল। অনেক দেশ ঘোরা আছে, গভীরতা না থাকিলেও অনেক তথ্য জানা আছে। হিন্দী সাহিত্যেও ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে, বাংলা বলিতে পারেন; তবে হিন্দীর ছুট থাকে, আর এক একটা কথা একটু বাঁকিয়া যায়।

বাসাটা একটু ভিতর দিকে, আমাদের ক্যাম্প হইতে প্রায় মাইল খানেকের পথ। কখনও আমি যাই, কখনও উনি আসেন। একঘেয়ে জীবনে বেশ একটু বৈচিত্র্য আসিল।

প্রথম পরিচয়ের দিন পাঁচ পরের কথা। কুণ্ডনলাল সকালের দিকে প্রায়ই

আসিয়া থাকেন, সেদিন আসেন নাই। একটু সকাল সকালই দেখা করিতে গেলাম। গিয়া দেখি একটা চারপাইয়ে গা এলাইয়া পড়িয়া আছেন, বারান্দার এক কোণে মুনিম কিছু টাকাকড়ি লইয়া হিসাব-কেতাব করিতেছে, অনেকগুলি লোক তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

আমি যাইতে কুণ্ডনলাল উঠিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিলেন। প্রশ্ন করিলাম, "শুয়ে ছিলেন যে শেঠজী?"

"না, এমনি।"

"আজ খানও নি সকালে।"

"না, আর কিছু না, এখানকার পানি একটু কমজোর, শরীরটা দুরুস্ত থাকে না।"

এটাই যে কারণ নয়, অন্তত আসল কারণ নয়, সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ...স্তু আর প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলাম না। গল্প জমিয়া উঠিল, তবে ...াহার মধ্যে যেন কিসের একটা অভাব রহিয়াছে। মনটাকে কুণ্ডনলাল যেন ...ানিয়া গল্পের মধ্যে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সব সময় সফলও হইতেছেন ...া। একবার একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "বাড়ীর চিট্‌ঠি ...াপনি ঠিক ভাবে পান বাঙ্গালীবাবু?"

মনে পড়িয়া গেল কুণ্ডনলালের নূতন বিবাহ।

বলিলাম, "খুব ঠিক ভাবে পাই না, তবে আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি ...য় না।

বিদেশে এক দেশের লোক, একটু হাল্‌কা রহস্যও হয় আমাদের মধ্যে ...াঝে মাঝে। ওঁর জানা আছে আমি অপত্নীক, আমিও জানি উনি এতদিন ...বপত্নীক থাকিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন।...লজ্জিতভাবে আমার ...ানে চাহিয়া কুণ্ডনলাল অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, "তফ্‌রি করছেন,—ওটি ...য দিল্লীকা লাড্ডু তা মালুম নেই তো,—যে-ভি খেলো সে-ভি পস্তালো, যে-ভি ...া খেলো সে-ভি...."

বলিলাম, "যে একবার খেলে সে আর পস্তালে কোথায় শেঠজী ? তাহলে কি দ্বিতীয়বার···"

কুণ্ডনলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "না বাঙ্গালী বাবু, আপনি বোড্ডো তফ্‌রিবাজ আছেন—বোড্ডো তফ্‌রিবাজ আছেন···"

২

আশ্বিনের শেষাশেষি হইলেও বর্ষাটা এখনও রহিয়াছে ; শরৎ এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আর আসেও বড় দেরিতে। কয়েকদিন বেশ পরিষ্কার ছিল, শরতের পূর্ব্বাভাস, আজ দুপুর থেকেই আবার বেশ মেঘলা ভাব দাঁড়াইয়াছে, বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা বাড়িয়া চলিল। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি একটু বেলা থাকিতেই শেঠজীর নিকট বিদায় লইলাম, খানিকটা আগাইয়া দিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্যাম্পে আসিতে আসিতে আকাশ বেশ ভাল করিয়া ঘিরিয়া আসিল, মাঝে মাঝে মেঘের ডাক। বোধ হয় চারিদিকে জলের জন্য এখানে ডাকটাও একটু নূতন ধরণের,—মনে হয় নীচের জলের সঙ্গে উপরের জলের যেন পরিচিত ভাষায় গম্ভীর আলাপ-মন্ত্র! ঠিক ও-ধরণের জিনিস আমরা আমাদের প্রান্তে পাই না।

এখানকার একঘেয়ে জীবনে বর্ষার দিনগুলো যেন আরও অপ্রীতিকরই বলিয়া মনে হয় সাধারণত ; বন্দীকে যেন নির্ম্মম নিঃসঙ্গ কারাগুহায় প্রবেশ করিতে হইল। সঙ্গে আমার বরাবরই কিছু বই থাকে, বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ ; এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম সেগুলা লইয়া খুবই নাড়াচাড়া করিতাম। খুব ভাল লাগিত, মনে হইত যেন বিশেষ করিয়া কাব্যপাঠের জন্যই বিধাতা এই আধ-সত্য আধ-অলীক জায়গাটিকে স্বপ্নের রাজ্য হইতে চয়ন করিয়া আকাশ-অবলম্বী করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।···· ওদিকে নিজ বাংলার মন্ত্রাণাগার থেকে মৃত্যুদূতের নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, বাংলার বৈশ্ব-সমাজ

তাহাকে জোগাইবে আহার, উল্লসিত মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সে সংবাদের একরূপ কিছুই আসিয়া পৌঁছিতে পারিত না। আমার কাব্য অলোচনা অব্যাহতভাবে চলিল কিছুদিন।... তাহার পর আসিল ক্লান্তি, একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাক্সজাত করিয়া ফেলিলাম।

আজ সন্ধ্যায় যখন প্রথম বর্ষা নামিল সেই আদিম আনন্দটি আবার ফিরিয়া আসিল। এর যশটা কিন্তু বর্ষাকে দিলাম না, দিলাম একটি নবপরিণীত যুবার ব্যথাম্লান সলজ্জ হাসিকে। অনেক দিন পরে আমি আবার পেটিকা খুলিয়া কাব্যগ্রন্থ বাহির করিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থই বাহির করিলাম—মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত।

সমস্ত রাত বৃষ্টি হইল। কুণ্ডনলালের ব্যথা আমায় সে রাত্রে বড়ই আতুর করিয়া তুলিল; মেঘদূতের প্রতিটি অক্ষর আমার কাছে নূতন অর্থে অর্থবান হইয়া উঠিয়াছে। এ যে আরও সুদূর নির্ব্বাসন;—যে জগতে কুণ্ডনলালের তন্বীশ্যামাশিখরিদশনা...যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—সমদ্রলগ্না এই স্বপ্নপুরী যে সে জগৎ থেকে আলাদা একেবারেই। এখানকার বুকের ব্যথা ওখানকার একজনের বুকে সংক্রামিত করিবে—মেঘের চেয়েও সূক্ষ্মদেহ কোথায় সেই দরদী বার্তাবহ? অনেক রাত্রি পর্য্যন্তই আমি পড়িলাম, কিন্তু দৃষ্টির গতি এতই বেদন-মন্থর হইয়া পড়িল যে আমি 'পূর্বমেঘটুকুও' শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। রাত্রের সেই স্বপ্নালু ভাবটি যদিও পুরাপুরি নাই তবু তাহার আমেজ রহিয়াছে খানিকটা। বইটাও একবার শেষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সকালবেলাকার কাজগুলা সারিয়া আমি তাঁবুর মুখটিতে আবার মেঘদূত লইয়া বসিলাম। মেঘগুলি অল্প অল্প বিভক্ত হইয়া গেছে, হাওয়াটা হইয়াছে একটু জোরালো, তাহাতে সেগুলা বেশ লঘু গতিতে উত্তর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে।...রাত্রে মেঘের এই দূতালি ভাবটা এত প্রত্যক্ষ ছিল না। তাই তখনকার সেই স্বপ্নালুতা বোধ হয় একটু কাটিয়া গেল,

কিন্তু তাহার জায়গায় বেশ একটি নূতন সজীবতা আসিয়া পড়িল। একটুর মধ্যেই আমি আবার বেশ ডুবিয়া গেলাম।

'পূর্বমেঘ' শেষ করিয়া ক্যাম্প-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম। মনটা আরও একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছি, এইবার—

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীসং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

—সেই অলকাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে; এমন সময় দেখি কুণ্ডনলাল মন্থরগতিতে এই দিক পানে চলিয়া আসিতেছেন।

বড় আনন্দ বোধ হইল। মনে হইল মেঘদূতের বিরহী যক্ষই যেন সারা রাত্রির সাধনার ফলে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত, একটু বেশি আগ্রহ করিয়াই সেদিন অভ্যর্থনা করিলাম। কুণ্ডনলাল আমার পাশেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

মনটা বেশ প্রফুল্ল কালকের তুলনায়। একটু রহস্যের আভাসেই প্রশ্ন করিলাম, "আজ শেঠজীকে একটু প্রসন্ন দেখছি, চিঠিপত্র কিছু এল নাকি সকালের বীটে ?"

কুণ্ডনলালের মুখটা হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"আগ্যে হাঁ বাঙ্গালীবাবু, এলো একঠো চিট্‌ঠি, আমার নিজের নামে সওয়া-ছ'টাকা দরে যে ঢাই হাজার মোন চাল ধরে রেখেছিলাম, তার দাম সারে নো টাকা হয়ে গেল; আরও তেজ হোবে।"

এত বড় আঘাত আমার কাব্যানুভূতি কখনও পায় নাই। তবুও মনের ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করিয়া আনন্দের সহিত অভিনন্দন জানাইলাম। অন্য কথাও আসিয়া পড়িল, কুণ্ডনলালের অন্তরের আনন্দ যেন সব তাতেই উছলিয়া পড়িতেছে। ক্রমে মনকে প্রবোধ দিলাম—এত যখন, তখন কুণ্ডনলাল মুনাফার চেয়েও মিষ্টতর কিছু আজকের ডাকে পাইয়াছে নিশ্চয়, লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না।

বইটা একটা ছোট টেবিলে রাখা ছিল, একবার কুণ্ডনলাল তুলিয়া লইল ; বইটি বাংলা অক্ষরে বাংলা-সংস্কৃতের একটি চিত্রিত সংস্করণ। একটু নাড়াচাড়া করিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি কেতাব পড়ছিলেন বাঙ্গালীবাবু ?"

বলিলাম, "মেঘদূত।"

"মেঘদূত ?—অচ্ছা !...."

প্রশ্ন করিলাম, "পড়েছেন নিশ্চয় ?"

"না বাঙ্গালীবাবু, নাম-ধর্ শোনা আছে। বাৎ কি আছে ওর ভেতর ?"

বলিলাম, "মেঘদূত হ'ল মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে...."

কুণ্ডনলাল প্রশংসা এবং বিস্ময়ে একটা চোখের ভ্রূ তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অচ্ছা ! কবি কালিদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে। ...আগে ?—কাব্যের বিথয় কি আছে ?"

বলিলাম, "বিষয় মোটামুটি এই যে, একজন যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যাচলের রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হয় ; সে পাহাড়ের গায়ের মেঘকে প্রার্থনা জানাচ্ছে—হিমালয়ের অলকাপুরীতে আমার প্রেয়সীর কাছে আমার খবর পৌঁছে দাও..."

কুণ্ডনলাল অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন, "অচ্ছা ! তাহলে বাঙ্গালীবাবু, হাওয়াই জাহাজের মতোন ওয়ারলিসেরও পত্তা ছিল হিন্দুদের ! মেঘের বিদ্যুৎকে...."

বলিলাম, "না, ওয়্যারলেস নয়, কবির কল্পনা ; তিনি গোড়াতেই বলে দিয়েছেন—"কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"—অর্থাৎ বিরহী জন চেতন-অচেতনের ভেদাভেদ বোঝে না। তাই মেঘকে সজীব কল্পনা করেই যক্ষ তাকে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ নিয়ে যেতে বলছে। কোন্ পথে যেতে হবে, কোথায় কি দেখবে, কোন্ সহরের কি বিশেষত্ব—এই সমস্তের একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে গেছেন কবি...."

"অচ্ছা !—সমস্ত পথের বর্ণনা দিয়ে গেছেন ! আমায় কুছ্ কুছ্ শোনান বাঙ্গালীবাবু, বড়ো দিলচস্পী মালুম হোচ্ছে।"

কৌতূহল জাগ্রত হইতে দেখিয়া আমারও লুপ্ত উৎসাহ খানিকটা ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "আপনার যদি ভাল লাগে শেঠজী তো না হয় সমস্তটাই পড়া যাবে দু'জুনে মিলে—অবসরেরও অভাব নেই, আর জায়গাটিও কাব্য পড়বার মতনই—আপনার মনে হয়না তাই ?"

যতদূর দেখা যায় সবুজের ঢেউ, উপরে চঞ্চল খণ্ডিত মেঘের অভিযান, বহু দূরে নীল সমুদ্রের একটি সরু ফালি—যেন অবগুণ্ঠিতা কাহার টানা দু'টি চোখ কৌতুকভরে সমস্ত দৃশ্যটির পানে চাহিয়া আছে।

কুণ্ডনলাল একবার সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া আনিয়া কতকটা আবেগ-ভরেই বলিলেন, "সত্যি বাঙ্গালীবাবু, এরকম চোমোৎকার দৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি, আর ধান ত যেন লছমী মাইয়ের খাজানা আছে। বোড্ডো মেহেরবানি হয় যদি আপনি আমায় মেঘদূত পড়িয়ে শোনান্।....অচ্ছা! বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় পর্য্যন্ত বিলকুল জায়গার বেয়ান আছে ? খুব চিলচস্পী হোবে

কাল্কের রাত্রের সেই ব্যথাতুর ভাবটির পর থেকেই আমি বুঝিয়াছিলাম লোকটি ভাবুক,—উপরে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ পান বলিয়া আরও ভাল লাগিল। এমন জায়গায় এমন একটি দরদী মনের স্পর্শ পাইয়া আমার মনের কপাটও যেন খুলিয়া গেল। বলিলাম, "তা'হলে শেঠজী, আপনি খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে আসুন আবার। এ জিনিস এক বৈঠকে শেষ না করলে রসটা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। আমিও যে কাজগুলো আছে সেরে রাখব, আজ তা'হলে কাব্যচর্চাই চলুক।"

ভিতরের আগ্রহে কুণ্ডনলালের মুখটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন, "বোড্ডো মেহেরবানি হোবে বাঙ্গালীবাবু, কিন্তু এখন কুছভি ত 'জয়-গণেশ' করে দিন, আমার জানতে বোড্ডো ইরাদা হচ্ছে।"

একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আমাকে। বলিলাম, "সে ত আনন্দের কথা শেঠজী—এত যখন আপনার আগ্রহ। ব্যাপারটা ঐ বলিলাম বিরহী যক্ষ মেঘকে তার প্রেয়সীর কাছে দূত করে পাঠাচ্ছে। সমস্ত কাব্যটি দু'টি ভাগে বিভক্ত—পূর্বমেঘ আর উত্তর মেঘ। পূর্বমেঘ হচ্ছে যাত্রাপথের কাহিনী। গোড়াতেই দেখি আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরির সানুদেশ-সংলগ্ন মেঘ দেখে বিরহী যক্ষ কুর্চিরফুল দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে প্রেয়সীর কাছে পাঠাচ্ছে। তার পর পথের নির্দেশ—বলবে, হে মেঘ, সে পথ নানা রকম আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে তোমার মনস্তুষ্টি করবে—কোথাও পথিক বধূরা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় মুখ থেকে হালকা কেশের গুচ্ছ সরিয়ে চোখ তুলে তোমার ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করবে—কোথাও সার বেঁধে বলাকা তোমার বুকে দুলবে—কৈলাসগামী রাজহংস ঠোঁটে মৃণাল কিশলয় নিয়ে তোমার সাথী হবে। কোথাও বর্ষায় ধোওয়া ক্ষেত থেকে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠবে—কৃষক বধূরা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তোমার পানে থাকবে চেয়ে। উত্তরে যেতে যেতে এলে তুমি আম্রকূটগিরি। হে মেঘ, সেই গিরিশিরে যে দাবানল প্রজ্জলিত হয়েছে, তোমার উচ্ছল জলধারায় তাকে নিভিয়ে দিও, গিরিরাজ তোমায় সাদরে মস্তকে ধারন করবেন। সেখানে অল্প বিশ্রাম নিয়ে রেবা নদী পার হয়ে তুমি দশার্ণ ভূমিখণ্ডে এসে পড়বে। অপূর্ব সেই দেশ, বিশেষ করে অপূর্ব তার রাজধানী বিদিশা নগরী। সেইখানে বেত্রবতী নদীর জল পান করে পথের ক্লান্তি দূর করে তুমি গিয়ে উঠবে নীচৈঃ পর্বতে। তোমায় দেখে আনন্দে কদম্ব ফুল সব উঠবে ফুটে, তার পর তোমার জলকণা দিয়ে যুঁই ফুলের কুঁড়িদের ফোটাতে ফোটাতে...."

কুণ্ডনলাল মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছেন, এত আবিষ্ট যেন মেঘের সঙ্গে কৈলাসগামী রাজহংসের মতোই রামগিরি হইতে নীচৈঃ পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া আসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা! এই রোকোম করে

সমস্ত রাস্তার চেয়ান দিয়ে দিলে? কালিদাস তো নিজেই দিয়েছিলেন বাবু? বড়া ধুরন্ধর কবি ছিলেন তো—সমস্ত রাস্তার হালচাল জানতেন,—অচ্ছা!"

বলিলাম, "এ তো আপনাকে শুধু কাঠামোটা বলছি শেঠজী, একটি একটি করে বর্ণনা যখন শুনবেন।"

"তারপর এল উজ্জয়িনীর বর্ণনা—যক্ষ বলছে, হে মেঘ একটু ঘুর হলেও তুমি উজ্জয়িনী পুরী হয়ে…"

"উর্জ্জেন!—কোন্ উর্জ্জেন বাঙ্গালীবাবু?"

বলিলাম, "এই উজ্জয়িনীই, আবার কোন্ উজ্জয়িনী?"

"সে ত আজমীরের কাছে।"

"কাছেই ত, তোমাদের ওদিককারই ব্যাপার ত মেঘদুত।"

"অচ্ছা!"

বলিয়া এমন স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, মনে হইল কাব্য আর এই কঠিন বাস্তব কুণ্ডনলালের কাছে যেন এক হইয়া গেছে। প্রশ্ন করিলেন, "কবি কালিদাস আর কি ব্যেবসা করতেন বাবুজী?—অনেক মুলুক ঘোরা ছিল…."

বলিলাম, "কবি আর কি করবে শেঠজী?—কাব্য লিখতেন আর রাজাকে শোনাতেন—উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম শোনা আছে নিশ্চয়?"

কুণ্ডনলালের চোখ দুইটি আনন্দে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিয়াছে, একটু সোঝা হইয়া বসিয়া বলিলেন, অচ্ছা! "আপনি বিক্রমাদিত্যের নওরতনের কথা বলছেন। এখন বুঝেছি, ইয়াদ পড়েছে।….বড় আনন্দ হোল বাবুজী—বড় আনন্দ হোল… আগে?…."

বলিলাম, "এই করে করে দশপুর, তারপর আর্য্যাবর্তে এসে কুরুক্ষেত্র, ক্রমে কনখল, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, সর্বশেষে মানস-সরোবর—কবি লিখছেন—হেলাম্ভোজ

প্রসবি সলিলং মানসস্তাদদান—যার জলে সোনার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেই মানস-সরোবরের....”

“অচ্ছা!” বলিয়া কুণ্ডনলাল নিরতিশয় বিস্ময়ে আমার পানে একটু চাহিয়া বলিলেন, “সোনাকা কমল বাঙ্গালীবাবু?”

একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, “শেঠজীর যে লাল পড়ে গেল একেবারে! সত্যি কি আর সোনার কমল? ওটা কবির...”

কুণ্ডনলাল লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, “না, আমি সে কথা বলছি না, সে কথা না,—বলছিলাম মহাকবির—কি আশ্চর্য্য কল্পনা! আগে বাঙ্গালীবাবু?”

বলিলাম, পূর্বমেঘ এইখানেই শেষ হ'ল। তারপর উত্তরমেঘ—প্রথমেই অলকাপুরীর বর্ণনা—কি তার সৌন্দর্য্য, কিবা তার ঐশ্বর্য! সেখানকার অধিবাসীদের কি বিলাস-ব্যসন! সে এক অপরূপ জগৎ। নগরীর পর নিজের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়ে যক্ষ নিজের প্রেয়সীর কথা এনে ফেললে—বলছে হে মেঘ, যদি সেই সময় প্রেয়সী আমার নিদ্রামগ্ন থাকে ত গর্জন করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিও না যেন, কেন না হয়ত সে স্বপ্নে আমায় বক্ষে ধারণ করে রয়েছে তোমার গর্জনে তার ভুজলতা শিথিল হয়ে যাবে....”

কুণ্ডনলাল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, “অ-হ-হ কেয়া খুবী হায় বাবুজী—কল্পনার কোতো দৌড়!”

একটু হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলাম, “তারপর তাকে শীতল হাওয়ার স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিয়ে বলবে—‘হে সধবে, তোমার প্রিয়তমের বার্তা বহন করে এনেছি—তিনি কুশলে আছেন—দুঃখ শুধু তাঁর বিচ্ছেদভার; তিনি আমার মুখে তোমার কুশল চান।’... তারপর শ্লোকের পর শ্লোক চলেছে বিরহব্যথার বর্ণনা করে। সে যে কি অপূর্ব শেঠজী!...

একটু শীঘ্রই সেদিন উঠিলেন কুণ্ডনলাল—সকাল সকাল আসিয়া পড়িবার জন্য। গতি খুব মন্থর; মেঘের চেয়েও অশরীরী যেন কবিতার উপর ভর করিয়াই চলিয়াছেন।

৪

কুণ্ডনলাল কিন্তু বিকালে আসিলেন না।

প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্তি আর গ্লানিতে মনটা ভরিয়া গেল। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌....হুঁঃ, সে দাদনের হিসাব রাখিবে, না, 'মেঘদূতে'র রসাস্বাদন করিবে?

বিকাল কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যা আসিল; মেঘটা আবার বেশ জমিয়া আসিয়া কাব্যের আসরটা জমকাইয়া আনিতেছে। ....এক একবার মনে হইতে লাগিল—আসিবেনই বোধ হয় কুণ্ডনলাল। মেঘদূত অমন করিয়া যাদু করিল ওঁকে, আর না আসিয়া পারেন?

সন্ধ্যাও উৎরাইয়া গেল। তখন আমার হঠাৎ ভয় হইল—অসুস্থ হইয়া পড়েন নাই তো?....বিদেশ, বিশেষ করিয়া ওঁর মধ্যেকার নীরব কবিটির সেই দিনই সাক্ষাৎ পাইয়া আমার মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। টর্চ আর জামাটা লইয়া আমি ওঁর বাসার অভিমুখে চলিলাম।

দেখি বারান্দায় একটি সতরঞ্চির উপর একখানি ধবধবে চাদর বিছাইয়া একটি বাক্সের উপর একতাড়া কাগজ লইয়া কুণ্ডনলাল বসিয়া আছেন, হাতে একটি শরের কলম, কাছেই একটি মস্যাধার আর বালির পুঁটুলি! চক্ষু দুইটি দূরে মেঘলগ্ন।

সব চেয়ে যা সুন্দর, আর এই চিত্রটাকে পূর্ণতা দিয়াছে তা সদ্যফোটা একরাশ মালতী ফুলে ভরা একটি পিতলের রেকাবি।

একটি বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ সামনে আসিতে হয়। কুণ্ডনলাল আমাকে দেখিয়াই নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাগজগুলা গুটাইয়া ফেলিবার চেষ্টার সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করিলেন! হাঁকিলেন, "আরে, কুর্শি লে আও।"

একটা তীব্র আনন্দের সঙ্গে তীব্রতর অনুতাপ মিশিয়া আমার সমস্ত চেতনাটাকে যেন মথিত করিয়া দিল,—এই লোকটিকেই অরসিক ভাবিয়া

মনে মনে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম?···স্নিগ্ধ প্রীতিভরে তাঁহার কাঁধে একটু চাপা দিয়া বসিতে বলিলাম, "আজকের দিন এই ফরাসের জন্যেই শেঠজী, কুর্শি থাক্।···আপনি কি যেন লিখছিলেন।"

কাগজগুলা বাণ্ডিলে পাকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কুণ্ডনলাল লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ও কিছু নয় বাঙ্গালীবাবু—এমনি বসে বসে একটু····"

আমি ততক্ষণে দেখিয়া ফেলিয়াছি কুণ্ডনলাল কবিতা রচনা করিতেছেন—যেমন্ আয়োজন আর যেমন অবস্থা, বুঝিলাম "মেঘদূত" জাতীয়ই কিছু।

ওদিকে বর্ষার আয়োজন আরও নিবীড় হইয়া উঠিয়াছে, একটু আবেশ-স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "শেঠজী, আপনি এত রসিক, তার ওপর কবি—জানতাম না তো! আপত্তি যদি না থাকে তো যদি দেখবার সৌভাগ্য হোত···কেননা কাব্য কবির নিজের জীবনকাহিনী হলেও সাধারণের তাতে অধিকার।"

কুণ্ডনলাল অতি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "বাবুজী, একেই তো কিছু নয়··· নেহাৎ এক সময় একটু অব্যেস ছিল, তাই···তার ওপর আবার হিন্দী····"

বলিলাম, "আটকাবে না, আমার জানা আছে হিন্দী একটু একটু····"

আরও একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কুণ্ডনলাল কাগজের বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়া দিলেন—

অপূর্ব, অদ্ভুত কাব্য! জীবনে এমনটি আর কখনও পড়ি নাই! কুণ্ডনলাল তাঁহার মেঘদূত শেষের দিক থেকেই আরম্ভ করিয়াছেন:

"হে মেঘ, তুমি বড়বাজারে ২৭।৩এ, গোয়েঙ্কা লেনে আমার প্রেয়সী শ্রীমতী লছমীবতীর নিকট গিয়া বলিবে সে যেন আমার জন্য কিছুমাত্র না ভাবে। এবারে গতবারের চেয়ে অনেক বেশি চাষাকে দাদন দিয়াছি এখানে; লড়াইয়ের জন্যে রেটও খুব "সুবিস্তা" আছে—মোন পিছু সাড়ে পাঁচ টাকা তো এখনই আসিয়া যাইতেছে। তিন হাজার মোনের দাদন দেওয়া, তিন পাঁচে পনের হাজার টাকা! আমার প্রিয়াও যেন নিদারুণ বিচ্ছেদে হিসাবটা খতাইয়া দেখিয়া এর থেকে সান্তনা লাভ করেন।

এইবার হে মেঘ! আমার প্রিয়ার কাছে যাইবার রাস্তাটা তোমায় বলিয়া দিই, তুমি গভীর আনন্দ লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইও। সমুদ্রটুকু পার হইয়া প্রথমেই দেখিবে জমির ওপর যেন বড়-চাঁদির পাত বিছানো আছে। দেখিলেই বুঝিবে এটা রোহিলগঞ্জের মুনের আড়ৎ। মুনের রেটটা জানিয়া লইয়া তুমি নোয়াখালি ও পরে চাঁদপুর হইয়া সিধা নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইবে। প্রকাণ্ড পাটের আড্ডা। যদি পথশ্রান্ত হইয়া পড় তো আমার খুড়শ্বশুর নেকিরাম গণপৎলালের পাহাড়-প্রমাণ পাটের মাথায় দাঁড়াইয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইতে পার।

হে মেঘ, নেকিরাম গণপৎলালের গুদাম ছাড়িয়া আরও মাইল দুয়েক উত্তরে কুণ্ডনলাল বিলাসমলের একটি বিরাট পাটের গাদা দেখিবে। আজ রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় সেই পাটে হঠাৎ আগুন লাগিবে। হে মেঘরাজ, তুমি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ, তায় সমুদ্র হইতে প্রচুর জল আহরণ করিয়া লইয়া আরও কোমল হইয়া যাইবে, কিন্তু বিরহী কুণ্ডনলাল করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছে—সে আগুন তুমি কোনমতেই নিভাইতে যাইও না।—পাটের গাদাটি ফায়ার ইন্সিওরেন্স অর্থাৎ আগুনের বীমা করা; পুড়িয়া গেলে আমার তের হাজার টাকা লাভ, নিভাইলে আমি একেবারে বসিয়া পড়িব। তোমায় প্রিয়ার নিকট যখন গোপন সমাচার দিয়া পাঠাইতেছি, তখন আশা করি এ বিশ্বাসটুকুরও মর্য্যাদা রাখিবে।

হে মেঘ, এর পর তোমার পথ পূর্ব দিকে, কিন্তু একটু ঘুর হইলেও হে সখা, তুমি একবার হবিগঞ্জের দিকটা হইয়া যাইও। যেখানে পাটের জন্য এবার আমার বিস্তর দাদন দেওয়া আছে। অথচ কাল আমার ভাইপো হাজারীমলের পত্র পাইলাম—বৃষ্টির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ওখানকার পাট নষ্ট হইলে আমি এখানকার ধানে আর নারায়ণগঞ্জের পাটে যে টাকাটা "নফো" করিব তাহার চেয়ে মোটা টাকা বাবদ মার খাইয়া যাইতে হইবে...."

এই রকম সব কাণ্ড, ছয় পাতা কাব্য লেখা হইয়া গেছে কুণ্ডনলালের।

হবিগঞ্জের পর মেঘ আর উত্তরে না গিয়া সোজা গোয়ালন্দে চলিয়া আসিবে সেখানে কুণ্ডনলাল—হীরাবক্সের নামে ষ্টীমার ঘাটে কুলীর ঠিকা লইবার চেষ্টা করিতেছেন কুণ্ডনলাল।—একটু খোঁজ লইয়া এবং মুনিমকে একটু তৎপর হইতে বলিয়া মেঘ কলিকাতার আগে সবচেয়ে বড় পাট আর কাপড়ের আড্ডা কুষ্টিয়ায় গিয়া উঠিবে....আর একটি বিশেষ দরকারি কথা : হে বারিদ, আমার এই প্রবাসের সময় আমা হইতে বিচ্ছেদের জন্য আমার প্রেয়সী নিশ্চয় সোনার গহনাগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার শূন্য অঙ্গের কথা মনে করিয়া আমি মর্মান্তিক দুঃখিত, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কাজের পরামর্শ দিই : সোনার দর এখন খুব চড়া, জাপানীদের যেমন মতলব দেখিতেছি একটু অগ্রসর হইলেই দরটা হু-হু করিয়া নামিয়া যাইবে, অতএব তাঁহাকে বলিবে—হে চারুহাসিনি, তুমি যদি গহনাগুলি ফেলিয়া না রাখিয়া বিক্রয় করিয়া ফেল তো তের হাজার টাকার গহনায় কিছু নয়তো দশ হাজার টাকা মুনাফা পাইবে,—ঘরে বসিয়া তাহার পর সোনার দর নামিলে যখন আমি দীর্ঘ বিরহের পর 'হা প্রিয়া, হা প্রিয়া' করিয়া ফিরিব—তখন আবার মুনাফার টাকাটা বাক্সয় রাখিয়া ধীরে-সুস্থে ঐ তের হাজার টাকার গহনা গড়াইয়া লইলেই চলিবে।

এই রকম কোথায় সরষে, কোথায় তিসি গাদি করা আছে—আবার কোথায় আগুনের বীমা করা পাটের গুদাম—কত মুনাফা পিটিবার মতলব করিয়া রাখিয়াছেন কুণ্ডনলাল, কোথায় বা দেউলিয়া মারিয়া—কুণ্ডনলাল মোতিভগৎকে উল্টাইয়া মোতিভগৎ-কুণ্ডনলাল করিবার শুভ উদ্যোগ হইতেছে—সেই সব পরম বিস্ময়কর এবং কবিত্বময় কাহিনী বিরহিণী ষোড়শী বধূর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার অনুরোধের সঙ্গে গহনার সদ্‌গতির উক্তবিধ পরামর্শ।

শেষের দিকে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া কুণ্ডনলাল এক সময় রেকাবি হইতে এক মুঠা ফুল লইয়া আলগাভাবে লুফিতে লুফিতে একটু সলজ্জ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেমোন লাগল বাঙ্গালীবাবু? খুব দুরুস্ত হয়েছে কিনা।..."

বলিলাম, "দুরন্ত হওয়ার কথা বলছেন কি কুণ্ডনলালজী,—আপনার মেঘ যখন বড়বাজারে ২৭৷৩ এ, গোয়েঙ্কা লেনে পৌঁছুবে ততক্ষণে সে তো একজন মহাশেঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা পুরো জীবনেও কেউ এমন তালিম পায় না। এখন শ্রীমতী লছমীবতীর কাছ থেকে আবার ওদিককার মুনাফার হিসেবটা কি রকম আসে জানবার আগ্রহ লেগে রইল।"

ক্যাম্পে ফিরিয়া খাবারটা মেসের চাকরদের বাঁটিয়া লইতে বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।



লন

শনিবার

'ানের

ন—যাহার

শ্রীরামপদ মুখো

মোহনবাগানের

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের বয়স যতই বাড়িতেছে—জানেন তো।
চিহ্নগুলিকে ততই সে নির্ব্বিচারে মুছিয়া লইতেছে। প্রশ্ন
নির্ম্মম পরিমার্জ্জনার দ্বারা মাঝে মাঝে জগৎ-সৃষ্টির ধারাটি
কি না—সে প্রশ্ন এখানে করিয়া লাভ নাই। শুধু সৌরজগৎ চলে।
পুরাতন মানুষকে কি শক্তিক্ষয় করিয়া একান্ত ট। ওই হিসেবে গ্রহণও
তাহাই মাঝে মাঝে ভাবিয়া থাকি। গুরু
গুরুতর জনেরা আলোচনা করুন। যুদ্ধোত্তর
সংবাদপত্রে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে—যুদ্ধজীর্ণ লিলেন, আহা—করেন কি?
বা তাচ্ছিল্যমিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি, আরম্ভ করে দিলেন!
থাকাটাই স্বাভাবিক। কণ্ট্রোলের চাপে অশ নিন্ শীল্ড—বাঙালী তো। একে
যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন আমরা হইয়াছি লোর সমস্যা আর বাড়ান কেন
পরিকল্পনাই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে
নিরালম্বের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছি ম বাঙ্গালই হোক—আমরাই তো।
স্পর্শ করিতে না পারিলেও ছোট ছোট ক কথ্য ভাষাতে তিনি সমন্বয় সাধন
মাঝে মাঝে অশান্তি জাগাইয়া তোলে মোলায়েম ভাবে হাসিলেন।
ধরা যাক্।

প্ল্যাটফরমে চীনাবাদাম ভাজা ও খবরের কাগজের হকাররা অভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছিল। শীর্ণকায় লোকটি জানালায় ঝুঁকিয়া দুই পয়সার চীনা বাদাম কিনিলেন, স্থূলকায় ভদ্রলোক কাগজওয়ালাকে ডাকিলেন।

কিন্তু সে কাগজওয়ালা নহে। কতকগুলি চোখ-ধাঁধাঁনো মলাট-সর্ব্বস্ব নভেল লইয়া উচ্চকণ্ঠে তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিতেছিল।

কাগজ আছে ? মানে মাসিক পত্র ?

আজ্ঞে না, ভাল ভাল নভেল আছে। যমে মানুষে লড়াই, হিটলার সকাশে যতীন—

বলেন কি, যতীনের সাহস ত খুব !

আজ্ঞে হাঁ—দেখুন না পড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসবে।

না বাপু, একেই ভিড়ের ঠেলায় ওটা যথেষ্ট অনুভব কচ্ছি, পয়সা খরচ করে আর—

তবে—যমে মানুষে লড়াই—

দুর মশায়, এই বাজারে যমে মানুষে লড়াই থাকে কখনও। গলায় গলায় ভাব।

তবে যা খুশী তাই একখানা নিন্।

মাসিক থাকে তো দাও, নইলে কেটে পড়।

সে চলিয়া যাইতেই আসল হকারকে পাওয়া গেল। দুই হাতে ও বুকে আগলাইয়া নানান রকমের ছোট-বড়-মাঝারি-লম্বা-চওড়া সাইজের পত্র ও পত্রিকা লইয়া সে দেখা দিল।

কি আছে মাসিক পত্র ?

তাহার অনর্গল নাম-প্রবাহে বাধা দিয়া ভদ্রলোক দুইখানি মাসিক পত্র বাছিয়া লইলেন। একখানি অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারীচিত্রিত, অন্যখানি মোরগচিহ্নিত। যুদ্ধের বাজারে যাহারা পালাক্রমে সুলভ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে।

দাম ?

আজ্ঞে—সাত আর চার এগারো আনা।

ভদ্রলোক একখানি এক টাকার জরাজীর্ণ ও মসীমলিন নোট বাহির করিলেন।

আজ্ঞে—ওটা বদলে দিন।

কেন?

আজ্ঞে—আমরা গরীব মানুষ।

এটা ভাঙ্গিয়ে চৌষট্টি পয়সাই পাবে বাপু, যদিও পয়সা আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না।

বদলে দিন বাবু।

বাবু প্রসন্ন হইয়া একখানি ফরসা নোট দিলেন।

হকার নামিয়া যাওয়ার পর পাশের ভদ্রলোক ভাল করিয়া পত্রিকার মলাট দেখিয়া বলিলেন, দাম বেশি নিয়েছে।

কিসে?

এই দেখুন—ছ'আনা আর তিন আনা লেখা রয়েছে।

বটে! এই হকার—হকার! হন্তদন্ত হইয়া ভদ্রলোক আসন ত্যাগ করতঃ জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

হকার আসিলে হুঙ্কার দিলেন, কত দাম নিয়েছ হে?

সাত আনা আর—

বটে—এ কি মগের মুলুক! মোরগচিহ্নিত কাগজখানি তুলিয়া বলিলেন, এটায় লেখা আছে কত?

আজ্ঞে—ছ' আনা। তা ছাড়া আপিসের দু'পয়সা আর আমাদের দু' পয়সা। মোট সাত আনা।

আব্দার! তাহ'লে মুদ্রাকরের দু'পয়সা, প্রুফরীডারের দু'পয়সা, কম্পোজিটারের—

নিরুপায় হকার একটি আনি ফিরাইয়া দিয়া কহিল, আপিসের লাভটা ছেড়ে দিলাম না হয়।

সে নামিয়া গেলে ভদ্রলোক কহিলেন, তবুও ঠকালে এক আনা। কাগজের ব্ল্যাক-মার্কেট নেই—তবুও—

পাশের শীর্ণকায় ভদ্রলোক কহিলেন, কে বললে মশাই, কালো বাজার সকলকারই আছে—শুধু পত্রিকার নেই।

এদিকে জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও চাপিয়া আসিল। মোহনবাগান-হিতৈষীরা নানারূপ উদ্বিগ্ন মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ছোট কামরা। বসিবার স্থান নাই, তবু লোক উঠিতে লাগিল। এক ছোকরা মুটের মাথায় সুটকেস চাপাইয়া আধভেজা অবস্থায় কামরায় উঠিতেই স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অন্য গাড়ো দেখুন—অন্য গাড়ী দেখুন।

ছোকরা মোট যথাস্থানে রাখিবার নির্দ্দেশ না দিয়াই তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মোলায়েম বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কি করে জানলেন?

কি জানলাম?

যে অন্য গাড়ী দেখি নি? গাড়ীর আগা পাশতলা দেখে তবে আসছি। এই দেখুন জামা কাপড়ের অবস্থা।

ভদ্রলোক নির্ব্বাক হইয়া পত্রিকায় মনোনিবেশ করিলেন।

অতঃপর দুয়ারে ঠেলাঠেলি সুরু হইল। নানা কথা—নরম, গরম, সরস, তিক্ত বহু কথায় গাড়ী কল কল করিয়া উঠিল। বহু কণ্ঠোত্থিত কোলাহলকে মনে হইল গাড়ীরই ভাষা। শনিবারে আকণ্ঠ বোঝাই গাড়ীর ভাষা আছে বই কি। নানান ঠিকানার নানান মানুষে বোঝাই—বিচিত্র পণ্য-সম্ভারে ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় সমৃদ্ধ গাড়ী—দু'টা পঁচিশের টাইম টেবলের নম্বর দেওয়া কতকগুলি বগি-সমন্বিত প্রাণহীন গাড়ী সে নহে।

ভিড়ের চাপে একটি মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হইতেই কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সরুন—সরুন মশাই, মেয়েছেলেকে জায়গা দিন।

যুদ্ধ অনেক কিছুই মুছিয়া লইতেছে। কে জায়গা দিবে? উহারই মধ্যে কিন্তু একজন সহৃদয় কষ্ট স্বীকার করিয়া মহিলাটিকে বসিবার জায়গা দিলেন। তারপর কতকগুলি ভেণ্ডার উঠিল। আরও লোক এবং ট্রাঙ্ক, পুঁটুলি উঠিল। হাত পা আড়ষ্ট করিয়া কতক্ষণে গন্তব্যস্থানে আসিব সেই ক্ষণই বুঝি গণিতে লাগিলাম।

কিন্তু প্রাথমিক দুঃখে অভিভূত হওয়াটাই মানুষের স্বভাব। দুঃখের মধ্যধামে সে ভাবটা কাটিয়া খানিকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া যায়। ওই মাথামাখি ভাবের মধ্যেই কখন শরীরের চারি পাশ ঈষৎ আলগা বোধ হইতেছে ও কাহারও কাঁধের পাশ দিয়া—কাহারও পায়ের ফাঁক দিয়া হাত ও পা-কেও দিব্য চালনা করিতেছি। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, তবু পত্রিকার রস গ্রহণে বা সংবাদপত্রের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। এই ফাঁকে পার্শ্ববর্ত্তীর সঙ্গে কেহ বা সাংসারিক আলাপে জমিয়া গিয়াছেন—কেহ বা বর্ত্তমান বাজার-দরের কথা সখেদে পরিতৃপ্তি সহকারে বিবৃত করিতেছেন। যতই শক্ত বাঁধনে দুঃখ আমাদের বাঁধিতেছে—ততই শ্লথ হইবার মন্ত্র যেন আমাদের আয়ত্তে আসিতেছে। কষ্টকেও আজ কষ্ট করিয়া আমাদের সঙ্গে দৌড় করাইতেছি। পাঁচ বছর আগে এমন জাঁক করিয়া চার টাকা সেরের মাছ—পাঁচ টাকা সেরের ঘি—দশ টাকা জোড়ার কাপড় এবং কণ্ট্রোলের কাঁকরমণি চাউলের কথা গল্প করিবার কল্পনা আমাদের ছিল কি? সেকালের কোন নবাবজাদা এখানে আবির্ভূত হইয়া—নবাবী আমলের ঐশ্বর্য্য লইয়া আজ আমাদের লুব্ধ ও ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না নিশ্চয়।

অবশেষে গাড়ী ছাড়িল। ও-পাশের স্থূলকায় ভদ্রলোককে আর দেখা যায় না, ভিড়ে তিনি প্রোথিত হইয়া গিয়াছেন।

এ-পার হইতে একজন রহস্য করিলেন, কি দাদা, ভিড় হবে কি আজ?

উত্তর আসিল না।

এদিকে মহিলাটির স্বামী কখন অল্প জায়গায় বসিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছেন এবং একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রবল বেগে টান মারিতেছেন।

একে এই গরম, তার ওপর—

সেইজন্যেই ত টানছি মশায়। খালি চোখে এই ভিড় সহ্য করা যায় ?

টানুন ক্ষতি নেই, কিন্তু ডবল প্রমোশন নেবার চেষ্টা করবেন না যেন !

সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়া ছাড়িয়া ভদ্রলোক কহিলেন, আমাদের প্রমোশন দেয় হেন লোক ত ভূভারতে দেখি না। অষ্টসিদ্ধিতে অল-রাউণ্ড প্লেয়ার, হুঁ বাবা !

বটে, জল পথ—না—

সব পথে সুপিরিয়রিটি না থাকলে মন্বন্তর যুগকে কলা দেখাতে পারতাম কি ! কি যুগ গেল তেরশো পঞ্চাশ !

মশায়ের নিবাস ?

বাংলার সেরা গ্রাম। জানেন উলোর নাম ? বীরনগর।

ভূতের হেড কোয়ার্টার।

কি বললেন ?

মহামারিতে উলো ত উজোড় হয়ে গিয়েছিল। যত ভূতের গল্পের প্লট ত ওরই পড়োবাড়ী আর মাঠ-জঙ্গল নিয়ে।

সে উলো আর নেই। এখন নাম হয়েছে বীরনগর। নগেনবাবুকে জানেন ? তিনি মারা না গেলে কলকাতার সমান দাঁড় করাতেন একে।

তাঁর প্ল্যান ছিল ভাল।

শুধু নগেনবাবু কেন—বাংলার যত সুসন্তান সবারই বাস উলোয়। মুস্তোফীরা, বসুরা—রাজশেখর বসু,

জানি।

তবে বললেন যে ভূতের হেড কোয়ার্টার ?

ভুল করেছি।

অমন গ্রাম আর নেই মশায়। পাকা রাস্তা, আমবাগান, শাকসব্জী, মাছ।

এক একটি জাতির বসতি এক একটি পাড়ায়। কেবল যা দুঃখ ম্যালেরিয়া। তা সে আর ক'টা মাস!

ওপাশের বেঞ্চে ততক্ষণে সাহিত্য-আলোচনা চলিতেছে।

ও মুর্গীমার্কা বইখানা কি মশায়?

শনিবারের চিঠি।

অন্নদাশঙ্কর যার এডিটর ছিলেন?

হবে। এখন ত দেখছি—সজনিকান্ত দাস।

আগে অন্নদাশঙ্কর ওর এডিটর ছিলেন।

কোন্ অন্নদাশঙ্কর?

যিনি বর্দ্ধমানের জজ্।

ওঃ, যিনি আমেরিকান লেডী বিয়ে করেছেন?

যাঁর বাড়ী কালিয়ায়?

সুতরাং—বেশ লেখেন।

পড়ছেন নাকি?

নাঃ, যে গরম।

বড় কষ্ট মশাই—শনিবারের বাড়ী যাওয়া, কষ্টদায়ক।

বলেন কি, শুধু কষ্টদায়ক? কত আনন্দ ও আশাদায়ক—বলুন ত।

একটা উচ্চহাস্যধ্বনি গাড়ীখানাকে খান্ খান্ করিয়া দিল।

লিখতে আর হবে না মশাই, পেপার কণ্টোল হয়ে গেল।

ছেলেদের লেখাপড়ার দফা গয়া!

এখন ত চাকরির অভাব নেই। হাজার হাজার আপিসে লাখ লাখ কেরাণীর চাহিদা। কি হবে লেখাপড়ায়।

তা বটে। ঢুকতেই মাইনে—এ্যালাউন্স—রেশনে একশোর কম ত নয়।

পেটের ভাবনা ত ঘুচেছে।

হাঁ—কয়েক পুরুষ বেশ কাটবে। ঊর্দ্ধগতি আর নিম্নগতির মাঝখানে সেই অমৃতলোক।

যাই বল ভাই, বিজ্ঞান জগৎকে করলে উন্নত, আমাদের দিলে পিছিয়ে।

দুর, এ যুগে পিছোবার যো কি? আগে যেতেই হবে।

এ যুগে মানুষের সব গুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না কি?

গুণ কখনো নষ্ট হয়! চাপা জিনিস শুধু প্রকাশ পেয়েছে।

কোথায়?

কেন, গেল সনের দুর্ভিক্ষে, ব্ল্যাক মার্কেটে, রেশনের জিনিসপত্রে—

গেল—গেল—গেল—

গাড়ীটা ষ্টেশনে ঢুকিবার মুখে ঈষৎ কাত হওয়াতে ব্যাঙ্ক হইতে একটি সুটকেস গড়াইয়া সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকের মাথায় পড়িল। চোখের চশমা সেই আঘাতে ঠিকরাইয়া ভিড়ের মধ্যে পড়িল এবং নিমিষে গুঁড়া হইয়া গেল।

মশাই—মোট রাখবার আর জায়গা পান নি। তিনি আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, ভিড় তাঁহাকে বসাইয়া রাখিল। নানা কণ্ঠের মন্তব্য কোলাহলকে বাড়াইল শুধু।

যাক, চোখটা খুব বেঁচে গেছে—মশাই।

চোখ ত বাঁচলো—চশমার দাম জানেন?

ইনফ্লেশনের বাজার—কুচ্ পরোয়া নেই।

ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে কিছু আশার সঞ্চার হয়—কিছু লোক নামিলে খানিকটা নিশ্বাস লইবার অবসর বুঝি মিলিবে। কিন্তু যে হারে লোক নামিতেছে—তাহার দ্বিগুণ হারে উঠিতেছে। গাড়ীখানা সুপুষ্ট মেষ-শাবকের মত ষ্টেশনে ঢুকিতেই ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত যাত্রীদল তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। ঠেলাঠেলি, মারামারি, চীৎকার, জিনিসপত্র তছনছ—সে এক বীভৎস কাণ্ড। গাড়ীর জঠরে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া নিরুপায় যাত্রীরা ফুটবোর্ডে ঝুলিতে ঝুলিতেই চলিয়াছে।

সেই অবস্থাতেই গল্প চলিতেছে :

এখন প্র্যাক্‌টিস হ'য়ে গেছে ভাই, পঁচিশ-ত্রিশ মাইল এমনি করে গেলেও কিছু হয় না।

আরে ট্রামেও এই অবস্থা। একটু কষ্ট হয়, কিন্তু পয়সা বাঁচে।

কন্‌ডক্‌টর ধরে না ?

দূর শা—টিকিস কাটবে কোথেকে। যেমন ষ্টপেজে আসে—সুরুৎ করে গলে পড়ি।

খুব বাহাদুর ছোকরা তো তুমি। পা দানিতে ভাল করে পা দাও—নইলে বিনা টিকিটে অনেক দূর চলে যাবে।

আমাদের প্র্যাক্‌টিস আছে মশায়। বলিয়া এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া, অন্য হাতে পকেট হইতে চীনা বাদাম বাহির করিয়া খাইতে লাগিল।

তার পর আসিল রাণাঘাট। বড় জংশন। বাঁধকাটা জলের স্রোত বহিল। তীব্র স্রোত। কত অর্দ্ধ পরিচিত ভাসিয়া গেল—সম্পূর্ণ অপরিচিত উঠিয়া আসিল। বেলুনধর্ম্মী গাড়ীর এতটুকু ফাঁক রহিল না।

মোটা ভদ্রলোক বিপন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় নামবেন মশায় ?

কেষ্টনগর।

আপনি ?

ডিটো।

দুই-তৃতীয়াংশ যাত্রীর গন্তব্য স্থান কৃষ্ণনগর শুনিয়া ভদ্রলোকের মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আপনি দিব্যি হাত-পা মেলে শুয়ে-বসে যাবেন।

ভদ্রলোক সহসা শুষ্ক মুখে কহিলেন, আবার উঠবে তো ?

সন্ধ্যায়।

তবে ! একটু থামিয়া বলিলেন, নামবার সময় ঝাইগুলি ওই কোণে সরে যাবার অপরচুনিটি দেবেন স্যার ?

আসবেন এখন ?

না, না, বাদকুল্লো ছাড়িয়ে। থ্যাঙ্কস্।

অগ্রিম ধন্যবাদটা আর দেবেন না, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

সে কথা সত্য। রাণাঘাট জংশন ছাড়াইয়া খানিকটা দূর আসিতেই—ফট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। কে যেন লোহার উপর লাঠি দিয়া সজোরে আঘাত করিল।

গেল—গেল—গার্ড-গার্ড—চেন টানুন—চেন—

বিপৎকালের চেন খুঁজিয়া মিলিল না। যেখানে সেখানে চেন-টানার উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া কোম্পানী চেনের অবস্থান ফাঁকটিতে কাঠ দিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। এতগুলি লোকের পরিত্রাহি চীৎকার—গার্ডের কানে পৌঁছিল না। চীৎকারের কিই-বা মূল্য আছে আজকালকার দিনে। ট্রেণের ভাষাটাই তো পরিত্রাহি চীৎকার।

উত্তেজিত যাত্রীদলে কোলাহল আরম্ভ হইল।

কি হলো মশাই ?

ওই যে ছেলেটা ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল, পড়ে গেল।

পড়ে গেল ! কি করে ?

হাত ফস্‌কে।

আজ্ঞে না। কেবিনের গায়ে গাড়ীটা যেখানে বাঁক নিলে—ওইখানের লোহার পোষ্টটা লাইনের খুব কাছে। ছেলেটি মাথা বাড়িয়েই ছিল, যেমন ধাক্কা লাগা—

আহা-হা—

মাথাটা আর নেই। কি দারুণ শব্দ মশাই, খুলি ফাটার শব্দ কিনা।

মুহূর্তে সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। দুর্ঘটনার থমথমে মেঘখানা

সমস্ত আলো হাওয়াকে আড়াল করিয়া মাথার উপর ঘন কালো হইয়া উঠিল।

কোম্পানীর নামে নালিশ করা উচিত। গাড়ীতে চেন তুলে দিয়েছে।

শা—গার্ড কেন গাড়ী থামালে না। বীরনগরে গাড়ী থামলে চাঁদা করে মার দাও।

ওকে মারলে ছেলেটার গতি হবে?

আপনি তো বেশ—মশাই।

দুই দলে বিভক্ত হইল জনতা। এক দল যুক্তি দিয়া বুঝাইতে লাগিল, অন্য দল আবেগ বশতঃ তাহাদের গালি দিল। তার পর—সে সুবিধা ছিল না বলিয়াই—রক্তারক্তি কাণ্ডটা বেশি দূর অগ্রসর হইল না।

ন্যারো গেজের সঙ্কীর্ণ গাড়ীতে ভিড় কম। আড়ষ্ট হাত পা মেলিয়া আরাম করিয়া বসিয়াছি। প্রায় ছ'টা বাজে। রৌদ্রের তেজ কমিয়া গিয়াছে; দু'ধারে প্রসারিত মাঠ হেমন্তের সোনা রঙের ধান্য-সম্পদে মৃদু হাওয়ায় দুলিতেছে, তার মাথায় কৌতুক-লোভী নীল আকাশ আলস্যে ভাসিতেছে। মাঠ দুলিতেছে না—আকাশও ভাসিতেছে না—ক্লান্ত মন এমনই নির্বিঘ্ন প্রশান্তিতে মগ্ন হইবার আশায় এতক্ষণ অধীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অবকাশ পাইয়াই সে কল্পনার পাখায় ভর করিয়াছে। শনিবারের অপরাহ্ণ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সবুজে-নীলে-বাতাসে স্বচ্ছন্দ বসিবার ভঙ্গিতে এবং ঐ হতভাগ্য ছেলেটির অপঘাত মৃত্যুর দুঃখে ঘরে ফিরিবার ইসারাই পাওয়া যায়।

যুদ্ধোত্তর যুগের শান্তি-পরিকল্পনার মধ্যে এই ক্ষণজীবী শনিবারকে—দুঃখ-বেদনা-আশা-আশ্বাস-ভরা শনিবারকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না, জানি। যে খরস্রোতের সে বুদ্‌বুদ্ মাত্র সেই মহাকালকে শুধু প্রণাম জানাইয়া রাখিলাম।

আলো ছায়া

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সুমিত্রার মন আজ দুপুর থেকেই ভার।

দুপুরে কাপড়গুলো ধুতে গিয়ে স্বামীর পকেট থেকে বেরুলো দু'খানা সিনেমার টিকিট।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টে গুরুতর কিছু নয়। শনিবারের দিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সিনেমা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। কিন্তু ঐ দিনই সুমিত্রা ধীরেশকে বলেছিল, তাকে মাসীমার বাড়ী নিয়ে যেতে। শিমলা থেকে ছোট মামা এসে ঐখানে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুমিত্রার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

কিন্তু ধীরেশ তাতে রাজি হয়নি। বলেছিল, তার আফিসে কাজের চাপ ভয়ানক বেড়েছে। শনিবারেও সে ছ'টার আগে বোধহয় ছাড়াই পাবে না। অথচ সেই শনিবারেই তিনটের সময় গেছে সিনেমায়। একা নয়, দু'জনে। কে জানে আর একজন কে!

এমন লুকোচুরির দরকার কি ছিল? সে তো বললেই পারতো, সিনেমার টিকিট কাটা হ'য়ে গিয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা'হলে সুমিত্রা তাকে সিনেমায় যেতে বাধা দিত না।

কিন্তু ধীরেশ এমন লুকোচুরি খেললে কেন?

রবিবারের দুপুর। ধীরেশ পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিলো। সুমিত্রার তখন

এমন মনের অবস্থা যে, এখনই গিয়ে ধীরেশকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন এমন মিথ্যা কথা বললে ?

কিন্তু শুধু রাগ নয়, তার মনের মধ্যে এমন একটা ঘৃণা জমে উঠলো যে, সে প্রবৃত্তিও হল না।

কি হবে জিজ্ঞাসা ক'রে ? হয়তো ধীরেশ আর একটা নতুন মিথ্যা দিয়ে এই মিথ্যাকে ঢাকতে চেষ্টা ক'রবে। এই যে প্রথম ধীরেশ সুমিত্রার কাছে মিথ্যা কথা বললে, তা তো নয়। এর আগে আরও অনেক বার বলেছে, সেও তো সুমিত্রা ধরেছে।

কিন্তু কেন এমন হ'ল ? ফাল্গুনের উদাস দুপুর ব'সে ব'সে এই প্রশ্নেরই কথা সুমিত্রা ভাবতে লাগলো, এমন হ'ল কেন ?

ওদের বিয়ে হয়েছে মোটে চার বৎসর। আরও এক বৎসর আগে থেকে ওদের পরিচয়। সেই একটি বৎসর পরস্পর পরস্পরকে প্রত্যহ একটু একটু ক'রে জানবার সুযোগই পেয়েছে। এই চার বৎসরে সেই জানা কি সমস্তই মিথ্যা হয়ে গেল ?

মনে পড়ে, বিয়ের আগে ওদের প্রথম পরিচয়ের সেই দিনগুলি। সামনের খোলা বারান্দায় সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে ব'সে কত এলোমেলো গল্প। কোনোদিন হয়তো বা যেত সিনেমায়। দু'জনে বেশী মেলামেশার সুযোগ পেত না। সুমিত্রার সেবারে বি-এ পরীক্ষার বৎসর। সপ্তাহান্তে রবিবার অপরাহ্নে হয়তো কিছুক্ষণের দেখা। কিন্তু সমস্ত সপ্তাহ ভোর সেই সুখটুকুর জন্যে দু'জনের কী ব্যাকুলতা !

কোথায় গেল সে সব ?

সুমিত্রার মনে পড়ে, তার দিদি কল্যাণীর শ্বশুর বাড়ীর কথা।

কল্যাণী বেশীদূর পড়েনি। ম্যাট্রিক পড়তে পড়তেই তার বিয়ে হয়ে যায় এক প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীতে। বিয়ের কয়েক বৎসর পরে সেখানে একবার সুমিত্রা গিয়েছিল।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। সদর মহল, অন্দর মহল আলাদা। কত লোক! ওরা দু' তিন পুরুষ একসঙ্গে আছে। কিন্তু শুধু যে তারাই আছে তাই নয়। সেই দু'তিন পুরুষের যত ভাগে তারাও আছে। কেউ পড়ে, কেউ কিছুই করে না, বাড়ীর থিয়েটারে ফ্লুট বাজায়। কেউ বা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়েই বসবাস করছে।

কত ছেলে! দু'টো চাকর আছে। তারাই তাদের গুণে গুণে স্নান করতে নিয়ে যায়, গুণে গুণে খাওয়ায়, গুণে গুণে শোওয়ায়—সেও কম ঝামেলা নয়। রাত্রে কাকেও হয়তো দু'বার খাওয়ান হ'য়েছে। পেটের ব্যথায় সে কাঁদতে আরম্ভ ক'রেছে। কেউ বা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ক্ষুধার যন্ত্রণায় রাত দুপুরে কাঁদতে লেগেছে।

সমস্তদিন অন্দর-মহল যেন প্রমীলার পুরী!

প্রকাণ্ড বড় উঠানে সারি সারি ঝিয়েরা বঁটি নিয়ে ব'সে গেছে তরকারী কুটতে। ওদিকে রান্না বাড়ীতে চলেছে রান্নার কোলাহল। তার পিছনে খিড়কীর পুকুর, বাগান। মেয়েরা কেউ পুকুরে সাঁতার কাটছে। কেউ গাছে কোমর বেঁধে আঁকশী দিয়ে আম পাড়ছে।

সে একটা বিরাট ব্যাপার!

সুমিত্রা তিন দিনের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেছিল।

আজকে সুমিত্রার মনে পড়ল কল্যাণীকে।

কী খাটুনীই তাকে খাটতে হয়! ভোরে ওঠে, আর রাত্রি এগারোটায় শুতে যায়। এর মধ্যে তার মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

সুমিত্রা অভিযোগ ক'রে বলেছিল, তুমি কত খাটো দিদি?

কল্যাণী হেসে বলেছিল, না খাটলে কি চলে ভাই? কত লোক, কত বড় বাড়ী, কত কাজ!

—কিন্তু লোক তো অনেক আছে দিদি।

—কেউ ব'সে থাকে না সুমি। তুই শুধু তোর দিদির দিকেই চেয়েছিস। নইলে দেখতিস, কেউ কম খাটে না।

—কি জানি।

কল্যাণী বলেছিল, এ একটা আশ্চর্য্য বাড়ী সুমিত্রা। যত দেখি, ততই অবাক হই।

—কেন?

—আমার মনে হয়, এ যেন একটা ছোট সংস্করণের সোভিয়েট রিপাব্লিক। বাইরে আমার জাঠশ্বশুরকে দেখেছিস? তিনি হচ্ছেন ডিক্টেটর ষ্ট্যালিন। বাইরে থেকে একটা আশ্চর্য্য কৌশলে সদর আর অন্দর দুই সুশৃঙ্খলে চালাচ্ছেন। সম্পত্তিতে সকলের অংশ সমান নয়। কিন্তু সবাই সমান খাচ্ছে, সমান পরছে, সমানই হাত খরচ পাচ্ছে। কাজেরও সব ভাগ আছে। কেউ দেখছেন জমিদারী, কেউ তেজারতি, কেউ ব্যবসা, কেউ চাষ। সবারই উপর ডিক্টেটরের খরদৃষ্টি! কারও ত্রুটি হবার উপায় নেই।

—ওই যে বাইরের বালাখানার বারান্দায় ছোট্ট তক্তাপোষটিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে থাকেন, উনিই?

—হ্যাঁ, উনিই। তুই শুনলে অবাক হ'য়ে যাবি, অন্দর থেকে ওই অতদূরে বালাখানায় উনি ব'সে থাকেন। তবু এখানে কাজে এতটুকু বিশৃঙ্খলা হবার উপায় নেই। কি ক'রে যেন তক্ষুণি উনি টের পেয়ে যান।

কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটাই সুমিত্রার কেমন ভালো লাগছিল না। সে বলেছিল, ডিক্টেটরের শাসন চরের উপর দিয়ে চলে। ওঁরও হয়তো অনেক চর আছে।

—কি জানি। তারও তো সন্ধান পাইনি।

ওখান থেকে আসবার দিন সুমিত্রা বলেছিল, ক'দিন এখানে রইলাম, কিন্তু জামাইবাবুর দেখা পেলাম না।

কল্যাণী হেসে বলেছিল, কি ক'রে পাবি? এ বাড়ীর বেটাছেলেরা সকালে

বেরিয়ে যায়, দুপুরে একবার দু'টো খাবার জন্যে ভিতরে আসে। তারপরে আসে রাত দশটার পরে।

—তোমার সঙ্গেও দেখা হয় না ?

—ভিতরে না এলে আর কি ক'রে দেখা হবে ?

—থাক কি ক'রে ?

—থাকি।

তারপরে হেসে বলেছিল, এও বোধহয় ভালোই সুমি। দিনরাত্রি এক সঙ্গে থাকলে শীঘ্রি বোধহয় পুরণো হ'য়ে যায়।

—তুমি কি ক'রে জানলে ?

—আমি জানি না। যেন জানতে নাও হয়। কিন্তু আমার কেমন মনে হয়, স্বামী-স্ত্রীর দিনরাত্রি একসঙ্গে থাকাটা বোধহয় কাজের কথা নয়।

সুমিত্রা সেদিন দিদির মুখের উপর বলেছিল, তোমার যা' অবস্থা দেখলাম দিদি, আমি যদি বিয়ে করি পাঁচজনের বাড়ীতে কখনও নয়। দিনরাত্রির যে কোনো সময় আমাদের দু'জনের দেখা হওয়ার পথে বাধা হ'তে পারে, এমন কেউ সে বাড়ীতে থাকবে না।

সত্য কথা বলতে গেলে সুমিত্রা তেমনি বিয়েই করেছিল। ধীরেশের বাবা অবসর নিয়ে মধুপুর বাস করছেন। ধীরেশের দাদারা কেউ থাকেন বম্বেতে, কেউ লাহোরে। একটি বোন, তার বিয়ে হয়েছে মীরাটে। সুতরাং বিয়ের পর থেকেই ধীরেশ কলকাতার অভিজাত পল্লীতে চমৎকার একটি ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করতে লাগলো। শুধু তারা দু'জন। আর বেয়ারা—বাবুর্চি।

আফিসের সময়টায় দু'জনে যে ছাড়াছাড়ি হ'ত তারও মধ্যে ধীরেশ তিনবার তাকে ফোন করত। শনি-রবিবার দু'জনে যেত, হয় সিনেমায়, নয় থিয়েটারে, নয় পার্টিতে। মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতেও তারা বন্ধুবান্ধবীদের পার্টি দিত। দু'টি রঙিন প্রজাপতির মতো এমনি করেই তাদের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে বলতো. কপোত-কপোতী।

সেই ভালোবাসায় এই চার বৎসরেই এল ভাঁটা?

সুমিত্রার ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

ধীরেশের কী যেন হয়েছে! সকল সময়েই যে সে পালিয়ে বেড়ায় তাও নয়। মাঝে মাঝে আফিস থেকে ফিরে এসে হাসে, গল্প করে। কিন্তু হাসিতে সেই আগুন আর জ্বলে না। গল্পে জমে না রস। একটু পরেই গল্প থেমে যায়। দু'জনে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে পথের জন-স্রোতের দিকে। শেষ অপরাহ্নের রক্ত মেঘের আভা আজও তেমনি ক'রে সুমিত্রার মুখে এসে পড়ে। কিন্তু ধীরেশ তেমন ক'রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর পানে চেয়েও দেখে না।

বেয়ারা এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে যায়।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, আর একটু চা খাবে?

অন্যমনস্কভাবে ধীরেশ বলে, থাক।

একটু পরে সুমিত্রা বলে, বাবার চিঠি এল আজ পুরী থেকে।

—ভালো আছেন?

—লিখেছেন তো, শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। এই সময়টা পুরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকে।

ধীরেশ বললে, হুঁ।

—বাবা আমাকে যেতে লিখেছেন।

—যাবে?

—ভাবছি।

—বেশ তো। দিন কয়েকের জন্যে ঘুরেই এস না। কবে যেতে চাও?

—স্থির করিনি কিছুই।

—কালকে যেতে পার। মাদ্রাজ মেলে তোমাকে আমি তুলে দিয়ে আসব। ভোর বেলায় বোধহয় পৌঁছে যাবে। পুরী তো তোমার চেনা। অসুবিধা কিছুই হবে না। সুমিত্রা চুপ করে রইলো।

উৎসাহের সঙ্গে ধীরেশ বললে, দাঁড়াও। টাইম-টেবলটা আনি।

টাইম-টেবল্ এনে ধীরেশ ওর যাওয়ার নিখুঁৎ ব্যবস্থা ক'রে দিলে। বেয়ারাদের মধ্যে বুধিয়াটা সবচেয়ে চালাক। তাকেই সঙ্গে দেবায় ঠিক হ'ল।

কিন্তু সুমিত্রা শেষ পর্য্যন্ত গেল না।

ধীরেশ তাতেও যেন একটু বিরক্তই হ'ল। কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

মনকষাকষি বেড়েই চলে। কথা অবশ্য বন্ধ হয়নি। তবে হ'লেই বোধহয় ছিল ভালো। বাবুর্চি-বেয়ারার সামনে দু'জনেই অভিনয় ক'রে চলে।

ইতিমধ্যে একদিন কল্যাণী এল তার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। সে যাচ্ছে পুরী, বাপের কাছে।

কল্যাণী বললে, যাবি আমার সঙ্গে?

সুমিত্রা ঘাড় নেড়ে বললে, এখন নয়।

—কেন এখন তোমার কি এত কাজ?

—আছে দিদি, তুমি বুঝবে না।

কল্যাণী হেসে বললে, সে আমি জানি। কিন্তু দশটা দিনও ছেড়ে থাকতে পারো না? এমনি অবস্থা?

সুমিত্রা একটু হেসে দিদির কোল থেকে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বললে, একে দুধ খাইয়ে নিয়ে আসছি।

কল্যাণী তখন ধীরেশের কাছে গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, এ তোমার খুবই অন্যায় ধীরেশ। সুমিকে দশটা দিনের জন্যে ছেড়ে দেবে না?

ধীরেশ করযোড়ে বললে, আমাকে অন্যায় অপরাধী করবেন না দিদি। আপনি আসার আগে থেকেই ওকে আমি পুরী যেতে বলছি। ওর যাওয়া দরকারও। কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়। আপনি যদি চেষ্টা ক'রে রাজি করাতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই।

কল্যাণী বললে, বুঝতে পেরেছি। এইটেই তোমাদের ষড়যন্ত্র। তুমি ওর উপর দোষ দেবে, ও তোমার উপর। কেমন?

ধীরেশ পুনরায় করযোড়ে বললে, আজ্ঞে না। আমি নির্দ্দোষ।

—সে আমি টের পেয়েছি। আমি বলি কি, তোমরা দু'জনেই বরং চল। তা'হলে আর....

চোখ কপালে তুলে ধীরেশ বললে, সর্ব্বনাশ! আমার এখন একটা দিনও ছুটি পাওয়ার উপায় নেই। অসম্ভব কাজের চাপ।

কল্যাণী প্রকাশ্যে খানিকটা বিরক্তই হ'ল। কিন্তু ওদের ভালোবাসা দেখে মনে মনে কি খুসিই হ'ল। দু'জনের অভিনয়ই নিখুঁৎ বলতে হবে।

ওর যাবার আগের দিন সুমিত্রা বললে, দিদি, একটি ভিক্ষে চাইব দেবে?

—তোর জামাইবাবুকে তো? নে। আমি বাঁচি।

—না দিদি, তাঁকে দরকার হবে না। আমার বাবুর্চি আছে। আমি বলছিলাম, খোকাকে আমার কাছে রেখে যাও। আমার কাছে ও বেশ থাকতে পারবে।

—সে আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও যে ভয়ানক দুষ্টু সুমি। তোর গোছালো ঘর তছনছ করবে।

—সেই জন্যেই তো ওকে দরকার দিদি। আমার ঘর বড্ড বেশী গোছালো। একটু তছনছ হওয়া দরকার।

কল্যাণী বোনের গাল টিপে দিয়ে হেসে বললে, হবে, হবে। তার সময় তো এখনও যায়নি।

—কিন্তু ততদিন আমার সবুর সইবে না দিদি। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ওকে রেখে যাও।

—বেশ, থাক। আমি তো তোমাদের পুরী নিয়ে যেতে পারলাম না। ও যদি উৎপাত ক'রে পারে।

সুমিত্রা দিদির সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ওর কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। খোকাকে বুকে চেপে ও পাশের ঘরে ছুটে পালালো।

যাবার দিন সুমিত্রা আর ধীরেশ কল্যাণীকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে।

ধীরেশ বেচারা কিছুই জানতো না। ফেরবার সময় মোটরের মধ্যে খোকাকে দেখে চমকে উঠলে :

—কী সর্ব্বনাশ! একে গাড়ীতে তুলে দাওনি?

সুমিত্রা হেসে বললে, না।

—তা'হলে?

—তা'হলে গাড়ী বৌবাজার দিয়ে যেতে বল।

—সেখানে কি?

—দরকার আছে।

বৌবাজারে একটা ক্যাবিনেটের দোকান থেকে খোকার জন্যে একটা খাট কিনে ওরা বাড়ী ফিরলো।

সারারাত্রি দু'জনের সেদিন ভালো ঘুম হ'ল না। খোকা ঘুমের ঘোরে ছটপট করে, আর দু'জনেই চমকে উঠে হাত বাড়ায়। মাঝে মাঝে দু'জনের হাতে হাত ঠেকে। অনেক দিন পরে, খোকার নরম গায়ের উপর, দু'জনে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

সকালে উঠে ধীরেশ বললে, কাজটা ভালো করনি তুমি। সারারাত্রি কাল ভালো ঘুম হয়নি।

খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আড়চোখে হেসে সুমিত্রা বললে, আমারও। কত ভোরে উঠে দেখেছ? এবার থেকে আমরা early riser হ'ব আশা হ'চ্ছে।

সুমিত্রা চলে গেল।

বিকেলে ধীরেশ একটি টেব্‌ল-ল্যাম্প নিয়ে আফিস থেকে ফিরলো। বললে, রাত্রে আলো জ্বালা থাকলে খোকার বোধহয় ঘুম হয় না। আলো নিবুলেও বোধহয় ভয় পায়। তাই এইটে কিনে আনলাম। নীল আলো সারারাত জেলে রাখা যেতে পারে।

বলতেই ধীরেশের দৃষ্টি টেবিলের উপর। একটা ভাঙা কাঁচের আয়না,

একটা ভাঙা অ্যাশ-ট্রে, একটা ইংরিজি কবিতার বইএর ছেঁড়া মলাট টেব্‌লের উপর কে যেন সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

ধীরেশ শিউরে উঠলো :

সর্ব্বনাশ! কে করলে এসব?

—খোকন।

ধীরেশ গম্ভীর হ'ল। বললে :

—কাজটা ভালো করনি তুমি। ছেলে আমরা চাইনি। ছেলের উৎপাত পোয়ানো আমাদের কাজ নয়।

মিটিমিটি হাসতে হাসতে সুমিত্রা বললে, দেখা যাক। তুমি পোষাকটা ছাড়ো। চা খাও। বেরুতে হবে এখুনি।

—কোথায়?

—খোকনের জন্যে একটা মশারি কিনতে হবে। আরও কি কি পাওয়া যায় দেখা যাক।

যত দিন যেতে লাগলো ওদের জিনিস কেনাও তত বাড়তে লাগলো। পোষাকে, খেলনায় ক্রমে ঘর ভর্তি হ'য়ে উঠলো। সুমিত্রা যদি এক প্রস্থই পোষাক কেনে, ধীরেশ আর এক প্রস্থ। ধীরেশ যদি একটা মোটর গাড়ী কেনে, সুমিত্রা কিনে আনে রেলগাড়ী।

খোকন যত নতুন নতুন জিনিস ভাঙে, ওরা তত নতুন নতুন জিনিস কেনে। ওদের মধ্যে যেন 'রেস্‌' চলেছে, খোকনের সঙ্গে ধীরেশ আর সুমিত্রার।

সকাল থেকে সুমিত্রার মোটে অবসর নেই। খোকার সহস্র কাজ তার দিন-রাত্রির সমস্ত ছিদ্র বন্ধ ক'রে ভরাট ক'রে রেখেছে। অবসর নেই। এমন কি, ধীরেশ কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে সেদিকেও দৃষ্টি দেবার সময় পায় না।

তার দরকারও হয় না। কি জানি কেন, ধীরেশ আজকাল আফিস থেকে সোজা বাড়ী ফিরে আসে এবং আর বড় একটা বাইরে বেরোয় না।

ওদের দুপুরের টেলিফোন অনেক দিন বন্ধ ছিল। এখন আবার মাঝে মাঝে বাজছে :

—হ্যালো ! শোনো, তোমাকে বলিনি। টিফিনে গিয়ে খোকনের জন্যে একটা চমৎকার প্যারাম্বুলেটার কিনে আনলাম।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—তোমার আফিসের ছুটি হবে কখন ?

—সেই পাঁচটায়।

—সে তো রোজই হয়। আজ একটু সকালে আসতে পারো না ?

—দেখছি, চেষ্টা ক'রে।

এর ক'দিন পরে ব্যস্তভাবে সুমিত্রা একদিন ধীরেশকে টেলিফোন করলে :

—এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম, দিদি আসছে।

—তাই নাকি ? কবে ?

—কবে কি গো ? আজকেই সন্ধ্যাবেলা।

—খবর সব ভালো তো ?

—কিছু ভালো নয়। খোকনকে নিয়ে যাবে বোধহয়।

—Impossible. এখন আর তা' হয় না সুমি। দিদির একথা বোঝা উচিত।

—কে বোঝাবে ? তার চেয়ে বিকেলের গাড়ীতে কোথাও পালাই চল।

—কিছু ভয় নেই। আমিই বোঝাব। আমি এখুনি যাচ্ছি। Didi is a good girl.

অমল-তরু-আত্মকথা

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

নামটা আমার একটুখানি অদ্ভুতই বটে।—অমল-তরু!

আমি বটবৃক্ষ।

শুষ্ক রুক্ষ প্রান্তরের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি—নিঃসঙ্গ, একাকী। আমার চোখের সুমুখে যতদূর দৃষ্টি যায়—ধূ ধূ করছে রুক্ষ প্রান্তর···

আমি জানি—একদা সুবিস্তৃত এই প্রান্তর ছিল শস্য-শ্যামলা নয়নাভিরাম ধান্যক্ষেত্র। আমার পার্শ্বে ছিল প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা। অট্টালিকার অধিবাসী ছিল এক যুবক আর যুবতী, স্বামী আর স্ত্রী।

রাজার মত ছিল তাদের ঐশ্বর্য্য, অপরিমিত ধন-সম্পদ, পর্য্যাপ্ত লোকবল, অক্ষয় ছিল তাদের পূর্ব্বপুরুষের অশীর্ব্বাদ।

কিন্তু একদিন সব গেল!

কেন গেল, কেমন করে গেল, সেই গল্পই বলি।

বারোশ' বেরানব্বুই সালের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে আমার জন্ম। কিন্তু তারও দশ বৎসর পূর্ব্বের এই ঘটনা।

হিজলতলা, কনকসার, মেদুর, রাণীরদীঘি আর নন্দনপুর। এই পাঁচটি গ্রামের মধ্যে নন্দনপুরের ষোল আনা মালিকই সে।

সে হলো অমলেন্দু রায়।

ছোটো জমিদার। হোক ছোট;—প্রতাপ তার ছোট নয়!

স্ত্রী তরুবালা। যেন দেবীটি!

কল্পলোকের এই মেয়েটির মাটিতে এসে ধরা দিয়ে মর্ত্তের অপযশ বয়ে বেড়াবার কি স্বার্থকতা ছিল জানি না।

মুখখানি যেন সৌন্দর্য্যের খনি! ওষ্ঠ প্রান্তে হাসির ঝরনা!

অরুণোদয়ের প্রথম আভাটুকু হয়ত ওর বর্ণের সঙ্গে খানিক মেলে।

কথা কয় মধুরতায় সমস্ত ঢেলে দিয়ে! অমলের গৃহ আলো ক'রে আছে এই গৃহলক্ষ্মী।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সে অখণ্ডতার রূপ দিতে গিয়ে আতিশয্য দোষে কি বলতে কি বলে ফেলবো—ভয় হয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে তরু ছুটে আসে। এ গালেতে চুমু খেয়ে আশার দুরন্তপনা মেটে না......ও গালেতেও আর একটি খেয়ে পলাতকা ঝরনার মত সে ছুটে যায়!

অমলের বিমুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি সেই চপল সরল লীলায়িত গতিভঙ্গীর দিকে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ বৎসর দীর্ঘতম হয়ে কালের রেখা টেনে আরও সুদীর্ঘ হয়ে আসে।

তবু যেন এদের তৃষ্ণার বিরাম নেই। আজো তারা যেন সেই নববিবাহিত দম্পতি। সচরাচর এমন মিল বড় একটা চোখে পড়ে না।

মান-অভিমানের ভিতর দিয়ে যে কলহ দ্বন্দ্ব......মাঝে মাঝে ঘনিয়ে আসতে চায়—তাও চিরাচরিত প্রথায় নয়। সুষ্ঠু ভাবে ও ভাষায় তা আরো অভিনব হয়ে ওঠে।

এমন একটি সুখী দম্পতি!

নিরবচ্ছিন্ন এই রসঘন এবং বিচিত্র দিনগুলির ফাঁকে ফাঁকে তরুবালার মন ভারী হয়ে ওঠে। বলে—ওগো শুনচো?

—কান পেতেই ত রয়েছি—তোমার ওই বাঁশীর মিষ্ট শব্দ শুনতে।

—মস্ক রাখো।

—রাখলাম মস্ক, বলো !

—তা নাই বা রাখলে। তোমার ওই রঙ ফলানো কথা আমার ভালোই লাগে। কিন্তু তা নয়—

—কিন্তু কি, বলো ?

যত গোল ত' ওইখানেই। বলতে চাইলেই কি বলা যায় ? গলা যে ভিজে আসে। ওই কিন্তু টুকুই যে তার সত্যিকারের রূপ ধ'রে শাসিয়ে ওঠে ! এ গঞ্জনার হাত হ'তে সে এড়ায়ই বা কি ক'রে ?

এ পক্ষের স্তব্ধতা অপর পক্ষের মৌনতার সঙ্গে আড়ি দিয়ে চলতে থাকে ক্ষণের পর ক্ষণ !

নির্ব্বাক দণ্ডগুলোকে চাপা নিঃশ্বাস এসে পদদলিত ক'রে দিয়ে যায় !

অমল বলে—বলো ?

—এই যে বলি !

কণ্ঠের আবর্জ্জনা নামিয়ে দিয়ে তরু কহে কথা।

—ওই যে সেই কথাই বলতে চাই, বিদায় করো।

—আবার ?

—হ্যাঁ, আবার।

—ছি ছি, কি যে বলো তুমি ?

—আমি ঠিক বলেছি। বন্ধ্যানারীর আদর বাড়িয়ে ইতিহাসের পাকা খাতায় আর নাম নাই বা রাখলে। বিয়ে তোমার করতেই হবে।

—বেশ, করবো। আদেশ তোমার রাখবো লক্ষ্মী, সঙ্গে সঙ্গে আমার আব্দারটাও যেন মাঠে মারা না যায় !

—কি তোমার আব্দার !

—বলি। তুমিও একটি বিয়ে কর।

পতি দেবতার মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরে তরু ব'লে ওঠে—ছি ছি, কী যে বলো তুমি।

—কেন গো, আর ও কথা বলবে আমায়? আমার ছেলে হ'লে তোমার কি?

—তোমার হলেই আমার।

—ঠিক তার উল্টো। আমার হলেই—তুমি আর আমার নয়। আমি তখন তারই—যিনি আসবেন।

—তা হোক! বাঙ্গালা দেশের মেয়ে আমরা। আমরা পর হতেও জানি, আপন থাকতেও জানি। তোমার ঘরের চেয়ার, টেবিল যাবতীয় আসবাবের মধ্যে আমিও একটি তেমনি সামগ্রী! এই নিয়ম। তোমাকে দিয়েই আমি, আমাকে দিয়ে তুমি নও।

—ভট্টপল্লীর খাতা খুলে বসলেও তুমি যখন আমাকে বোঝাতে পারছো না, তখন এ প্রস্তাব আপাততঃ তোলা থাক।

এমনিতর খণ্ড খণ্ড বাক্য-যুদ্ধ····ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হয়ে দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব থেকে দর্শনে গিয়ে সব অদর্শনের মধ্যে একাকার হয়ে যায়।

মীমাংসা আর কিছু হয়ে ওঠে না। প্রস্তাবনাটাও তোলাই থাকে।

কিন্তু নিরবলম্ব জীবন কি করে কাটে? সংসারে বাঁচতে হ'লে একটা কিছু চাই-ই। পিতৃপুরুষের ছোট জমিদারীখানি তাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট বলতে হবে; কিন্তু অমলের ক্ষুধা তাতে মেটে না।

সে চায় জমি—আরো জমি·······

সরকার ভবদেব এসে বললে—হিজলতলা মহালের দাম চড়িয়েছে ষাট গুণ।

অমল অবাক হয়ে বললে—বলেন কি?—এত!

বৃদ্ধ সরকার উত্তরে সবিনীত হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ শুধু আপনার জন্যই বাবু। আপনার জেদাজেদীতে এতটা চড়ে গেল।

—এই না আপনি বলছিলেন, চল্লিশ গুণ পঞ্চাশ গুণে সম্পত্তি ছড়াছড়ি যাচ্ছে?

—যাচ্ছেই ত'। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে চাহিদার মাত্রাটা এতই বেশী যে, সে সুবিধাটুকু ছাড়তে কেউ রাজী নয়।

—তাই নাকি ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অমল আবার বললে—হোক যাট গুণ—ওটা আমার চাই-ই। বুঝলেন সরকার মশাই ? আর শুধু ওটা নয়,—ধীরে ধীরে এই ছোট পরগণার গোটা মালিকানা স্বত্ব অমলেন্দু রায়ের যেদিন হবে—সেদিন যদি তার এ চাহিদার বিরাম ঘটে ! আপনি দেখুন,—আমি নেব।

দেখতে কসুর ভবদেব করে না।

এমন একটি খাম-খেয়ালী মনিব পাওয়া ভাগ্যের কথা।

কী যে খেয়াল !

চাই জমি···কেবল চাই জমি ! এ অনন্ত ক্ষুধা তার যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তা চলুক। এমন ক'রে না চল্‌লে ভবদেবেরই বা দু' পয়সা হবে কোত্থেকে ?

ক্ষুদ্র বেতনের সরকার। তবু তার ভগ্ন কুটীর দিনে দিনে খড় ছেড়ে টিন—টিন ছেড়ে, ইঁটের গাঁথুনী সুরু হয়েছে !

সে—সব সূক্ষ্ম কথা শুনতে অমল রাজী নয়। তার স্থূলদৃষ্টি তখন কেবল মাঠের পর মাঠ, চড়ার পর চড়ার দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। মাঠের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান আর তার শ্যাম-শোভায় তার চোখে লেগেছে নেশা !

এরপর এমন একদিন এলো—যেদিন সত্যি করেই অমলেন্দু রায় বাকি পরগণাটুকুর ওপর ষোল আনা প্রভুত্ব ছড়িয়ে বসলো।

আজ সে হিজলতলা, কনকসার, মেহুর, রাণীরদীঘি আর নন্দনপুর পাঁচটি গ্রামের মালিক। দোর্দ্দণ্ড তার প্রতাপ !

কিন্তু সেদিন যে সে বলেছিল—এইটুকু হ'লেই তার এ প্রবৃত্তি বিরাম লাভ করবে, সে কথা ভুল ! বরং সে ছোট ক্ষুধা ধীরে ধীরে সর্ব্বগ্রাসী রূপ ধরে বসলে !

ভবদেব এসে বললে—এইবার থামুন বাবু। নইলে যা করেছেন—তাও রাখতে পারবেন না। ন্যায্য মূল্যের সম্পত্তি কোথাও দেড়া কোথাও বা দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ ক'রে ক'রে দেনার অঙ্ক যে পরিমাণ বেড়েছে—তা মোটেই কম নয়! দেনার বোঝা কমিয়ে দিয়ে বরং আবার—

অমল বিজ্ঞের মত দু' হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—চুপ করুন। সে কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। কি আর দেনা! খরচের তালিকা আমাদের সংক্ষিপ্তই আছে; বরং আরো সংক্ষিপ্ত ক'রে আনবো। আপনি দুটো বছর দেখুন,—একটি পাইও আর দেনার খাতায় পাবেন না। দেখছেন ত' আমার জমিতে সব সোনা ফলেছে; নইলে কি আর ওই আগুনের দামে জমিগুলো কিনতে গিয়েছিলাম?

ভবদেব বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু—

অমল তাকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললে—কিন্তু-টিন্তু কিছু নয়। আমার কাছে ওর কোন মানে নেই। জমির মত কি আর জিনিষ আছে মশাই? মাটিই খাঁটি, জানেন ত'?

ভবদেব জানে। এমনি তত্ত্বকথা আজ সে বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছে!

ভবদেব হতাশ হয়ে সরে পড়ে।

এইবার আসে—স্ত্রী তরুবালা।

স্বামীর গায়ের ওপরে সে নিজের দেহ এলিয়ে দিয়ে বলে—ওগো?

—বলো।

—কি হবে এত দিয়ে? তোমার পায়ে পড়ি তুমি থামো।

—আমি ত থামতেই চাই, কিন্তু আমাকে যে থামতে দেয় না।

—কী যে নেশা তোমায় পেয়ে বসেছে—না সত্যি, কি হবে এত দিয়ে? কার জন্য এত সব—আমার ভালো লাগে না। বলি যে একটা বিয়ে করো, নইলে এগুলো দিয়ে হবে কি,—কাকে দিয়ে যাবে?

—তাইত ভাবি, কাকে দিয়ে যাবো! যাক—ওই রাণীর দীঘির পাশের বিলের ধারের ওই একশ' বিঘে জমিটুকু পেলেই আমি খুশী। আর নয়, ঠিকই বলেছ, সত্যিই ত—কার জন্য এ সব করছি! এইবার শেষ।

—না, এ কাজে তুমি কিছুতেই হাত দিতে পারবে না। আমি শুনেছি, নওগাঁর পাল চৌধুরীরা ওই জমির আশায় ওখানে আগে থাকতেই টাকা ছড়িয়ে রেখেছে—ওটা ওরা ছাড়বে না।

—ছাড়তে কি পারে? আহা, জমি ত নয়, যেন সোনারখনি! ওই খেতের ফসলের পানে একবার যার চোখ পড়েছে—সেকি আর ছাড়তে পারে?

—কিন্তু....

—আবার কিন্তু? তোমরা আমায় পাগল ক'রে দেবে নাকি? হোক না পাল চৌধুরী! কত আর বড়ো সে আমার চেয়ে? তুমি চুপ করে থেকে দেখো—বিনা ঝঞ্ঝাটে কেমন সুড় সুড় করে....... আরে টাকা দাদন আমিও ওখানে করেছি। করেছি শুধু ওই লোভেই!

তরুবালা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বাস্তুদেবের শ্রীচরণে স্বামীর সুমতির জন্য মনে মনে হয়ত কত কিছুই মানত করে বসলো।

দেবতা কিন্তু চুপ করেই রইলেন!

রাণীর দীঘির বিলের পাশের সে একশ' বিঘে জমি নিয়ে গণ্ডগোল বিশেষ উপস্থিত হলো না। দু'তরফের ভাগেই অর্দ্ধেক করে পড়লো।

কিন্তু বিপত্তি ঘটলো তার সীমা বণ্টন নিয়ে!

এক রত্তি জমি বিলের জলের সঙ্গে মিসে গেছে। সুতরাং দু'দলের মধ্যে কেউ কম নিয়ে সে ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

দেখতে দেখতে কলহ জমে উঠল ঘন হয়ে—কেউই ছাড়বার পাত্র নয়; হটতেও কেউ রাজী নয়।

সেদিন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে দু'দলের লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে, পাইকে পাইকে ভীষণ সংঘর্ষ বেধে গেল।

সে এক খণ্ড যুদ্ধ!

অমল হাতীর হাওদায় চেপে নিজের পাইক, বরকন্দাজ লাঠিয়ালের বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

ওদিক থেকেও পাল চৌধুরীদের বিপুল অভিযান। পর পর সাজানো—বন্দুকধারী সেপাই, হলঙ্গা-সুলপি-ঢাল-বল্লমধারী সর্দার, লাঠিয়াল, পাইক এক কথায় একটি অগণিত জনসঙ্ঘ!

নৈশ অন্ধকার গাদাবন্দুকের ক্রুম্ ড্রাম শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। দুই দলের উন্মত্ত জনতার সেই হিংস্র কলরবের মধ্যে অমলের মুহুর্মুহুঃ উৎসাহবাণী ঢেউয়ের মত ভেসে আসতে থাকে।

সেই উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে এমন প্রলয় আকার ধারণ করলো—যে শেষ পর্য্যন্ত দু'পক্ষেরই খুন জখম কিছুই বাকী রইলো না। পাল চৌধুরীদের দু'টী লোক সে দাঙ্গায় নাকি মারাও গেল!

এ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরের কথা।

মহকুমা, জেলাকোর্ট, হাইকোর্ট ডিঙ্গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের বড় দরবার হ'তে যেদিন মামলা ফিরে এলো—সেদিন পরাজয়ের লজ্জাটা অমলের কাছে নেহাত তুচ্ছ বলেই মনে হলো।

ক্ষতি পূরণ আর মামলার সে বৈশ্বানরের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে তার ভাগে অবশিষ্ট রইল—পিতৃপুরুষের সেই গ্রামটুকু মাত্র—নন্দনপুর!

কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না। ঋণের শেষ রাখতে নেই। অথচ তার তা' ছিল। নদীর ভাঙ্গনের মতই একটু একটু ক'রে শেষ অংশটুকুও বুঝি এবার খসে যায়!

বাকী রইলো শুধু বাস্ত-ভিটাটুকু!

অমলের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ গেছে থেমে।

পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, দাস-দাসী, সরকার, গোমস্তা—সবই যেন একই সঙ্গে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে!

ভবদেবের মৃত্যু ঘটেছে—

কিন্তু তার দ্বিতল অলিন্দ হ'তে তারই বংশধর অমলের বাস্তু-ভিটাটির পানে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে আজও তাকিয়ে থাকে।

ওটা তারই প্রাপ্য। আদালতের মঞ্জুরী সে পেয়েছে। দখলটুকুমাত্র এখন বাকী।

কিন্তু শত হ'লেও ভূতপূর্ব্ব মনিব ত।

মুখফুটে কথাটা বলতে সে যতবারই গেছে—বারম্বার রসনার অনাবশ্যক জড়তা তাকে দিয়েছে বাধা।

কিন্তু লক্ষ্মী যখন আসেন—হেঁটেই আসেন।

ভবদেবের পুত্রকে ডেকে তরুবালা নিজে বললে—আমার স্বামী যখন দেনা তোমাদের শুধতে পারেননি—তখন আদালত বলুক আর নাই বলুক—এ বাড়ী তোমারই। কিন্তু বাবা, একটা নিবেদন তোমার কাছে আমার আছে—যদি রাখ ত বলি।

মাথা নত ক'রে ভবদেব-বংশধর বললে—বলুন।

—একটু জায়গা তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমার শ্বশুরকুলের মন্দিরটুকু। এইটুকু পেলেই আমার চলে যাবে। রুগ্ন স্বামী নিয়ে আমি আজই তোমার বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি, যদি....

তরুবালাকে আর শেষ করতে না দিয়ে ভবদেবের পুত্র দাক্ষিণ্যের পরিচয়ই দিলে।

ভগ্ন শিবালয়। তারই সংলগ্ন জমিটুকু।

বোধকরি বা দৈর্ঘ্য প্রস্থে চার হাত ছ' হাতের বেশী হবে না।

বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ধ্বসে গিয়ে সম্বল বলতে, নিজস্ব বলতে এই টুকুই মাত্র আজ তাদের। সেই ভগ্ন মন্দিরের কোণে জড়াজড়ি ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে বাস করে। অমলের অকাল বার্দ্ধক্য তাকে অথর্ব্ব করে ফেলেছে। আয়ু তার এসেছে সংক্ষিপ্ত হয়ে।

স্বামী-স্ত্রীর দুর্লভ প্রেম এই ভীষণ প্রত্যক্ষ সজ্ঘাতেও তেমনি অমলিন আছে। যা' যাবার তা' গেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সঙ্গে সঙ্গে সত্য গ্রন্থিটুকু তার বাঁধন শিথিল ক'রে যে দিয়ে যায়নি এই তাদের মস্ত লাভ! বরং এই বিপন্ন অসহায় সংস্থানে তাদের স্বামী-স্ত্রীর একাত্ম ভাবটা যেন আরো গভীর অচ্ছেদ্য হয়ে জড়িয়ে পড়েছে।

অমল বলে, আমি আগে যাবো—

স্ত্রী তার স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—ছিঃ, ওকি কথা! আমি আগে যাবো....

একটা প্রশান্ত নিঃশ্বাস ফেলে অমল বলে—বেশ তাই যাও! আমি তাই চাই। আমি তোমায় কতো ভালবাসি, এই তার প্রমাণ। আমার আগে তোমার মৃত্যুই কামনা করি। কিন্তু আমার জীর্ণ দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য বুঝি সেকথা আর শোনে না, তাই বলি আমিই বা আগে চলে যাই।

বিদায়ের পালা চলেছে।

কে আগে পৃথিবী হতে বিদায় নেবে—এই নিয়ে তাদের ভঙ্গুর জীবনের লুণ্ঠনাবশিষ্ট প্রেমটুকু করুনতম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শেষ হতে চায় না।

বৃদ্ধ জলাপাত্রের গ্রামের মধ্যে নিরহঙ্কারী নিরীহ হৃদয়বান বলে খ্যাতি আছে।

অমলের দুর্দ্দিনের দিনে জলপাত্রের এই সহৃদয়তার মূল্য কেইবা দেবে?

অমল—ঠাকুর্দ্দা, আমি ত চললাম, কিন্তু আমার তরুকে রেখে যাবো কার কাছে? আপনারা সেকেলে লোক—এমন কিছু গাছ-গাছড়া জানা নেই, যা' খাইয়ে আমাকে আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন!

বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দার মুখ দিয়ে ভাষা ফোটে না। মিথ্যা কতকগুলো প্রলাপ গুছিয়ে বলে—সান্ত্বনা দেবার রীতি ঠাকুর্দ্দার জানা নেই, তাছাড়া ভালোও লাগে না!

প্রাক্তন বিশ্বাসী লোকটি শিয়রের পাশে ব'সে ব'সে হয়ত সেই কথাই ভাবে।

অমল বলে—ঠাকুর্দ্দা, আমি ম'লে আমার দাহটা যেন এই জমি টুকুতেই হয়। জানো ত, জীবন ভোর জমির তপস্যায় কেটে গেছে। তাই যেটুকুতে আমার সত্যিকারের প্রয়োজন—সেইটুকুই ঠিক আমার আছে। ওই জায়গাটাতেই আমার সৎকার কোরো। বারোয়ারী শ্মশানে গিয়ে আমার দেহটা নিয়ে তোমরা কাড়াকাড়ি কোরো না—যাবার বেলায় এইটুকুই তোমার কাছে আমার মিনতি।

• তলাপাত্র তথাপি নির্ব্বাক। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত হয়ে সরল বৃদ্ধ জলভরা চোখ জোড়া সরিয়ে নিয়ে বলে—হবে, তাই হবে।

অমল বলতে থাকে—আর একটি অনুরোধ ঠাকুর্দ্দা—ওই জায়গাটার ওপর একটা ছোটো বটের চারা পুঁতে দেবে—যেন একশ'. বছর পরেও সে মানুষকে ডেকে বলে দিতে পারে—একটি কি দু'টি মানুষের পক্ষে সত্যিকারের কতটুকু জমির আসল প্রয়োজন! বুঝলে ঠাকুর্দ্দা, এ তরুস্তম্ভের ব্যবস্থাটুকুও তুমি নিজে হাতে করবে।

পদতলে লুণ্ঠিতা স্ত্রীর আকুল উচ্ছাস যেন আর থামতে চায় না!

স্বামীর পায়ে মাথা ঠুকে বলে ওঠে—ওগো, এসব তুমি কি বলছো?···· বাঁচবে গো বাঁচবে···তোমাকে বাঁচিয়ে আমিই রাখবো। গাছ-গাছড়া কিচ্ছু লাগবে না। আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে আমি যেতে দিলে ত?

তরুবালার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে এলো সে কথা কে বললে কে জানে? হয়ত তার জিহ্বাগ্রে মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানের অধিষ্ঠান হয়েছিল।

এ যেন সত্যই ভগবানের মুখ দিয়ে শোনা কথা! একটি দিনের মধ্যে তরুর যে কী হলো, কেউ ভালো ক'রে তা নির্দ্দেশও করতে পারলে না। উপলক্ষ্য মাত্র বার-দুই ভেদবমি। কিন্তু মানুষে বলে ইচ্ছামৃত্যু। দেবী কিনা—তাই বুঝি সম্ভব হয়েছে!

হয়ত বা হবে।

তরুবালা শেষ বিদায় নিলো হাসতে হাসতে।

অমল ভাবলে—কী হলো! সত্যিই তো সে চলে গেল। সাধ্বী নারী তার উচ্চারিত বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে চলে গেল। এই ত অমল চেয়েছিল। কিন্তু আজ ত মন প্রবোধ মানে না। সে থাকবে কাকে নিয়ে?

মন্দিরের সিঁড়ির নীচেই সেই জমিটুকুর উপর চিতার আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠছে। চিতার প্রক্ষিপ্ত ধূম ধীরে ধীরে কুণ্ডলাকারে উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে পাক খেতে খেতে শূন্যে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাক্যহারা মূক, বধির সে অগ্নিশিখা ধূমদূতের মারফৎ কোথায় কোন দেশে—কোন মায়ালোকে কী বার্ত্তা প্রেরণ করে দিচ্ছে—কে জানে!

অনন্তের কানে কানে সে চিরন্তন বাণী নশ্বরতার কত সূত্রই না গেঁথে দিচ্ছে! তরুর দেহ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে নন্দন-কাননের কোন তরুর শাখে গিয়ে বাসা বাঁধলো—তাও বলতে পারি না।

সতীর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নির্ব্বাণপ্রায় তরুবালার শেষ শয়ানের দিকে অমলের উদভ্রান্ত দৃষ্টি বারম্বার ঘা খেয়ে খেয়ে অস্থির অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হৃদপিণ্ডের পাগলা নর্ত্তনে অকস্মাৎ যেন তা' স্তব্ধ হয়ে আসতে চায়। জীবনীশক্তির ক্ষীণতম সুরটুকু বুঝি এখানেও কাটে!

যাবার কথা তারই আগে ছিল।

ধিক ধিক করে আত্মার স্থিতিটুকু লয়ের মধ্যে মিশে যাবার জন্য এক পা তার প্রসারিত হয়েই ছিল। এইবার আর এক পাও বুঝি বাড়ায়। তরুর অকস্মাৎ তিরোধান এই দুর্ব্বল হৃদয় ভেঙ্গে চুরে খান খান করে দিলে। অমলের হয়ত বা মনে হলো—হিমালয়ের চূড়া ধ্বসে গিয়ে তারি বুকের উপর আছড়ে পড়েছে।

কণ্ঠের নির্জ্জীবতা উদ্বেল উচ্ছ্বাসকে চেপে দিয়ে কেবল মাত্র ওই একটি শব্দ বেরিয়ে আসতে অনুমতি দিলে—তরু....

তারপর সব শেষ।

অমলের নিষ্কম্প দৃষ্টি তরুর নির্ব্বাণপ্রায় শ্মশানের দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল। তলাপাত্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—ভালোই হলো! এমন হয় না!

তরুর চিতার আগুন নিভে এসেছে। অঙ্গারের আত্মরূপ তখন ছোট ছোট স্বর্ণ রশ্মি দিয়ে ঢাকা…

শ্মশান-বন্ধুদের নূতন উত্তম সুরু হলো।

একই চিতায় একই তিথিতে অমল-তরুর নশ্বর দেহ অগ্নি গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

* * * *

সেই নিশ্চিহ্নতার বেদীর উপর আমার জন্মোৎসব সুরু হলো। অশ্রুর ধৌত সেই ভূমিখণ্ডের উপর কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর সেই তিথিতে বৃদ্ধ তলাপাত্রের হাতে আমার জন্ম। আমার নাম রাখা হলো—"অমল-তরু।"

পরগণার লোক সেই থেকে আমায় ওই নাম ধরেই ডাকে।

মহা-মিলনীর সেই ক্ষেত্রটীতে আজো আমি অর্দ্ধ শতাব্দীর সুখ-দুঃখ, উত্থান পতনের কত কাহিনী বুকে জড়িয়ে গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছি।

মানুষকে ডেকে বলি—

ওরে পথিক, পান্থশালার ভিড়ের মাঝেও ওই জমিটুকুর কথা দিনান্তে একবার অন্ততঃ ভাবিস! মাটিতে মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন যদি কিছু থাকে ত—সে বিশাল ভূমিখণ্ড নয়—রাজত্বের বিপুল বিস্তার নয়, রশীরদীঘির বিলের পাশে সুবর্ণপ্রসূ শস্য-শ্যামল ধানের জমিও নয়,—

প্রয়োজন শুধু আমার পদপ্রান্তে ছায়াশীতল যে অকিঞ্চিৎকর ভূমিখণ্ডের ওপর অমল-তরুর শেষ-শয্যা রচিত হয়েছে—

মাত্র ওইটুকু!



সাঁওতাল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতাল দেখেছ ? সাঁওতালদের বস্তি ?

কোনোদিন দ্যাখোনি, না ? চল—আজ তোমায় দেখাব। এসো আমার সঙ্গে !

ওই যে দূরে দেখছ প্রকাণ্ড ওই পাহাড়, আর ওই যে দেখছ সবুজ গাছের সারি, সারা দক্ষিণ-দিকটা জুড়ে সোজা চ'লে গিয়ে ওই আকাশটাকে ছুঁয়েছে, ওই জঙ্গলের ভেতর পাহাড়ের নীচে আছে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম।

ছোট্ট একটি নদী পেরোতে হবে। নদীতে জল অবশ্য এখন নেই, এখন আছে শুধু শুকনো বালি। কিন্তু বর্ষাকালে একবার এসে দেখো—দুকূল ছাপিয়ে বানের জল ঠিক তীরের মত সোঁ সোঁ ক'রে ছুটে চলেছে। বানের তোড় না কমলে পারাপার বন্ধ।

জঙ্গলের এই গাছগুলোর নাম জানো ?

শহরের মানুষ। কেমন ক'রেই বা জানবে।—এই শাল, আর এই মহুয়া। এখানে এই শাল-মহুয়াই বেশী।

কিসের ওই মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ বল দেখি ? শাল-ফুলের গন্ধ। আর কয়েকটা দিন পরেই মহুয়ার ফুল ফুটবে। তখন যদি একবার এই বনের ভেতর ঢোকো তো সহজে আর বেরোতে চাইবে না। শাল-ফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি, কিন্তু মহুয়া ফুলের গন্ধ বড় তীব্র। মগজের ভেতর ঢুকে মানুষকে যেন পাগল ক'রে দেয়। দেখেছ কত রঙ্-বেরঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

ওই তো কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। আর একটুখানি।

ওই শোনো মাদল বাজছে, বাঁশী বাজছে! গান আরম্ভ হয়েছে। যাক্, বেশ ভাল সময়েই এসেছ! ওদের নাচ দেখতে পাবে।

এই তো এসে গেছি?

নেচে নেচে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে ওরা ওই পাহাড়ের ধারে। সঙ্গে নিয়ে চলেছে বিস্তর ফুল আর পাতা।

চল ওদের সঙ্গে যাই—দেখি ওরা কি করে! পাহাড়ের নীচে পাথর দিয়ে বাঁধানো ওই বেদীর ওপর ফুল আর পাতাগুলি রেখে ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে প্রণাম করছে—কেন বল দেখি?

ভারি মজার একটা গল্প আছে। শোনো বলি।

ওই যে দেখছ বুড়ো গাংটু মাঝি মাথা হেঁট ক'রে চোখের জল মুছ্ছে—ওই গাংটুই এদের এই গ্রামের সর্দার। গাংটুর বাবা ছিল সর্দার, বাবার বাবাও সর্দারী করেছে। গাংটুরা পুরুষানুক্রমে সর্দারী ক'রে আসছে।

গাংটু বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও ওর চেহারা দেখেছ?

কাঁধের ওপর পড়েছে পাকাচুলের বাব্‌রি, গলায় লাল কাঁটির মালা, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি আর হাত-পায়ের গড়ন দেখেছ? ওই হাত দিয়ে কত বাঘ যে মেরেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ও জোয়ান, বয়েস বোধকরি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। বাড়ীতে তার স্ত্রী, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি নিতান্ত কচি, ছেলেটি বছর দশেকের। সাঁওতাল-সর্দারের ছেলে, দশ বছর বয়সেই এম্‌নি বেড়ে উঠেছে যে, দেখলে মনে হয় ষোলো-সতেরো বছরের ছোক্‌রা। নাম—বাজ।

মাসে একদিন ক'রে প্রকাণ্ড হাট বসে আমাদের গ্রামে। এই হাটের দিনে অনেক দূরের জঙ্গল থেকে অনেক সাঁওতালকে আমাদের গ্রামে আসতে হয়। হাটে আসে তারা সওদা ক'রতে। কেউ কেউ মোটা তাঁতের কাপড়

কিনে নিয়ে যায়, কেউ-বা কাঁটির মালা কিনতে আসে, কেউ-বা আসে তেল আর নুন কিনতে। তারাও কিন্তু খালি হাতে আসে না। তালপাতার ছাতি, বাঁশের বাঁকারি দিয়ে তৈরি নানারকমের জিনিস, রেশমের গুটি এম্‌নি সব কত রকমের কত জিনিস নিয়ে এসে হাটে তারা বিক্রী করে, আর সেই পয়সা দিয়ে ফেরবার সময় নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায়।

সে বছর বর্ষা নেমেছিল একটুখানি তাড়াতাড়ি। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ না হ'তেই ঝম্ ঝম্ ক'রে বাদল নাম্‌লো। ছোট্ট রূপাই নদী বর্ষায় একেবারে পাগল হ'য়ে উঠবে, গ্রামে সওদা ক'রতে যাওয়া হঠাৎ কোন্‌দিন বন্ধ হ'য়ে যায় কে জানে, তাই এই সাঁওতালেরা প্রায় প্রত্যেক হাটেই ভিড় ক'রতে লাগলো।

নদীর জল একটু একটু ক'রে বাড়ছে। সেদিন তাদের শেষ হাট-বার। সমস্ত গ্রাম একেবারে উজাড় ক'রে হাটে গেল। গ্রামে রইলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। গাংটু তার ঘরের সুমুখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সে বছর চিনে-বাদামের চাষ করেছিল। ছোট ছোট বাদামের গাছে সবেমাত্র কচি কচি পাতা গজিয়েছে। দিনের বেলা যে-কেউ একজনকে সারাদিন ধ'রে ক্ষেতে পাহারা দিতে হয়। পাহারা না দিলে যত রাজ্যের কাক আর পাখি এসে ঠোঁট দিয়ে গাছের তলার মাটি খুঁড়ে বাদামগুলি মুখে নিয়ে উড়ে পালায়।

ক্ষেতে পাহারা দেবার জন্যে গাংটু রেখে গেল তার ছেলে বারুকে। বললে,—'ছুটে কোথাও পালাস্ না বাবা, তীর-ধনুক্ নিয়ে এইখানে ব'সে থাক্।'

বারু হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে গিয়ে বসলো সেই ক্ষেতের পাশে। তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে তার হাতের লক্ষ্য ঠিক ক'রতে লাগলো।

সূর্য্য তখন পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপরে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একজন জোয়ান সাঁওতাল বারুর কাছে এসে বললে, 'এই! আমি এই—তোদের ঘরে কোথাও লুকিয়ে থাকি, আমাকে কেউ খুঁজতে এলে বলবি—জানি না। বলবি—কই, এ দিকে কেউ আসেনি। বুঝলি?'

বারু প্রথমে একটুখানি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটার অবস্থা

দেখে তার দয়া হ'লো। বললে, 'যাও ওই খড়ের গাদার ভেতর ঢোকো গিয়ে, কেউ দেখতে পাবে না।'

লোকটা তাড়াতাড়ি ঢুকলো গিয়ে খড়ের গাদায়। বারু বেশ ক'রে তার ওপর আরও কতকগুলো খড় বিছিয়ে দিলে। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখ্লে কিছু বুঝতে পার্বে না।

খানিক পরেই দেখা গেল, লাল লাল পাগড়ী বাঁধা কয়েকজন পুলিসের লোক লাঠি হাতে নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে আসছে। তারাও ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো বারুর কাছে। এসেই জিজ্ঞেস করলে, 'হাঁরে এই ছোঁড়া! এদিক্ দিয়ে কাউকে তুই যেতে দেখলি ?'

বারু অম্লান-বদনে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

কিন্তু সাঁওতাল জাত, মিথ্যা বলার অভ্যেস তাদের নেই। বলবার ভঙ্গীটা তার কেমন যেন অন্য রকমের। এদের কেমন যেন সন্দেহ হ'লো। বললে, 'বল না কোন্দিকে গেল।'

বারু বললে, 'জানি না।'

তারা ছিল চারজন। দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো বারুর কাছে, আর দু'জন গিয়ে ঢুকলো তাদের ঘরে। ঘরের ভেতরটা একবার খোঁজ ক'রে দেখবার জন্যে।

বারুকে তারা সহজে কিছুতেই ছাড়তে চায় না! দূর থেকে তারা ঠিক দেখেছে লোকটা ছুটতে ছুটতে এই দিকেই এলো। এ ছোঁড়া নিশ্চয়ই দেখেছে।

তাদের মধ্যে একজন বললে, 'ছেলেমানুষ, হয় তো নাও দেখতে পারে। চল একবার ওই দিককার ঘরগুলো দেখি। দেখে ফিরে যাই, আর পারি না বাবা।'

'চল।' বলে তারা অন্যদিকে চ'লে গেল।

কিন্তু খানিক পরেই কি ভেবে তাদের মধ্যে আবার একজন ফিরলো। হাজার হোক্, ছেলেমানুষ তো। বারুকে কাছে ডেকে সে বল্লো, 'শোন্।'

বারু কাছে এসে দাঁড়াতেই সে তার পকেট থেকে দুটো টাকা বের ক'রে বারুর হাতে দিয়ে বললে, 'এই টাকা দুটো নে। বল্ এবার সে কোন্ দিক দিয়ে গেল।'

দুটো টাকা! একসঙ্গে! বারু হেঁটমুখে টাকা দুটো বারকতক নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে। খুশি হ'য়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলে। হেসে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, 'জানি না।'

'না বাবা, সত্যি জানিস্। বল্, আরও দুটো টাকা তোকে আমি দেবো।' ব'লে সে তার পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

বারু তখন আঙুল বাড়িয়ে চুপিচুপি সেই খড়ের গাদাটা দেখিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

বাস্! পুলিসের হাতে লোকটা ধরা প'ড়ে গেল।

হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে লোকটাকে যখন তারা থানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় তাদের গ্রামের লোকজন সব হাট থেকে ফিরে এলো। গাংটু এলো, তার স্ত্রী এলো, বারুর ছোট বোনটি এলো।

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে সবাই এসে জড়ো হ'লো গাংটুর ক্ষেতের কাছে। আসামীকে অনেকেই তারা চিন্তে পারলে। লোকটা প্রথমে ছিল তাদেরই এই গ্রামে। শয়তানের একশেষ! সাঁওতাল জাতের কলঙ্ক। এই গাংটুর বাবাই তাকে এ-গ্রাম থেকে তাড়িয়েছিল।

পুলিসের জমাদার-সাহেব বললে, 'কত জয়গায় কত চুরি ডাকাতি যে ও করেছে তার ঠিক নেই। পাঁচুইডি কলিয়ারীতে একটা মেয়েকে খুন ক'রে ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজও হয়ত ও পালাতো কিন্তু এই ছেলেটি।' বলেই সে বারুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ও কার ছেলে?'

গাংটু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, 'আমার।'

জমাদার-সাহেব হাস্তে হাস্তে বললে, ওই খড়ের গাদায় ও-ই ওকে

লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর দুটি টাকা হাতে পেয়ে ভাগিস্ দেখিয়ে দিলে, নইলে আজ ব্যাটা আমাদের হায়রান ক'রে মারতো।

জমাদার-সাহেব পকেট থেকে তার ছোট্ট একটি খাতা বের ক'রে পেন্সিল দিয়ে গাংটুর আর তার ছেলে বারুর নাম লিখে নিলে; বললে, 'গভর্ণমেণ্ট থেকে বারুকে আরও কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে।'

এই বলে' তারা চলে গেল।

সন্ধ্যে থেকেই আকাশে সেদিন চাঁদ উঠেছিল। পূর্ণিমার রাত।

বারুকে সঙ্গে নিয়ে গাংটু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ঘন দুর্গম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক সময় পাহাড়ের তলায় গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো।

গাংটু বাড়ী ফিরে এলো একা।

গাংটুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, 'বারু কোথায়? তোমার সঙ্গে গেল না?'

গাংটুর চোখ দু'টো লাল, হাত থেকে তীর ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই-খানেই সে উন্মাদের মত নীরবে পায়চারি ক'রতে লাগলো। মুখ ফুটে কিছুই সে বলতে পারলে না।

বারুর মা উন্মাদিনীর মত ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। গাংটুকেও যেতে হ'লো তার পিছু পিছু। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। কি যে বলতে গিয়েও সে বলতে পারলে না।

বারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে বারুর মা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে গাংটুর পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে পড়লো।—'এ তুমি কী করেছ নিষ্ঠুর! এ কী করলে তুমি সর্দার?'

সর্দারেরও দু'চোখ বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এসেছে। খানিক থেমে সে নিজেকে একটুখানি সাম্‌লে নিয়ে বললে, 'আমাদের বংশের ওই প্রথম বিশ্বাসঘাতক। আমি তার শাস্তি দিয়েছি।'

বলেই সে তার স্ত্রীকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধ'রে কান্নাকাতর কণ্ঠে বললে, 'চুপ কর।'

কাঁদতে কাঁদতে বারুর মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি শাস্তি দিয়েছ? মেরে ফেলেছ?'

গাংটু ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ'।

বারুর মা তার মৃতদেহটা দেখবার জন্যে ছটফট ক'রতে লাগলো।

গাংটু বললে, 'তার চিহ্ন রাখিনি কোথাও। খাদের বয়লারের আগুনের ভেতর দিয়েছি ঢুকিয়ে। পুড়ে এতক্ষণ ছাই হ'য়ে গেছে!'

আজ সেই বিশ্বাসঘাতক বারুর মৃত্যুতিথি। পাহাড়ের নীচে পাথরের ওই বেদীর কাছেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা তাই আজ তার সেই সমাধি স্থানটিকে ফুলে পাতায় সাজাতে এসেছে।

নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা ক'রে অবধি গাংটুর অবস্থা হ'লো ঠিক পাগলের মত। সাঁওতাল সমাজের কঠোর নিয়ম তাকে পালন ক'রতে হয়েছে, পিতা হ'য়ে পুত্রকে হত্যা করেছে,—পাগল তো সে হবেই!

কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ তাকে ঠিক বলা চলে না, বদ্ধ উন্মাদ সে হয়নি। দিবারাত্রি মনে হয় যেন সে অন্যমনস্ক হ'য়ে রয়েছে, অসম্ভব রকম গম্ভীর, কারও সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতে পারে না, সর্বদাই এদিক-ওদিক তাকায়, মনে হয়, কার যেন সে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে।

গ্রামের লোক তার দুঃখে সহানুভূতি জানায়। বুড়োরা বলে, 'আহা!' ছেলে-ছোকরারা বলে, 'চমৎকার!'

সাঁওতাল-সমাজে এমনি শক্ত পুরুষব্যাটাছেলের পৌরুষের দাম বড় বেশি। ঘ্যান-ঘেনে প্যান-পেনে ভয়ে-পিছিয়ে-আসা মানুষ তারা পছন্দ করে না।

প্রায় মাসখানেক পরে পুলিসের লোক বারুর জন্যে পুরস্কার নিয়ে এলো। পঁচিশটি টাকা।

এসেই তারা বারুর খোঁজ করলে। কিন্তু পুলিসের কাছে বলবার উপায়

নেই যে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এখন তারা বাস করছে ইংরেজ রাজত্বে, সামাজিক বিধানে এখন আর তারা লোক জানাজানি ক'রে শাস্তি কাউকে দিতে পারে না। এসব কাজ এখন তাদের গোপনেই ক'রতে হয়।

তাদের বলে দেওয়া হ'লো, 'সে বাড়ী নেই।'

টাকা পঁচিশটি তারা দিয়ে গেল বারুর বাবার হাতে।

টাকা ক'টি হাতে নিয়ে বারুর মার সে কী কান্না!

গাংটু তাকে কিছুতেই আর চুপ করাতে পারে না!

শেষে কি আর করে, যে-কথা গাংটু কাউকে বলেনি, যে-কথা ভেবেছিল জীবনে কারও কাছে বলবে না, বারুর মার কাছে তাই তাকে বলতে হ'লো! চুপি চুপি বললে, 'কাঁদিস্‌নি। তবে শোন, যা সত্যি কথা তাই শোন্, বলি বারু আমাদের মরেনি বেঁচে আছে।'

বারুর মা উঠে বসলো।

গাংটু বলতে লাগলো, 'নিজের ছেলেকে বাপ হ'য়ে নিজের হাতে খুন ক'রতে পারলাম না বারুর মা। হাত আমার থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। বারুও কাঁদতে কাঁদতে ব'লে উঠলো, আমাকে মেরো না বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পালাই। বললাম, তবে তাই যা। কিন্তু এ গাঁয়ে আর কখনও ফিরে আসতে পাবি না। বহুৎ দূরে যেখানে খুসি তুই চলে যা। বারু বললে, হ্যাঁ বাবা সেই ভালো। এই বলে সেই যে সে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে বনের ভেতর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল আর আমি তাকে দেখতে পেলাম না।'

বারুর মা চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যি বলছিস সর্দার?'

গাংটু বললে, 'সত্যি বলছি!'

বারুর মা বললে, 'তাহ'লে চল্ আমরাও এখান থেকে চলে যাই।—বারু যেখানে গেছে সেইখানে গিয়ে আবার ঘর বাঁধিগে চল্।'

গাংটু বললো, 'লোকে যে তাহ'লে বুঝতে পারবে বারুর মা! আমি

এখানকার সর্দার, আমার তা করলে চলবে কেন বল্ দেখি। বারু যেখানেই থাক বেঁচে আছে, সুখে আছে।'

বারুর মা কিন্তু কিছুতেই সে কথা শুনলে না। বললে, 'তুমি তা'হলে থাকো এইখানে, সর্দারী কর, আমি চল্‌লাম। এমন ক'রে চিরদিনের জন্যে ছেলে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। এ তো বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া দুইই সমান।'

সর্দার কি যে ভাবলে কে জানে, বললে, 'তাই চল্।'

খানিক্ থেমে আবার বললে, 'কিন্তু শোন্ বারুর মা, যেতে হ'লে আমাদের রাত্তিরে যেতে হবে। রাত্রির অন্ধকারে ছোট মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে চল্ আমরা বেরিয়ে পড়ি, কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, রাতারাতি জঙ্গল পার হ'য়ে চলে যাবো।'

বারুর মা সেই আশা ক'রে বসে রইলো।

সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই বারুর মা বললে, 'চল্ সর্দার!'

সর্দার বললে, 'এক্ষুনি? আরে দূর, এখন গেলে যে সবাই দেখতে পাবে! যাবো সেই দু'পহর রাতে, সবাই যখন ঘুমোবে—তখন।'

সেই ভালো।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে বারুর মা চুপ ক'রে বসে রইলো যাবার অপেক্ষায়।

গাংটু বললে, 'বসে বসে কতক্ষণ থাকবি বারুর মা? তার চেয়ে একঘুম ঘুমিয়ে নে, আমি তুলে দেবো।'

বারুর মা বললো, 'না। ঘুম আমার আসবে না!'

গাংটু তখন বলতে লাগলো, 'এখান থেকে কোথায় যাব তাই ভাবছি। বারু কোথায় গেছে কিছুই তো জানি না।'

বারুর মা বললে, 'যেখানেই যাক্, বেশি দূরে যায়নি, কাছাকাছিই আছে কোথাও। আমরা ঠিক তাকে খুঁজে বের ক'রে নেবো।'

সর্দার বললে, 'এখানকার জমিজমা বাড়ী-ঘর সব কিছু ফেলে দিয়ে চলে যাব বারুর মা, কিন্তু আমাদের ভারি কষ্ট হবে দেখে নিস্।

বারুর মা বললে, 'ছেলের জন্যে সব কষ্ট আমি সহ্য করবো।'

এমনি ক'রে দুজনের কথা-কাটাকাটি চলতে লাগলো।

বারুর মা দেখলে, গাংটুর যাবার তেমন ইচ্ছে নেই। তখন সে রাগ ক'রে বললে, 'বেশ, তবে তুমি থাকো, আমি একাই যাবো।'

গাংটু বললে, 'একা যাবি? জঙ্গলের ভেতর কত বাঘ আছে, ভালুক আছে, ভয় করবে না?'

বারুর মা বললে, 'ভয় যদি বারুর না ক'রে থাকে তো আমারও ভয় ক'রবে না।'

এ কথার ওপর আর কথা চলে না। গাংটু চুপ ক'রে রইলো।

সর্দার কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখলে, বারুর মা নেই, ছোট মেয়েটাও নেই। তাহ'লে বোধ করি সে একাই বেরিয়ে পড়েছে!

কিন্তু কখন্ বেরিয়েছে কে জানে। গাংটু ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলে, চারিদিক ফর্সা হ'য়ে আস্ছে, সকাল হ'তে আর বেশি দেরি নেই।

রাত্রি দু'পহরের পর যদি বেরিয়ে থাকে তো এতক্ষণ নিশ্চয়ই সে জঙ্গল পেরিয়ে গেছে। কোথায় কোন্ দিকে গেছে তাই বা কে বল্তে পারে।

গাংটু ভাবলে, সকাল হোক তারপর খুঁজতে বেরোবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঢুকতেই ঘরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্লো। গাংটু তীর-ধনুকটা হাতে নিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়লো!

প্রভাতের পূর্বেই সাঁওতাল-পল্লী তখন জেগে উঠেছে। চারিদিকে মোরগ ডাকছে, পাখি ডাকছে, প্রভাত সূর্যের রাঙা আলো এসে পড়েছে গাছে গাছে।

কাউকে কিছু না জানিয়ে নিতান্ত সন্তর্পণে গাংটু জঙ্গলের ভেতর গিয়ে

ঢুকলো। তারপর সোজাপথে না গিয়ে বাঁকা পথে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের বাইরে যখন সে বেরুলো তখন বেলা দু'পহর। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। কোথায় যাবে কিছুই ঠিক ক'রতে না পেরে খানিক সে থম্‌কে দাঁড়ালো। ভাবলে, কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রবে নাকি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার মত লোক-জন কাউকে সে দেখ্‌তে পেলে না! এখন সে যায় কোথায়? ভাবলে, গ্রামে ঢুকে কারও বাড়ীতে গিয়ে কিছু সে খেয়ে নেবে, তারপর আবার চল্‌বে।

একটা লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল, গাংটু জিজ্ঞাসা করলে, 'সাঁওতাল, একটি মেয়েকে এইদিক দিয়ে যেতে দেখেছিস?'

লোকটা বললে, 'জঙ্গলের ভেতরে দেখলাম—ছোট একটি মেয়ে কোলে নিয়ে সাঁওতালদের একটা মেয়ে—'

কথাটা তাকে শেষ ক'রতে না দিয়ে গাংটু জিজ্ঞাসা করলে, 'জঙ্গলের কোন্‌খানটায় বল্‌ দেখি? কোন্‌ দিকে?'

লোকটা বললে, 'বিষণপুর থেকে আসবার ওই রাস্তাটার ধারে। কিন্তু যাস্‌ না, ওদিকে শেয়াল ক্ষেপেছে।'

গাংটু পিছন ফিরে ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

গাংটু চলেছে তো চলেইছে!

বিষণপুরে যাবার যে রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে, গাংটু সেই রাস্তা দিয়ে অনেক দূর চলে গেল, কিন্তু বারুর মাকে কোথাও সে দেখতে পেলে না।

তবে কি লোকটা মিথ্যা কথা বললে নাকি?

কিন্তু না, ছোট একটি মেয়ে সঙ্গে আছে তাই বা তা'হলে সে জানলে কেমন ক'রে?

সারাদিন কিছু না খেয়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে গাংটু জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠলো। গলার আওয়াজ ঠিক বারুর মার মত! তখন সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে।

মনে হ'লো—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে বারুর মা যেন ছুটছে। মেয়েটাও কাঁদছে ব'লে মনে হ'লো। গাংটু সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটলো।

খানিক দূর গিয়ে দেখে, বারুর মা-ই বটে! মেয়েটাকে কোলে নিয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। একটা পাগ্‌লা শেয়াল তাদের তাড়া করেছে।

সর্বনাশ! গাংটু তৎক্ষণাৎ একটা বিষ-কাঁড় ধনুকে লাগিয়ে শেয়ালটাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে ছুঁড়ে। তীর গিয়ে বিঁধলো শেয়ালটার পেটে। খ্যাপা শেয়াল তীর খেয়ে আরও জোরে খানিক দূর ছুটে গেল, তারপর এক জায়গায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে কাঁই কাঁই ক'রে ঘুরতে ঘুরতে শুয়ে পড়লো।

বারুর মা পিছন্ ফিরে একবার তাকাতেই দেখলে, গাংটু ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

ভগবান রক্ষা করেছেন! বারুর মা মনে মনে তাকেই যেন খুঁজছিল। ভাবছিল, সর্দারের ওপর, রাগ ক'রে এমন একা একা বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা তার উচিত হয়নি।

বারুর মা টুম্‌নিকে কোল থেকে নামিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়লো। আর যেন সে হাঁটতে পারছে না, হাঁপিয়ে উঠেছে।

গাংটু কাছে এসে বললে, 'আমাকে না জানিয়ে একা একা পালিয়ে এলি, মরত্তিস্ যে এখুনি! খ্যাপা শেয়ালে কামড়ে দিলে কি হয় জানিস তো?'

এই বলে সে নিজেও তাদের পাশে গিয়ে বসলো।—'বাবাঃ, আর পারি না হাঁটতে। সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই এতক্ষণ পরে—'

বারুর মা বললে, 'আমি হাঁটছি রাত থেকে।'

গাংটু জিজ্ঞাসা করলে, 'কিছু খেয়েছিস্ তোরা? টুমনি খেয়েছে?'

বারুর মা বললে, 'খাবার যা সঙ্গে এনেছিলাম তাই খেয়েছি এবং কিছু নেই, ফুরিয়ে গেছে। তুমি খেয়েচ তো?'

গাংটু বললে, 'হাঁ খেয়েছি। নে ওঠ, রাত হ'য়ে গেলে এ জঙ্গলের মাঝখানে কোথায় থাকবি, তার চেয়ে চল্ আর একটু এগিয়ে গেলে সাঁওতালদের একটা বস্তি পাওয়া যাবে, সেইখানেই রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে আবার বেরুনো যাবে চল্।'

দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো।

তারপর চল্‌তে চল্‌তে বারুর মা বলতে লাগলো, 'আমি একা একা কেন চলে এলাম বুঝতে পেরেছ তো? তোমার আসবার ইচ্ছে ছিল না তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

গাংটু চুপ ক'রে রইলো। কারণ বাড়ী ছেড়ে এমন ক'রে অনর্থক ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে তার সত্যিই ছিল না।

কিন্তু মায়ের মন—বার বার শুধু সে বারুর কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাংটুকে বলতে বলতে চললো!—'বারুকে আমার খুঁজে বের ক'রে দেওয়া চাই সর্দার, বুঝলে?'

সর্দার বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো তুই চল্।'

বারুর মা খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'বারু বেশি দূর যায়নি, কি বল?'

গাংটু বললে, 'তা আমি কেমন ক'রে বলব বারুর মা? তাকে বলেছি—তুই চলে যা, যেখানে হোক বেঁচে থাক্। তারপর কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে চলে গেছে কিছুই তো জানি না!'

তবু তাদের সন্ধান চলতে লাগলো।

পায়ে হেঁটে চলতে চলতে যেখানেই গ্রাম পায় সেইখানেই থামে। যাকে সুমুখে পায় বারুর কথা তাকেই জিজ্ঞাসা করে। চেয়ে-চিন্তে যেখানে যা পায় তাই খায়। কখনও বা নিজেরা না খেয়ে ছোট মেয়ে টুম্‌নিকে কিছু খাইয়ে নিয়ে পথ চলতে থাকে।

এমনি ক'রে চলতে চলতে তারা অনেকদূর চলে গেল। অথচ বারুর সন্ধান কোথাও পেলে না।

সাঁওতাল পরগণা ছাড়িয়ে তারা এসে পড়লো বীরভূমের মাটিতে। বারুর মার অবস্থা হয়েছে তখন ঠিক পাগলিনীর মত। গাংটু বললে, 'এমন ক'রে আর কতদিন আমরা চলবো বারুর মা? আর যে পারছি না।'

বারুর মার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।—হাঁ ক'রে গাংটুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

সাঁওতাল পরগণার প্রান্তসীমায় শাল মহুয়ার জঙ্গলের ধারে ছোট্ট একটি নদী বয়ে গেছে। সেই নদীর পারে কয়েক ঘর সাঁওতালদের বাস। গাংটু বললে, 'আর না। আমরা এইখানেই থাকবো। জায়গাটি ভালো।'

সাঁওতালেরা বললে, 'থাকো।'

গাংটু নিজেই মাটির দেওয়াল তুলে জঙ্গল থেকে কাঠ পাতা এনে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করলে। তারপর সেইখানেই তারা থেকে গেল।

এখানে অবশ্য প্রথম প্রথম তাদের রীতিমত কষ্ট হ'তে লাগলো; কিন্তু কি আর ক'রবে, যেখান থেকে চোরের মত লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে সেখানে আর ফিরে যেতে পারে না, কাজেই সব কষ্ট সহ্য ক'রে এখানে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

গাংটুর গায়ে ছিল শক্তি, বারুর মাও অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েনি। দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে বিঘে দুই জমি তারা তৈরি করলে। সেই জমির ফসল বিক্রি ক'রে কিনলে ছাগল। একটি ছাগল দুটি হ'লো, দুটি ছাগল চারটি হ'লো, দেখতে দেখতে ছাগলের পাল গেল বেড়ে। বাড়ীতে কুকুর, মুরগী, ছাগল, গাই, ক্ষেতে ফসল। টুমুনি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। গাংটুর অভাব কিছুই রইলো না। ভেবেছিল, এমনি ক'রে একদিন ছেলের দুঃখু তারা ভুলে যাবে। কিন্তু বারুর মার মুখের পানে তাকালেই গাংটুর মনে পড়ে বারুকে। মনে হয়,

পালিয়েই যখন এলো তখন ছেলেটাকে এমন ক'রে বিসর্জন না দিলেই সে পার্তো।

টুম্নি আজকাল রীতিমত বড় হয়েছে। এখন আর দেখলে তাকে চেনবার উপায় নেই। যেমন জোয়ান তেমনি তার স্বাস্থ্য।

গাংটু মাঝে মাঝে টুমনির মুখের পানে তাকায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর বলে, 'আজ যদি বারু থাকতো তো টুমনির চেয়েও জোয়ান হ'তো।'

চাষের কাজে, ক্ষেত-খামারের কাজে টুমনিই বাবাকে সাহায্য করে। লোকে দেখে, আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

দুষ্টু লোকে হাসে। তাই ব'লে ভাল লোক যারা—তারা হাসে না।

টুমনি কিন্তু লোকের হাসিকে গ্রাহ্যই করে না। ধান কাটার সময় নিজেই সে ধান কাটে, গরুর গাড়ি ক'রে ধানের বোঝা বাড়ী নিয়ে আসে, ধান ঝাড়ে। দরকার হ'লে রান্নাও করে, আবার মাটিও কাটে।

লোকে নাকি বলাবলি করে গায়ে তার অসীম শক্তি। তাই ব'লে টুমনিকে দেখলে যে মস্ত পালোয়ান বলে মনে হয়—তা হয় না। মনে হয়, চমৎকার মেয়েটি।

বাপ তাকে পুরুষের কাজ ক'রতে বারণ করে, কিন্তু সে শোনে না। বুড়ো বাপকে বাড়ীতে বসিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় কাজ ক'রতে।

সে বছর মাঠে তখন ধান পেকেছে। কেউ-বা কেটেছে, কেউ-বা তখনও কাটেনি। এমন দিনে টুম্নির মার হ'লো ভয়ানক অসুখ। গাংটু তার শিয়রের কাছে বসে রইলো। টুম্নি ঘরের কাজকর্ম ক'রতে লাগলো।

সাঁওতালদের অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয় না। হয় যখন, তখন আর বাঁচে না—এই তাদের ধারণা। তাই টুম্নির মাও বলতে লাগলো, 'আমি আর বাঁচব না।'

গাংটু বললে, 'চুপ কর্।'

কিন্তু চুপ সে কিছুতেই করে না। বলে, 'বান্ধকে আমার আনতে পারলি না তো সর্দার? একবার দেখাতে পারলি না?'

বলে আর চোখ দিয়ে তার দর দর ক'রে জল গড়িয়ে আসে।

টুম্‌নি তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'মা, তুমি কেঁদোনা মা।'

কিন্তু মার কান্না সহজে কিছুতেই থামতে চায় না। টুম্‌নিও চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এ দৃশ্য সে দেখবেই বা কেমন ক'রে, আর মাকে তার সান্ত্বনাই বা দেবে কি ব'লে?

টুম্‌নি রোজ একবার ক'রে তাদের ধানের মাঠগুলো দেখতে যেতো। দেখতে যেতো ধানগুলো পেকেছে কি না। পাকলেই কাটতে হবে।

সে দিন কিন্তু দেখতে গিয়ে টুম্‌নি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা মাঠের কোণের দিকে কতকগুলো ধানের গাছ গেছে মাটিতে পড়ে। মনে হ'লো বন-শূয়োরে দিয়েছে সেগুলো মাড়িয়ে নষ্ট ক'রে।

সারা বছরের খোরাক তাদের এই ধানগুলি। বন-শূয়োরে এমন ক'রে যদি নষ্ট ক'রে দেয় তাহ'লে তারা খাবে কি? টুম্‌নি প্রতিজ্ঞা করলে বন-শূয়োর-গুলোকে সে মেরে ফেলবে।

রাত্রি তখন অনেক। টুম্‌নির হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। জ্বরের ঘোরে মা তার অচেতন হ'য়ে পড়ে আছে। বাবা তার শিয়রের কাছটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছো। শূয়োরগুলো ঠিক এই সময়েই ধান নষ্ট ক'রতে আসে। মারতে না পারে—এই সময় তাদের একেবার তাড়িয়েও দিয়ে আসা উচিত।

টুম্‌নি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তার বাপের ধনুকটা হাতে নিলে, তীরগুলো নিলে, তারপর শূয়োর মারবার জন্যে পা টিপে টিপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আকাশে চাঁদ তখন সবেমাত্র ডুবতে আরম্ভ করেছে। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সুমুখের মাঠ, গাছ, নদী, পাহাড়,—সব যেন কেমন এক অদ্ভুত রকমের দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, চারিদিক যেন কুয়াশায় ঢাকা।

টুম্‌নি দূর থেকে শুনতে পেলে একটা ধানের মাঠে খস্ খস্ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, দেখতে পেলে ধানের গাছগুলো নড়ছে। টুম্‌নি তার তীর-ধনু ঠিক ক'রে ধ'রে হেই-হেই ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো। ভাবলে, মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে শূয়োরগুলো যেই বেরোবে, অমনি সে তীর ছুঁড়বে।

টুম্‌নি তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সর্বনাশ! একি! তার গলার আওয়াজ পেয়ে শূয়োরের বদলে ধানের মাঠের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলো কালো কালো কয়েকজন মানুষ!

তবে কি এরা ধান চুরি ক'রতে এসেছে?

টুম্‌নি জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

এদের তো আর তীর মারতে পারে না! টুম্‌নি হতভম্ব হ'য়ে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় কয়েকজন সাঁওতাল পিছন দিক থেকে অতর্কিতে এসে তাকে জাপ্‌টে ধরলে। হাতের তীর-ধনুক একজন তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। টুম্‌নি চীৎকার ক'রতে যাচ্ছিল, একজন কাপড় দিয়ে তার মুখ দিলে চেপে।

দু'একজন লোক যদি হ'তো, টুম্‌নির জোরে তারা কিছুতেই পেরে উঠতো না। কিন্তু সাঁওতালেরা ছিল দলে ভারি। তার ওপর অতর্কিতে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করেছে। টুম্‌নি অনেক চেষ্টা করলে তাদের কবল হ'তে মুক্তি পাবার। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলো না। না পারলে পালিয়ে যেতে, না পারলে চীৎকার ক'রতে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, টুম্‌নিকে তারা ধরাধরি ক'রে পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অন্য একটা গ্রামে নিয়ে গেল।

গ্রাম মানে—সাঁওতালদের বস্তি। ছোট একটা পাহাড়ের ধারে ঘর-পঁচিশেক্ সাঁওতালের বাড়ী। চারিদিক তখন ফর্সা হ'য়ে আসছে। সকাল হ'তে আর দেরি নেই।

টুমনিকে তারা একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় নিয়ে গিয়ে ফেললে। লোকজন আগ্‌লে রইলো যাতে সে না পালায়, আর একটা লোক গেল তাদের সর্দারকে ডাকতে।

যে লোকটা চলে গেল তার মুখের পানে তাকাতেই টুমনি চিনতে পারলে—লোকটা তার বাবার পরম শত্রু। টুমনিদের জমির কাছেই ছিল তার জমি, এই নিয়ে তার বাবার সঙ্গে এই লোকটার একদিন হাতাহাতি মারামারি হ'য়ে গেছে।

টুমনি এতক্ষণে বুঝতে পারলে কেন সে তাকে এমন ক'রে ধ'রে এনেছে। চুরি ক'রে পাকা ধান সে-ই কাটছিল, টুমনি তাকে দেখতে পেয়েছে, চিনতে পারলে তার আর লাঞ্ছনার কিছু বাকি থাকবে না, তাই তাকে একলা পেয়ে এই কাণ্ডটি ক'রে বসেছে। টুমনি ভাবতে লাগলো—এখন সে কি ক'রবে, কেমন ক'রেই বা বাড়ী ফিরে যাবে! বাড়ীতে তার মা পড়ে আছে মৃত্যুশয্যায়, বুড়ো বাবা হয়ত এতক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি করছে।

এদিকে দেখতে দেখতে বটগাছের তলাটা লোকজনে ভরে গেল। ছোট্ট গ্রাম, কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়তে দেরি হ'লো না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটে ছুটে মজা দেখতে এলো। দু'একজন মেয়ে ভিড় ঠেলে টুমনির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেছিলি?'

টুমনি তখন রাগে মনে মনে ফুলছে! পায় যদি ওই লোকটাকে হাতের কাছে, তাকে খুন ক'রে ফেলবে। মুখ দিয়ে একটি কথাও সে বললে না।

একটি মেয়ে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলে। টুমনি তবু চুপ ক'রেই রইলো।

মেয়েটি আর একজনের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'বোবা নাকি?'

টুমনি এতক্ষণে কথা কইলে। তেমনি গম্ভীর হ'য়েই মেয়েটিকে মুখ ভেংচে বলে উঠলো—'হ্যাঁ, বোবা!'

লোকগুলো হো-হো ক'রে হাসতে লাগলো।

হাসি কিন্তু তাদের হঠাৎ থেমে গেল। সুমুখে তাকিয়ে দেখলে—সর্দার আসছে।

সর্দার আসতেই সব হাসি থামিয়ে এদিক ওদিক সরে দাঁড়ালো। চক্রব্যূহের মধ্যে তারা সর্দারের আসবার পথ ক'রে দিলে। সর্দারের সঙ্গে এলো ডোমন্—টুমনির বাবার শত্রু—টুমনিকে যে ধরে এনেছে।

সর্দার টুমনির কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'এই! কি করেছিস তুই?'

টুমনি বললে, 'কিছু করিনি।'

ডোমন্ তখন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'এই মেয়েটা পাহাড়তলির বস্তিতে থাকে। রোজ রাত্রে পাকা ধান চুরি ক'রে নিয়ে যায়। আজ চুরি ক'রতে এসে ধরা পড়েছে। আমি গিয়েছিলাম মাঠ দেখতে। ওকে ধরে এনেছি।'

সর্দার টুমনির মুখের পানে তাকালে।

টুমনি বললে, 'মিছে কথা।'

ডোমন্ বললে, 'সাঁওতাল কখনও মিছে কথা বলে না।'

টুমনি বললে, 'এ্যাঁ, কি আমার সাঁওতাল রে! তোরাই তো ধান চুরি করছিলি।'

ডোমন্ চীৎকার ক'রে উঠলো; 'না, আমরা ধান চুরি করিনি। ধান চুরি করছিলি তুই।'

টুমনিও সমান্ জোরে চীৎকার ক'রে উঠলো। বললে, 'খবরদার বলছি মিছে কথা বলিসনি।'

সর্দার বললে, 'এত রাত্রে তাহ'লে তুই কি জন্যে গিয়েছিলি মাঠে?'

টুমনি বললে, 'বন-শুয়োরে ধান নষ্ট ক'রে দেয়, তাই গিয়েছিলাম শুয়োর মারতে।'

সর্দার একটুখানি অবাক্ হ'য়ে গেল।

হাস্‌তে হাস্‌তে টুমনির দিকে তাকিয়ে তার মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে, 'তুই ? তুই মেয়েমানুষ, তুই গিয়েছিলি বন-শূয়োর মারতে ?'

সর্দার-হো হো ক'রে হেসে উঠলো। ব্যাপারটা যেন নিতান্ত হাসির ব্যাপার।

সর্দারের হাসি দেখে উপস্থিত যারা ছিল সবাই হাসতে লাগলো। চারিদিকে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

টুমনি যেদিকে তাকায়, দেখে তার মুখের পানে তাকিয়ে সবাই হাসছে। রাগে টুমনির সর্বাঙ্গ রী-রী ক'রে উঠলো। দেখলে, সর্দারের হাসি তখনও থামেনি। সর্দার ছিল তার হাতের কাছেই। টুমনি আর নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লাতে পারলে না। ঠাস্ ক'রে সর্দারের গালে মারলে এক চড় !

সর্দারের গালে চড় মারা বড় সহজ কথা নয়। সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। হাসি গেল বন্ধ হ'য়ে।

মেয়েটার সাহস তো খুব !

সর্দার তখন রাগে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। এর চেয়ে বড় অপমান সর্দারের আর কি হ'তে পারে ?

সর্দার হুকুম দিলে, 'বাঁধ্ ওকে। বেঁধে নিয়ে চল্ বনের ধারে। বিক-কাঁড় দিয়ে আমি ওকে আজ মেরেই ফেল্‌বো।'

ডোমন্ প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। লোকজন সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে গেল টুমনির দিকে।

টুমনি বললে, 'আমার বাবাকে খবর দে। মরবার আগে একবার আমার বাবাকে—'

আর কিছু সে বলতে পারলে না।

ডোমন্ জোর ক'রে তখন তার হাত দুটো বেঁধে ফেলেছে। বললে, 'হুঁ, তোর বাপ্‌কে খবর দিই, আর সে গিয়ে থানাতে জানিয়ে আসুক।'

সর্দার জিজ্ঞাসা করলে, 'কে—কে তোর বাবা ?'

টুমনি বললে, 'গাংটু মাঝি।'

সর্দার আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন্ গাঁয়ে তোদের ঘর ?'

টুমনি বললে, 'ঘর আমাদের এখানে নয়—বহুৎ দূর। আমার এক ভাইকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা ওই পাহাড়তলিতে এসে বাস করেছি।'

সর্দারের মুখখানা কেমন যেন অন্য রকম হ'য়ে গেল। বললে, 'তোর নাম কি ?'

টুমনি বললে, 'আমার নাম টুমনি।'

সর্দার ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে টুমনির দিকে এগিয়ে গেল। ডোমন্‌কে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে টুমনির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, 'আয় আমার সঙ্গে।'

টুমনি তার পিছু পিছু চলতে লাগলো।

অনেক লোক হৈ-হৈ ক'রে তাদের পিছু নিলে।

সর্দার বললে, 'না, কাউকে আসতে হবে না।'

সর্দার চললো আগে আগে, আর টুমনি চললো তার পিছু পিছু।

গাঁ থেকে তারা বেরিয়ে সোজা চলে গেল।

কোথায় নিয়ে যাবে টুমনিকে ? টুমনি কিছুই বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞাসা ক'রতেও ভরসা হয় না।

যে রাস্তায় টুমনি এসেছিল, আবার সেই রাস্তা দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাহাড়তলিতে ঢুকে একটা তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সর্দার জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন্‌টা তোদের ঘর ?'

টুমনি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে। বললে, 'এইটে।'

টুমনিকে সঙ্গে নিয়ে সর্দার গিয়ে ঢুকলো তাদের ঘরে।

ঘরের চালায় গাংটু মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে।

টুমনি ডাকলে, 'বাবা!'

গাংটু মুখ তুলে তাকালে। বললে, 'কোথায় ছিলি মা এতক্ষণ ?—ও কে ?'

টুমনি বললে, 'সর্দার।'

সর্দার গাংটুর কাছে গিয়ে বললে, 'না বাবা আমি সর্দার নই, আমি তোমার বারু—আমাকে চিনতে পারছ না ?'

গাংটু চীৎকার ক'রে উঠলো, 'বারু !'

বলতেই দেখা গেল তার চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল গড়াচ্ছে। বললে, 'আর একটু আগে আসতে পারলি না বাবা ?'

বলেই সে আঙুল বাড়িয়ে ঘরের ভেতর কি যেন দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'তোর মা তোকে দেখবার জন্যে—'

কথাটা তার গলায় আট্‌কে গেল।

'মা ! মা !' ব'লে কাঁদতে কাঁদতে বারু ও টুমনি দু'জনেই ঘরে ঢুকে দেখলে, 'তাদের মা'র মৃতদেহ মেঝের ওপর পড়ে আছে। চোখ দুটি নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে—কাকে যেন সে দেখতে চায় !'

নাস্তিক

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

—তারপর বিনোদ, খবর কি? এতদিন পর মনে পড়ল আমায়? কোথায় ছিলে এতদিন? তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি। তোমার সেই রোগাপট্কা চেহারা, ম্লান মুখ, ড্যাব্ড্যাবে কালো চোখ দু'টি যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে মরছে, যেন সব জিনিসেরই ভিতরকার কথা টেনে নিতে চায়। তোমায় পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি কিন্তু।...কিন্তু সে যাক, বুড়ো ঠাকুরমা'র মত কি সব আবোলতাবোল বক্ছি! আমায় এখানে এ অবস্থায় দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ নিশ্চয়! ভাবছ আমি অনেকটা বুড়িয়ে গেছি, কেমন নয়?—তা বয়েসও ত নেহাৎ কম হল না। এই যে হাত দু'খানা দেখছ, এতে ডাক্তারের ছুরির বদলে চাষীর কাস্তেই মানায় ভাল। তোমার হাত দু'খানা কিন্তু বেশ নরমই রয়ে গেছে—তোমার যৌবনশ্রীর এতটুকুও কম্তি হয়নি।

আমার কথাবার্ত্তা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছ। হাঁ, আমিই তোমার সেই ছেলেবেলাকার সাথী, যৌবনের সহপাঠী, আজ আমি প্রৌঢ়, চোখ দু'টো আমার কোটরে ঢুকেছে, কপালে সুস্পষ্ট বলি-রেখা পড়ে গেছে! মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা? বেরালের লেজে বিস্কুটের টিন বেঁধে তাকে একদিন ছাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল'ম, সারাটা রাত্তির বেরালটার সে কি তাণ্ডব নৃত্য! পাশের বাড়ীর সকলেই ভূতের উপদ্রব মনে ক'রে কি সাংঘাতিক ভয়ই না পেয়েছিল!

তোমার প্রাণখোলা সরল হাসিটি আজও মনে পড়ে অথচ কতদিন হয়ে গেছে!

মনে পড়ে স্কুলে সেই পিছনের বেঞ্চিতে বসে লেবেঞ্চুস খাওয়া। অঙ্কের ঘণ্টায় নিশিবাবুর সেই অতি-শাসন?—সামান্য ত্রুটি এড়িয়ে চলবার যো নেই, তাঁর উদ্যত বেত্রখণ্ডের সঙ্গে আমাদের সেই প্রতিদিনকার চির-মিলন। মনে পড়ে, একদিন তোমার 'হোম টাস্ক' আমি হরিপদর খাতা দেখে টুকে দিয়ে কি লাঞ্ছনাটাই না ভোগ করেছিলাম!

তারপর, সেবার বার্ষিক পরীক্ষার পর তোমাতে আমাতে একদিন দুপুরে আমাদের বকুল গাছটার তলায় শান বাঁধানো আসনে বসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' কাব্যরসে মশ্‌গুল ছিলাম। তোমার স্বাভাবিক মৃদুমধুর সুকণ্ঠে সেই আবৃত্তি, তোমার সে আত্মহারা-দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারিনি। তুমি হেসে আমায় বলেছিলে, জানিস্ এ দৃষ্টি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণ-সখার কাছ থেকে পেয়েছি। খুব সম্ভব সেদিন পাঠ শেষে তুমি কবিগুরুর উদ্দেশে তাঁর পায়ে শত শত প্রণাম নিবেদন করেছিলে। মনে পড়ে সব?

তোমায় বিরক্ত করছি না ত? দীর্ঘকাল পরে তোমায় পেয়ে আমার কত কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন প্রাণ খুলে কথা কইতে পারিনি। এখানকার এ একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। সারাটা দিন সেই রোগী দেখা, তাদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা—নীতি কথার মতই তেতো মনে হয়। রাস্তায় লোক চলাচল বেশী নেই—মাঝে মাঝে দূরাগত দু'চার জন পথিক তাদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে কোন্ সুদূরে মিলিয়ে যায়—কে জানে!

ওই দেখ, অদূরে পাহাড়টা কেমন ঝুঁকে পড়েছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তে ও যেন আমাদের উপর ধসে পড়বে—তাই দিন-রাত্তির শাসাচ্ছে, যেন আমাদের গুঁড়িয়ে মারাই তার মতলব। হাসপাতালে রোগীর ভিড় তেমন নেই, যে কয়জন আছে, তাদের যে বিচিত্র অভিযোগের অদ্ভুত বিবরণ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়—তাদের মেজাজই যেন পাওয়া ভার! তাদের চিকিৎসা করবার সুযোগ দিয়ে যেন তারা আমায় কৃতার্থ করেচে। পান থেকে চুণ

খসলেই অনর্থ, শাপ-মন্নিরও সীমা নেই। তারা যেন সব আমার মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী এসেছে।

রবিবারে হাসপাতালে কাজের ভীড় একটু কম থাকে। তাই সেদিন আমার শান্তির যেখানে শেষ বিছানা বিছিয়ে দিয়েছি, সেই পাহাড়ের গায়ের সেইখানটায় গিয়ে একটু বসি। শান্তি কে? জিজ্ঞাসা করছ? শান্তি আমার একমাত্র কন্যা। চার বছর হ'ল এক মেঘে-ভরা বৃষ্টি-ঝরা অপরাহ্ণে তাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

কিছুদিন থেকেই তার ক্ষয়রোগ হয়েছিল। নিজে চিকিৎসক—চিকিৎসার যে তেমন কোনো ত্রুটি হয়েছে তা বলতে পারিনে, তবে সেবা শুশ্রূষার যে প্রতিপদে ত্রুটি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একা মানুষ, সব সময় নিয়মিত ওষুধ-পথ্য দিতে পারতাম না। ঘরে স্ত্রী আছেন বটে, কিন্তু তিনি সপত্নী-কন্যার সেবা করতে গিয়ে দুরারোগ্য-ব্যাধি অর্জ্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষত রোগীর সেবা করা তাঁকে মোটেই পোষাত না।

সেদিন সকাল থেকেই থেকে থেকে জল ঝরছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল, এক একবার এক একটা বজ্র কড় কড় শব্দে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল। শান্তি সজল চক্ষে গলা জড়িয়ে আমায় আঁকড়ে ধরল। আমি নীরবে অশ্রুশূন্য চোখে তার সামনে বসে ছিলাম। আমি তখন কোনো একটা বিশেষ কিছু ভাবছিলাম না—মনটা নিহাতই যেন ফাঁকা। ক্রমে চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এল, কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝটকা বন্ধ জানালার শার্সিতে এসে পড়ে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। সেদিন স্ত্রী তাঁর মাসতুত ভায়ের মেয়ের পুতুলের বিয়েতে যোগদান করবার জন্যে তার দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। একটু পরেই জল থেমে গেল, আমার একটু অমনোযোগিতার ফাঁকে শান্তি যে কখন আমায় অশান্তির পাথারে ফেলে রেখে চলে গেল, তা জানতেও পারলাম না। তখনও সে কিন্তু আমায় জড়িয়ে ধরেই ছিল, চোখের শেষ অশ্রুবিন্দু তখনও তার গাল থেকে নিঃশেষে শুখিয়ে যায়নি।

তাকে ওখানে ঐ শিউলি ফুলগাছটার তলায় পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছি। তারপর ঐ যে দেখছ সমাধি-ফলকখানা, ও তারই স্মৃতির জন্য বানিয়েছি! প্রতি রবিবার সকালে ঐ শিলাখণ্ডের সামনে বসে অনেকটা সময় কাটাই, নিজের মনে ফুল দিয়ে প্রস্তর-ফলকখানাকে সাজাই। আমার বিশ্বাস—বিশ্বাস কেন, আমি ঠিক অনুভব করি যে, শান্তি অদৃশ্যলোক থেকে সেই সময় আমার পাশে এসে উপস্থিত হয়! সে যেন আস্তে আস্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'বাবা, কেঁদ না, আমি ভাল আছি, আর কোনো অসুখ আমার নেই।'

অদূরে খ্রীষ্টানদের কবরখানায় একটী আধা-বয়সী স্ত্রীলোক কালো পোষাক পরে প্রতি রবিবারেই প্রাতে এসে উপস্থিত হয়। কবরের উপরকার প্রস্তর-ফলক সাদা ফুল দিয়ে সাজায়, বাইবেল পড়ে—পরে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। একদিন মহিলাটির সঙ্গে যেঁচে আলাপ ক'রে জানলাম, ওখানে তার একমাত্র সন্তানকে গোর দেওয়া হয়েছে।

শান্তির সমাধি-ফলকে বসে এক একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। তখন এত বড় বিশ্বের আর কারুর কথাই মনে আসে না,—একমাত্র তোমার কথা সময় সময় মনে পড়ে! এখনও প্রতিষ্টা ও ধন-সম্পদ কামনা করি—কেন-না দরিদ্র বলেই না শান্তি আমায় এত সহজে ছেড়ে যেতে পারল। আমি ত বেশ জানি যে চিকিৎসার কোনো ভাল ব্যবস্থাই করতে পারিনি।

শান্তির সমাধিস্থান ছেড়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই নিজের মনে একটা পরম সান্তনা পাই। মনে হয়, তাকে আমি আমার জগতে হারিয়েছি বটে, কিন্তু বৃহত্তর জগতে বিরাটরূপে তাকে লাভ করেছি। শান্তি আমার ছিল, শান্তি আমার আছে।

দেখেছ আমার কাণ্ড-জ্ঞান! তুমি পথশ্রমে না জানি কত ক্লান্ত হয়েই এসেছ। অথচ সেদিকে আমার খেয়ালই নেই, নিজের দুঃখের কথাই বলে যাচ্ছি। মাফ্ করো ভাই। চল ঘরে গিয়ে বসি। বসবে না?—বেশ, এখানে তা'হলে এই ঘাসের উপরেই বসি।

তারপর কি বলছিলাম, হ্যাঁ। যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি—নিজেকে বেশ ভুলে থাকি, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলেই নিজের ব্যর্থ জীবনের সে মর্ম্মন্তুদ করুণতা আমায় আত্মহারা ক'রে তোলে। এতদিন পরে তোমায় পেয়েছি, জীবনের সব কথা বলে দুঃখের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব ক'রে নিই। তোমায় বলতে কি ভাই, স্ত্রীকে আমি সইতে পারিনে, অথচ ছাড়বারও যো নেই।

না, দোহাই তোমার হেস না শুনে। আমার ন্যায় দুর্ভাগার এই করুণ কাহিনী শুনে যার প্রাণে হাসি আসে তার মত পাপিষ্ঠ আর নেই। এ যে আমার কি পরম ব্যথ্যা তা বলতে পারিনে, যাকে নিজের গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকেও আপনার ক'রে পেলাম না।

ভয়ের আমার সীমা নেই। পাছে আমার কোনো আচরণে সে মর্ম্মাহত হয়, পাছে সে মনে করে, তাকে আমি প্রতারিত করেছি, সেই ভয়েই সর্ব্বদা তটস্থ থাকি। বিলাসের উপকরণেরও কিছু মাত্র অভাব নেই তার, আব্দারও তার অফুরন্ত। এটা চাই, ওটা চাই—প্রতিদিনই দাবীর মাত্রা অব্যাহত বেড়ে চলে। গহনা, গ্রামোফোন, শাড়ী, জামা, সাবান, এসেন্স,—নিত্য নতুন সব তার চাই। আব্দার পূরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই, এ যেন তার পাওনা। অর্থাভাবে তার দাবী পূরণে এতটুকু ত্রুটি হ'লে অনর্থপাত অপরিহার্য্য। আমি বাঁচি কি মরি, আমার কাজ হোক কি না হোক, তা দেখবার তার প্রয়োজন নেই, তার দাবী পূর্ণ হলেই হ'ল।

যাকগে এ সব কথা। কই তোমার শরীরটাও ত তেমন ভাল দেখছিনে। তবে কি জগতে আমার মত সকলকারই দুঃখ কষ্ট আছে।

হাঁ, কি বলছিলে?—শশাঙ্ক কোথায় আছে?—সে যেখানে আছে, সেখানকার খবর কেউ জানতে পারেনি। তুমি জান তার সেই নির্ব্বোধের মত চেহারাটা দেখলেই ছেলেবেলায় আমার হাসি পেত। তার বুদ্ধি কম ছিল বটে, কিন্তু তার প্রাণ ছিল। যৌবনের সুরুতেই সংসারের জন্যে কি অসাধারণ খাটুনিই না সে খাটতো। তার সেই রোগা, ঢ্যাঙ্গা চেহারা, কাঠির

মত হাত-পাগুলি, কোটরাগত চোখদু'টি, মুখখানা সর্ব্বক্ষণ বিষাদাচ্ছন্ন—এখনও যেন চোখের উপরে ভাসে।

আমি তখন সবে এখানে ডাক্তার হয়ে এসেছি। একদিন তার বৃদ্ধ বাপ্ কেঁদে এসে আমায় বললেন, বাবা, আমার শশাঙ্ককে একবার দেখবে এস, তাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না!

শশাঙ্কের বাবার কথা তোমার অবশ্যই মনে আছে। সেই সহৃদয় অতি দরিদ্র বৃদ্ধ এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অথচ তিনি যে কোনোদিন লেখাপড়া কিছু শিখেছিলেন তা কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে কখনই মনে হত না।

আমি গিয়ে দেখি শশাঙ্ক একেই ত রোগা মানুষ, তার উপর রোগে ভুগে ভুগে তার দেহে মাংসের কণামাত্রও ছিল না। একখানা ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষে মলিন শয্যায় শুয়ে ধুঁকছে। বুড়ি পিসিমা তার একপাশে বসে মালা জপ করছেন, যেন ভগবানের নিকট একাগ্রতার সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের আয়ু ভিক্ষা করছেন। দর্মার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কিরণ-সম্পাতে রোগীর মুখখানাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয় যে, মা তার পুত্র-জীবনেই মারা যান। ছোট ভাইটি দাদার অসুখ কিসে সারবে তারই ভাবনায় ব্যাকুল। অথচ ছেলে মানুষ সে, জানে না যে, তার দাদার জীবন-প্রদীপের তৈল প্রায় নিঃশেষ হয়েই এসেছে।

শশাঙ্ককে মনোযোগ দিয়েই পরীক্ষা করলাম। কিন্তু বুঝলাম, আর বেশী দেরী নেই। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে অমানুষী পরিশ্রমে অচিকিৎসায় তার জীবনের মূলে মরণের টানটা খুব স্পষ্ট হয়েই আমার চোখে ধরা পড়ল। আমায় দেখেই সে তার রোগ-জীর্ণ বিশীর্ণ হাত দু'খানি প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়িয়ে দিল, কিন্তু দুর্ব্বল দেহ তার ভারটুকুও বইতে পারল না। জড়িত-স্বরে কি বললে, তার সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না, তবে তার অস্পষ্ট কথার মধ্য থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, মৃত্যুকালে আমায় দেখতে

পেয়ে সে ভারি খুশী হয়েছে। তোমায় শেষ দেখা দেখতে পেলে আরও খুশী হত। কিন্তু তুমি তখন কোথায়।

আগেই বলেছি, শশাঙ্কের বুড়ি পিসিমা একধারে বসে বুঝি এক মনে ভগবানকেই ডাকছিলেন। তাঁর সেই আকুল প্রার্থনার সব কথা আমাদের কানে পৌঁছায়নি। শশাঙ্কের প্রাণে যেন কোনো দুঃখই নেই, কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই—তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হ'ল।

আমার মুখ চোখে কি তখন অবিশ্বাসীর হাসি ফুটে উঠেছিল? কেন-না সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ভীত কম্পিত হাতখানা আস্তে আস্তে আমার হাতে তুলে দিয়ে বিজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই, সত্যি ভগবান আছেন?

আমি কি জবাব দিব? ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার কোনোদিনই আস্থা ছিল না। ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু ভাবাও কোনোদিন প্রয়োজন বলে মনে করিনি। কিন্তু তাই বলেই কি এখন আমি বলতে পারি যে, সত্যিই তিনি নেই? কিন্তু তবু আমার বার বার এই কথাই মনে হ'ল যে, হয় ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেহাতই অলীক, নেহাতই মানুষের মনগড়া, দুর্ব্বল মানব জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে নিজেকে স্তোক দেবার জন্যে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে মাথা ঘামায়।....

আমার মতামতের যে তার কাছে তখন কি মূল্য তা আমার বেশ জানা ছিল। হয় ত সে মনে করেছিল যে, আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, অনেক ভেবেছি, অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, আমি সম্ভবত তার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারব, এই ভরসাতেই সে আমায় এ প্রশ্ন করল। কিন্তু আমি কোনো রকম জবাবই দিলাম না; কেন-না জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরল না, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে আমায় বাধা দিল।

আমায় নীরব থাকতে দেখে পিসিমার মুখে চোখে একটা তীব্র ঘৃণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল; সে দৃষ্টি যেন আমায় বলছিল, দস্যু, আমার এই মরণ-পথযাত্রী পুত্রের শেষ বিশ্বাসটুকুও নষ্ট করলে!

শশাঙ্ক ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল, তার সেই আয়ত দৃষ্টির

মধ্যে একটা আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এল। আমার জবাবের উপরই তার সব নির্ভর করছিল। যেই আমি জবাব দিতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার হাতে মৃত্যুর কম্পন যেন অনুভব করলাম। আর কিছু বলা হল না, সঙ্গে সঙ্গেই তার হিমশীতল হাতখানা অসাড় হয়ে তক্তপোষের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ল। পিসিমা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। শশাঙ্কের বৃদ্ধ পিতা অপলক দৃষ্টিতে শশাঙ্কের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন। ছোট ভাইটি তখনও জোড় হাতে শূন্যে তাকিয়ে বসে ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে দরজার সুমুখে গেলাম। তারপর কেমন ক'রে যে সে বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম, আজ আর সে কথা মনে নেই। বাইরে তখন ভারি গরম, রৌদ্র খাঁ খাঁ করছিল। তারিণী মুদির দোকানে তাদের যে বুড়ো সরকার তখন সবে কাশীদাসের মহাভারতখানা খুলে বসেছিল। কোনো রকমে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুলাম। সারাক্ষণ আর ঘরের বার হইনি, দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম। এক এক সময় মনে হচ্ছিল, শশাঙ্কের বুড়ি পিসিমা যেন বন্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে বার বার উঁকি মারছেন। তাঁর সে অগ্নি দৃষ্টি আমায় বার বার পুড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর থেকে যতদিন তাঁরা এখানে ছিলেন আর কোনো দিন তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।

কিন্তু এ সব করুণ কাহিনী ব'লে তোমায় দুঃখ দিচ্ছি মাত্র। আর এ সব নয়। দু' একটা মজার কথা বলি। বলব না?—বেশ, যা বল। সত্যি কথা বলতে কি, দুঃখের কাহিনী ছাড়া বলবার মত আমার জীবনে কিই বা আছে। জীবনটাই আমার একটা বিরাট দুঃখের মহাভারত।

ওই শোন গ্রামোফোন চলছে। কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই, বেশ আছেন। গ্রামোফোন আমি কিন্তু দু' চক্ষেও দেখতে পারিনে। গ্রামোফোনের স্বর আমায় জাগ্রত রাখে, উত্যক্ত করে; কিন্তু গৃহিনী দিন রাত লোকজন নিয়ে গ্রামোফোন বাজান। আমি কর্ম্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে

শোবার ঘরে বসে এক দৃষ্টিতে শান্তির ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকি। পাড়ার যত মেয়ে এসে গৃহিনীর সঙ্গে বসে জটলা করে, আমার অস্তিত্ব তাদের মনে কোনো উদ্বেগই এনে দেয় না।

ওই যে লোকটিকে দেখছ, ও নাকি তার সম্পর্কে কেমন দাদা হয়। এ লোকটির আনা-গোনা সম্প্রতি বড়ই হামেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় সময় ঘর ছেড়ে এই গাছটার নীচে এসে বসে থাকি। কতদিন যে এমনি নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবন যাপন করতে হবে কে জানে! শান্তি তাকে একদিনও ত মা বলে ডেকেছে, এই জন্যেই তাকে কিছু বলতে পারিনে হয় ত; কিন্তু তোমায় বলে রাখছি বিনোদ, যদি কোনোদিন এখানে কাউকে খুন করা হয়েছে বলে শোন, আর সে খুনের সঙ্গে তোমার ডাক্তার বন্ধুর নাম সংশ্লিষ্ট থাকে, তা হ'লে বিস্মিত হয়ো না, কেন না বিস্মিত হবার তাতে কিছু নেই।

তুমি ভাবছ হয় ত, যে লোক একটা পিঁপড়েকে মারতে ইতস্তত: করে, সে কেমন করে একটা মানুষ খুন করবে, কেমন, তাই না? কিন্তু ভাই, আমি একেবারে বদলে গেছি....প্রতিদিনই বদলাচ্ছি। এক এক সময় হাসপাতালের রূপোর মত চকচকে অস্ত্রগুলির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকি। এক এক সময় হাসপাতাল থেকে বাড়ী আসবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেও ফের অজানার আকর্ষণে হাসপাতালে ফিরে যাই এবং যে ঘরে অস্ত্রগুলি থাকে সে ঘরের আলোটা জ্বেলে অস্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবি। আমার কল্পনায় অস্ত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারা যেন দম্ভভরে আমায় ডাকে। আমি চোরের মত চুপি চুপি আলমারী খুলে অস্ত্রগুলি নাড়াচাড়া করি। অনুভব করি, একদিন আমায় খুন হতে হবে হয় ত।....

কে ডাকছে না আমায়?....সম্ভবত গৃহিনী। দেখি, কি হুকুম হয়। তুমি একটু বস ভাই, আমি এখুনি আসছি।....

বেশী দেরী হয়নি। গৃহিনীর সেই ভাই এসেছেন, তাকে খাওয়ানো হবে—

টাকা চাই। দিয়ে এলাম। কি বিনোদ চোখ রাঙাচ্ছ যে! জানি, তার হুকুম মেনে চলতে গিয়ে ভিক্ষুকেরও অধম হয়ে গেছি। আমার যেন অস্তিত্বই নেই। তাও বলি, রাগ করেই বা কি করব, কাকে তাড়াব? তাতে ত নিজেরই কলঙ্ক—লোকে হাসবে।

তুমি কি এখনই যেতে চাও নাকি? বেশ, যাবে যাও। মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিয়ো। এই ত ছোট্ট নদী, ওপারেই ত তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। কতদিন এসেছ বদলি হয়ে—পনর দিন?—তা হবে। এতদিন কাছে ছিলে না, তাই নিজেকে বড় একাকীই মনে হয়েছে। এখন মধ্যে মধ্যে তোমায় কাছে পেলে তবু মনে একটু সময়ের জন্যেও হয় ত শান্তি পাব। আজ যখন চলে যাবে, আমি তখন এখানে একাকী বসে বসে জীবনের পাতা উল্টিয়ে যাব—কত লোক এসেছে, কত লোক চলে গেছে—কত স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ঘরের আলো তখন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—চোখ মুছে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরব।

ওই তারা আবার গ্রামোফোন বাজাচ্ছে—

"তুমি যেয়ো না এখনি
এখনো আছে রজনী।"

এ-কথা শোনবার জন্যে গ্রামোফোন বাজাবার কোনই দরকার ছিল না।

হাঁ, একটা জিনিষ তোমায় দেখাতে চাই। লাল, নীল, সবুজ কাগজ দিয়ে কতকগুলি ফুল তৈরী করছি—এগুলি আমার শান্তির জন্মদিনে উপহার দেব—পরশুই তার জন্মদিন। আসবে সেদিন?

কিন্তু, ওকি বিনোদ, দু'হাতে মুখ ঢাকছ কেন ভাই? তোমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? কেন বন্ধু, কেন?

[এই গল্পের মূলগত ভাবটী একটী ফরাসী গল্প থেকে নেওয়া।]

আউশ ধান

শ্রীমনোজ বসু

ধানগাছে কথা কয়, ধান বন ডেকে ডেকে রূপ দেখায়, শুনেছ কখনও? মেঘের মত কাল কচি কচি ধানের চারা দেমাক তাদের গায়ে ধরে না। তুমি যদি আল পথে যাও কোন দিন, থমকে দাঁড়াতে হবে। সাধ্য কি—হাঁ ক'রে খানিক না তাকিয়ে থেকে চলে যেতে পার।

আরও কত জনের কত জমি রয়েছে, জীবধরের ত মোটে বার বিঘে! কিন্তু তার মত কারও নয়। খেতে নামলে খাওয়া নাওয়ার জ্ঞান থাকে না জীবধরের। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। মাঠ দিয়ে আগুনের হল্কা বয়ে চলেছে। জীবধর জন আষ্টেক কৃষাণ নিয়ে আড়াই পহর অবধি খেতে নিড়ান দিয়েছে। তারপর বাড়ী এসে খেয়ে দেয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে। ঘুম বেশ এটে এসেছে, এমন সময় শুনল, তুলি ডাকছে—ও বাবা, বাবা—আম কুড়োতে যাবে? বড় হেলার তলায় ঝুড়ি কাঁচা আম পড়েছে ঠিক।

জীবধর জবাব দিল—উঁহু, তুই যা। ঘুম পাতলা হয়ে এল। জীবধর শুনতে লাগল, খড়ের চালে জল পড়বার শব্দ,....বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে বেড়ায় ধাক্কা দিচ্ছে। তারপর উঠে তামাক সাজতে বসল। তুলি এই জলের মধ্যে বেরিয়ে গেছে। ডাকাত মেয়ে!

হুঁকা টানতে টানতে জীবধরের বড় স্ফুর্তি লাগল। এই বৃষ্টিটায় ধানের চারা এক হাত বেড়ে উঠবে। তারপর মনে পড়ল, সরকারদের এঁদো পুকুরে খুব

সম্ভব কই মাছ উঠতে লেগেছে ; বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি—এ সময় মাছ ডাঙ্গায় না উঠে যায় না। গামছা মাথায় সে চুপি চুপি বেরুল।

পুকুরের কোণে কাঁটা ঝিটুকের ঝোপ। জীবধর সেইখানটায় চুপ ক'রে বসে রইল। জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। মাছ খল্‌বল্‌ করছে, কিন্তু একটাও ডাঙ্গায় উঠে না।

—হ'ল কিছু ?

ঘাড় তুলে দেখে কানাই গায়েন। হাতে তার একটা খালুই। সেও একই উদ্দেশে বেরিয়েছে। কানাই বলল—এখানে কিছু হবে না, বার জনে ঘাঁটা দিয়ে গেছে। তারপর ফিস ফিস ক'রে বলতে লাগল—মাঠের দিকে যাই চল। নৈমদ্দি মোড়ল শোলা বনে চারো পেতেছে। বিশ ত্রিশখানা পেতেছে। চারো কই-মাগুরে ভরে গেছে। শোলা বনের মাগুর—জান ত ?

কানাই দু'হাতে মাগুর মাছের যে আয়তন দেখাল, রুই-কাতলাও অত বড় হয় না। পায়ের উপর দিয়ে স্রোত চলেছে, ছপ্‌ ছপ্‌ ক'রে দু'জনে মাঠের দিকে চলল। জীবধর বলল—নৈমদ্দি যদি ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে থাকে কোথাও ?

বয়ে গেছে নৈমদ্দির। যাত্রার দল ক'রে বেড়ায়, এই বৃষ্টিতে বৈঠক ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে, দেখগে যাও—

আলের উপর দিয়ে পথ। আলের কানায় কানায় জল—আর একটু এগুতে পায়ের পাতা ডুবে যেতে লাগল। জীবধর বলল—বাপরে, জল জমেছে ত খুব—

কানাই বলল—তা বৃষ্টিটা কম হল নাকি ! মাঠে ঘাস পাতা মিলছিল না। গরুগুলো শুকিয়ে মরছিল ; এবার খেয়ে বাঁচবে।

তোমার ত কেবল গরু আর গরু। ভুঁই-ক্ষেত ছেড়ে চাষার ছেলে গোয়ালা হ'লে হয় ঐ রকম।

কিন্তু হাসতে গিয়ে জীবধরের হাসি এল না। সে অবাক হয়ে গেছে।

বলল—আরে, বিল যে জলে জলে নৈরেকার। দেল-খোলায় জল উঠেছে, কাণ্ডটা কি!

কানাই বলল—দাঁড়িয়ে গেলে যে?

জীবধর বলল—তুমি এগুতে লাগ, কানাই। আমি মাঠের দিকটা ঘুরে অমনি যাচ্ছি। না হয় দু'জনেই ঐ পথে ঘুরে যাই চল।

কিন্তু কানাইয়ের এক কাঠা জমি নেই, মাঠে ঘুরতে যাবে সে কি দেখতে? জীবধর একাই চলল।

দূর থেকে দেখা গেল, আলের উপর দুলি দাঁড়িয়ে। বাতাসে খোলা চুল উড়ছে। দিগন্তবিসারী সবুজ আউশধানে তার কোমর অবধি ডুবে গেছে। দুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে—ওরে গয়লা, দেখেছি—দেখেছি—সব কীর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি গো—

অতএব কাছাকাছি কোথাও নন্দরামও আছে। নন্দরাম কানাইয়ের ছেলে। গোয়ালা বললে সে ক্ষেপে যায়, আর দুলিও তাকে ঐ ছাড়া ডাকবে না। বাপকে দেখে মেয়ের মূর্ত্তি রণ-রঙ্গিনী হয়ে উঠল। বলল—দেখ বাবা, দেখ।

অনেক দূরে ধানের চারা নড়ছে বটে; ধান বনের মধ্যে গরু! গরুর পিছনে নন্দরাম আছে। জীবধর বলল—তুই যে আম কুড়োতে গেলি—

দুলি বলল—গেলাম ত। তারপর দেখি, গয়লা গরু নিয়ে মাঠে আসছে। পিছন পিছন এলাম। জানি, ধান খাওয়াবে, ওকি কম শয়তান! খাওয়াচ্ছেও তাই।

নন্দরাম কাছে এসে পড়েছে, আলের উপর উঠে সে রুখে দাঁড়াল।

খবরদার দুলি, মুখ সামলে কথা কস্। দুটো আগা কেটে খেয়েছে কি—না খেয়েছে—হয়েছে কি তাতে?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—হয়েছে কি! যাদের জমি চষতে হয়না, খালি গরু তাড়িয়ে বেড়ায়—তারা কি বুঝবে, আগা কেটে খেলে কি হয়—

জীবধরের কানে এ সব যাচ্ছে না। সে দেখছে, হৈ-চৈ ক'রে ক'রে গ্রামের িক দিয়ে অনেক লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে চলেছে।

—কি? কি? ব্যাপার কি?

—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সর্দ্দার। বাঁধ ভেঙ্গেছে। খালের নোনা জল ঠছে। শীগ্‌গির চল।

জীবধর পাগল হয়ে ছুটল।

নন্দরাম দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল—দেমাক করতে নেই। আমাদের মিজমা নেই—গরু তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু জমিজমার মজা দখলি ত হাতে হাতে? দুটো আগা খেয়েছে বলে গালমন্দ করলি, এবার বে কি? নোনা লাগা ধান কেটে কেটে যে গরুকে খাওয়াতে হবে।

দুলি মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

গরুর দড়ি ধরে নন্দরাম এগিয়ে চলল।—চল রে, দুলি, তোদের বাড়ী থকে একটা কোদাল দিবি আমায়।

দুলি তবু নড়ে না। নন্দরাম রীতিমত চটে উঠল। কোদাল দিতে ললাম, তা রাজকন্সের কথা কানে যায় না বুঝি?

দুলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—বাঁধ বাঁধতে গিয়ে কাজ নেই কারও। খুব য়েছে।...বাঁধ ভাঙ্গেনি, শত্তুররা কেটে দিয়েছে। এখন ভাল মানুষ সাজতে এসেছে।

সে কেঁদে ফেলল।

বাঁধ ভেঙ্গেছে অনেকটা। জলের বেগ কিছুতে ঠেকান যায় না। বাঁশের খোঁটা পুঁতে ফাঁকের মধ্যে বোঝা বোঝা বিচালি দেওয়া হচ্ছে। তাও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অনেক কষ্টে অবশেষে খানিকটা আটকান গেল, তখন রাত হয়ে গেছে।

নির্ম্মল আকাশ, ফুট ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। চরের মাটি কেটে জলে ঢালা হচ্ছে ; ঝপাঝপ কোদাল পড়ছে।

শ্রান্ত জীবধর উপরে উঠে বাবলার গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। খবর শুনে কানাইও কখন এসেছে। হঠাৎ নজর পড়ল, কোদালওয়ালাদের মধ্যে নন্দরাম।

এই নন্দা, জল-কাদা মাখছিস—কাল তুই পাঁচন খেয়ে উঠেছিস না ?

নন্দরামের জবাব সঙ্গে সঙ্গে।—গরু রাখতে বলেছিলে, তাতে জল-কাদা লাগে না বুঝি ?

কানাই এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। উঠানে ধানের একটা চিটেও উঠবেনা, তোর এত কোদাল পাড়বার দরকারটা কি বাপু! জীবধরকে বলল—সর্দার ভাই, চাষবাসের এই ফ্যাসাদ। এত খাটলে, অথচ সমস্ত মাটি। এরচেয়ে আমার দুধের ব্যবসা ভাল। জমি বেচে আমার মত গরু কেন গো এবার।

জীবধর আশা ছাড়েনি। বলল—নোনাজল কতটুকুই বা ঢুকেছে! এতে কিছু ক্ষতি হবে না।

জল, দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে শুকিয়ে এল। ধানের সবুজ পাতাও সঙ্গে সঙ্গে লাল। ক্ষেত থেকে ফেরবার পথে জীবধর যেন টলে পড়ে যায়। দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে সে ব'সে পড়ল—কি হবে!

দুলি দড়ি ধরে টানতে টানতে একটা গরু নিয়ে এল ; নন্দরামের রাঙী গরুটা। বলতে লাগল—বাবা, শয়তানিটা দেখ। তুমি বাড়ী আসতে আসতে অমনি গরু ছেড়ে দিয়েছে। আমিও তাকে তাকে ছিলাম। গরু খোঁয়াড়ে দিতে হবে—ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেমন, তেমনি দণ্ড দিয়ে মরুক।

একটু পরেই নন্দরাম এল। সে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—ছেড়ে দিয়েছি, না আরও কিছু। দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

দুলি বলল—তাই বা যাবে কেন ?

নন্দরাম মুখ বাঁকিয়ে বলল—ক্ষেত আগলে রেখে কি হবে শুনি? নোনা লাগা ধান—দু-দিন বাদে শুকিয়ে ত খড় হয়ে যাবে। গরুতে খেলে যাহোক ভগবানের জীবের পেটে যাবে।

ছুলি আগুন হয়ে উঠল।—তা বুঝি, বুঝি গো—পোড়া-মুখো ভগবানকে ডেকে ডেকে যার জন ঘটিয়েছে এইটা। ধান শুকিয়ে খড় হয়ে যাক—আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেব, তবু যেন কারও গরু সেখানে না যায়—

—থামনা, ছুলি। বাপের তাড়ায় ছুলি চুপ হয়ে গেল। জীবধরের স্বর কাঁপছে; বলল—নন্দরাম, তোমার সমস্ত গরু ছেড়ে দাওগে আমার ক্ষেতে। খেয়ে সাফ্ ক'রে ফেলুক। আমার এত কষ্টের ফসল যে রোদ-পোড়া হয়ে শুকুবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না, বাবা—

তাড়াতাড়ি সে দু-ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেল্ল।

উঠানের আমড়া গাছে রাঙীকে বেঁধে নন্দরাম দাওয়ার উপর দিব্য পা ঝুলিয়ে বসেছে। কানাই হুঁকো সাফ করছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল খানিক্ষণ। শেষে আর থাকতে পারল না, বলল—গরুর পেট চিটেপানা হয়ে রয়েছে...এরই মধ্যে ফিরে এলি—ওরে নন্দা?

নন্দ উদাসভাবে বলল—কোথায় কার জমিতে যাব, কে ফ্যাসাদ বাধাবে—

চক্ষু কপালে তুলে কানাই বলল—বলিস কিরে? তামাম মাঠে নোনা লেগেছে, এখন আবার গরুর ভাবনা? গতর নড়াতে চাস না, সেই কথাটা বল্।

জান না ত মাঠের খবর। পরের জমিতে গরু নামাতে দেবে কেন? নন্দরাম অবাধে মিথ্যা ব'লে চলল—ঐ ত সর্দার খুড়োর ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিলাম। গরু ধরে তারা খোঁয়াড়ে দিতে যায়। অনেক বলে-কয়ে ছাড়িয়ে আনলাম। তারপর বলল—টাকা কড়ি দিয়ে একটা বিলি-ব্যবস্থা ক'রে নিলে হয় কিন্তু। নৌকোর ধান কেনার চেয়ে তাতে সস্তায় হবে।

কানাই বলল—টাকা চায় নাকি?

নন্দ বলল—তারা জন-কিষেণ দিয়ে চাষ করিয়েছে, খরচা হয়েছে, চাবে না কেন? টাকা পঁচিশেক হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে নাওগে, বাবা। আমাদের বিশটা গরু এই মশুম খেয়ে শেষ করতে পারবে না—

হুঁ—ব'লে কানাই গুম হয়ে খানিক ভাবতে লাগল। বলল—পঁচিশ টাকা না আরও কিছু! আচ্ছা, দেখছি আমি।

সন্ধ্যার পর কানাই জীবধরকে নিয়ে নীলরতন চাটুজ্জের বৈঠকখানায় গেল। গ্রামের অনেকেই সেখানে, আড্ডা বসেছে। দশ টাকার একখানা নোট সে জীবধরের কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিল।

—না, না—সর্দার ভাই, সেকি হয়? গতরে খেটেছ, এত পয়সা খরচ করেছ, তোমার কত ক্ষতি হয়েছে। তবু যাহোক, বীজধানের দামটা ত ঘরে উঠল। এই কটা মাস ক্ষেত আমার জিম্মায় থাকবে, গরুগুলো চ'রে খাবে—মাঘ-ফাগুনের মধ্যেই তোমার ক্ষেত তুমি ফিরে পাবে। চাটুজ্জে মশায় সব শুনে রাখলেন।

নন্দরামের বুকের ছাতি ফুলে গেছে, এখন তুলিদের বাড়ীর সামনে দিয়ে গরু তাড়িয়ে মাঠে যায়। তুলিকে দেখলেই শব্দ-সাড়া বেড়ে ওঠে। তুলি কিন্তু ভুলেও তাকায় না। দুপুর বেলা আবার যখন গরু ফিরিয়ে আনে, মেয়েটা ঐ সময় প্রায়ই ঘাটে বসে বাসন মাজে। একটা দিনও সে মুখ তোলে না। কুড়িটা গরু হৈ-হৈ শব্দে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া—তা কালা তুলির কানে যায় না যেন!

আবার এক দিন বড় মেঘ ক'রে এল। তারপর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি, বৃষ্টি বৃষ্টি—রাত তুপুর অবধি একটানা বৃষ্টি চলল। শুকনো মাঠে-ঘাটে জলের তুফান বইতে লাগল। তু-এক দিনের মধ্যে দেখা গেল, লাল ধান বন আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। জীবধর ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, মুখ হাসিতে ভরে গেল। সেখান থেকে সোজা গেল সে চাটুজ্জেবাড়ী। বলল—চাটুজ্জেমশায়, কপা

ফিরেছে। ধানের চেহারা দেখবেন একবার গিয়ে। কানাইয়ের টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছি।

কানাই আকাশ থেকে পড়ল। বলল—বোশেখে এমন বর্ষা, দেখেছ কখন? তোমার কপালে নোনা লেগেছিল, আমার কপালে নোনা ধুয়ে সাফ্ হয়ে গেল, আমি গোলা বাঁধছি। টাকা আমি ফেরত নেব না।

আবার সেই দিন নন্দরামের ও দুলির সঙ্গে ঝগড়া লাগল। নন্দরাম অত-শত খবর রাখে না, গরু নিয়ে যেমন যায়, তেমনি যাচ্ছিল। দুলি তার সাড়া পেয়ে কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে রাস্তার উপর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

—ও গয়লা, গরু নিয়ে যাচ্ছ যে বড় !

নন্দরাম অবাক হয়ে গেছে। বলল—আজকে নতুন যাচ্ছি নাকি!

দুলি হাসিতে যেন ফেটে পড়তে লাগল। বলল—ক্ষেতের নতুন রূপ খুলেছে, দেখগে গিয়ে, দরদ হয় না? গরু দিয়ে খাওয়াতে সরম লাগে না? হ্যাঁরে গয়লা?

নন্দর রাগ হয়ে গেল। বলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—। টাকা দিয়েছি গরু নিয়ে খাওয়াই, যা করি—গাঁয়ের মানুষ কথা বলতে যাবে কেন?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—সাধে কি গয়লা বলি? হ'তে চাষা, ধানের মর্ম্ম বুঝতে পারতে। চলদিকি কানাই জেঠার কাছে, বিচারটা কি হয় দেখি।

দুলি কিছুতে ছাড়ল না। গরু রইল সেখানে, ঝগড়া করতে করতে দু-জনে চলল কানাইয়ের কাছে। নন্দ বলে—দেখ বাবা, উৎপাতটা দেখ একবার। গরু মাঠে নিতে দেয় না। দাও দিকি এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে! ডাকাত মেয়ে জেল খেটে মরুক—

কানাই বলল— আচ্ছা হাবা ছেলে ত তুই, কড়-কড়ে ধান বন তার মধ্যে গরু নিয়ে যাস কোন আক্কেলে? সত্যি কথাই ত বলেছে দুলি-মা। আমি ব'লে গোলা বাঁধতে বায়না দিয়ে এলাম, আর তুই গরু নিয়ে খাওয়াতে যাস?

নন্দরাম আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল ধান গাছ গরু দিয়ে খাওয়াবার কথা,—ধান আমাদের গোলায় তুলতে দেবে কেন!

কানাই বলতে লাগল—না—দেবে না। চাটুজ্জে মশায়ের চেয়ে আইন কেউ বেশী জানে না। তিনি বললেন—আলবৎ দেবে। নন্দা, গরুগুলোকে রাত্রে জাবনা দিবি, ধান বনে নিয়ে যাস না আর—

কানাই ঘরে গিয়ে উঠল। নন্দ ভুলির দিকে চেয়ে দেখল, মেয়েটার খুশীর অবধি নেই। আবার জিজ্ঞাসা করে—জিত হল কার?

নন্দ বলে—কার শুনি?

—আমার, আমার।

হাবা মেয়ে দম্ভে যেন ফেটে পড়ছে।

—কেমন, ধান খাওয়াতে যেও এবার চুপি চুপি, আমি কানাই জেঠাকে বলে দিয়ে যাব, তখন বুঝবে মজা—

নন্দর চোখে জল আসতে চায়। সামলে নিয়ে বলল—আচ্ছা ভুলি, এত কষ্ট করে চাষ করলি তোরা, ফাঁকি দিয়ে আমরা সে সব নিয়ে নিচ্ছি। ত কষ্ট হচ্ছে না তোর?

ভুলি বলল—আমার কষ্ট হয় লক্ষ্মীর অযত্ন দেখলে। গরু দিয়ে ধা খাওয়ালে আমার এক-একটা পাঁজরা খসে যায় যেন। এবার ত তা চলবে না

হাসতে হাসতে বিজয়ীর মত ভুলি চলে গেল। নন্দ নিজের মনে বলতে লাগল—এই বুদ্ধি নিয়ে গয়লা গয়লা করিস আমায়। টের পাবি, যখ উপোস করে থাকতে হবে।

ক্ষেতে নামবার হুকুম নেই, আলের ঘাস কেটে এনে গরুকে খাওয়াতে হয় এক দিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, নন্দ ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে হঠাৎ দেখল, শান্ত ডোমের ভিটার ধারে তাল গাছের গোড়ায় একটা লো চুপ চাপ বসে আছে।

—কে?

—আমি, বাবা। বুড়া জীবধর ধান বনের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। কৈফিয়তের ভাবে বলতে লাগল—কাজ-কর্ম্ম নেই, কি করি—বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম এদিক পানে। বৃষ্টির জল পেয়ে নাটা ও কালকাসুন্দের ঝোপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ভাসা বাদার দু'দশটা জাত কেউটেও যে আস্তানা না নিয়েছে, এমন নয়। এটা বেড়াবার জায়গাই বটে!

মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে নন্দরাম তার উপর এক পা তুলে দাঁড়াল

—ক্ষেতটা তা'হলে আমাদেরই সাব্যস্ত হল?

জীবধর বলল—ক্ষেত ত নয়, ক্ষেতের ধান—

—কিন্তু ধানগাছ আমাদের। ধানের চুক্তিতে কিছু ছিল না—

—গাছ হলে তার ফলও পাওয়া যায়, বাবা। চাটুজ্জে মশায় ব'লে দিয়েছেন।

—তা বলে,—বাড়ীতে ভারে ভারে দই-ছানা বয়ে নিয়ে গেলে সবাই অমন ব'লে থাকে। নন্দরাম যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বলতে লাগল—চাটুজ্জে বললেই অমনি হবে নাকি? জমিদারের কাছারি নেই?

জীবধর বলল—হারে কপাল! কানাইয়ের নামে বলতে আমি যাব জমিদারের কাছারি?

—তুমি না যাও, যাবার কত লোক রয়েছে, সর্দ্দার-খুড়ো! রাঙী দড়ি ছিঁড়ে দু-গোছ ধান খেল, দুলি তাতে খোঁটা দিয়ে হেন-তেন কত কি গাল মন্দ করল। কেন করল অমন? গোলমাল ত সেই থেকে। আমি কি করেছি? আমি টাকা আদায় ক'রে দিয়েছি—চুক্তির সময় ছিলাম আমি? যত গণ্ড-গোলের গোড়াই ত দুলি!

কথা আর সে বলতে পারল না। তাড়াতাড়ি বোঝাটা মাথায় তুলে হন হন ক'রে চলে গেল।

কদিন পরে নন্দ জীবধরের একেবারে সামনে পড়ে গেছে, সরে পড়বার ফুরসৎ নেই। জীবধর বলতে লাগল—একি আরম্ভ করেছ, বাবা? এক মায়ের

পেটে না জন্মেও কানাই আর আমি চিরকাল ভাই ভাই ছিলাম। ক'খুঁচি আউশ ধান সব যে বরবাদ করে দেয়—

নন্দ আকাশ থেকে পড়ল।—কি হয়েছে সর্দ্দার খুড়ো?

জীবধর বলল—সে কি? তুমি জান না কিছু? কাছারি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। নায়েব বললেন—কে এসে নাকি নালিশ ক'রে গেছে। তুমি যে সেদিন কি সব বলে গেলে, আমি ভাবলাম, তুমিই বুঝি খবর দিয়ে এসেছ!

নন্দরাম বলল—কি সর্ব্বনাশ, আমি খবর দিতে যাব! তাতে ক্ষতিটা আমার না আর কারও? অন্যায় ত হচ্ছেই, খবর দেবার লোকের অভাব কি! কে গিয়ে লাগিয়ে এসেছে। তারপর উৎসুক কণ্ঠে বলল—কিন্তু বিচারটা কি হ'ল—শুনি—

জীবধর চিন্তিতভাবে বলল—বিচার হয়নি এখনও। একটা কিছু হবেই ত, তাই আরও ভাবনা লেগেছে। আমি দেখছি, জেতার চেয়ে আমার হারই ভাল। একবার ইচ্ছা হ'ল, চেপে যাই। কিন্তু রাজ কাছারিতে দাঁড়িয়ে সবটাই ব'লে আসতে হ'ল। কাল কানাইকে ডেকে পাঠাবে, শুনলাম।

পরদিন সত্যই কানায়ের ডাক হ'ল। কিন্তু ফিরে এল, খুব হাসিমুখ নিয়ে।

নন্দ মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল—খবর কি, বাবা? উতলা হয়ে আছি।

হি-হি করে হাসতে হাসতে কানাই বলল—হবে আবার কি, হবে ঘোড়ার ডিম। নায়েবের সঙ্গে রফা হয়ে গেল, নগদ আড়াই টাকা আর আড়াই সের মাখন। ব্যস!....জীবধরের আবার কারসাজিটা দেখ। খবর পেয়েছে, কাছারিতে ম্যানেজার এসেছে। অমনি তাড়াতাড়ি তার কাছে সাতখানা করে লাগান হয়েছে। আরে বাপু, ম্যানেজার এর করবে কি? ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেলে হয় কখনও? নায়েব তাই আরও রেগে গেছে।

শুষ্ক মুখে নন্দ বলল—হ'ল কি তাই বল—

কানাই সগর্ব্বে বলতে লাগল—নতুন আবার হবে কি। নায়েব ব'লে দিয়েছে, ধান আমার পাওনা।

কিন্তু নায়েব যাই বলুন এবং কানায়ের সঙ্গে তাঁর যে-প্রকার রফাই হোক, ম্যানেজার উপস্থিত থাকায় শেষ পর্য্যন্ত হুকুম সম্পূর্ণ উল্টা রকম হয়ে গেল। ধান পাবে জীবধর, এমন কি কানায়ের দশ টাকা ফেরৎও দিতে হবে না, গরুকে এতদিন যা খাইয়েছে, তাতেই টাকার শেষ হয়ে গেছে। হুকুমটি এখনও জানাজানি হয়নি।

তেঘরার গাঙ্গে নৌকা-বাইচ ছিল। এই বাইচের বড় নামডাক। যে দল জেতে, তাদের পিতলের ঘড়া বকশিশ দেওয়া হয়।

জীবধর দুলিকে নিয়ে বাইচ দেখতে গিয়েছিল, কাছারির নকুল বরকন্দাজও গিয়েছিল সেখানে; সেই চুপি চুপি জীবধরকে হুকুমের কথাটা বলল। দুলি আর বেশীক্ষণ থাকতে দিল না; কেবলই বলে—বাড়ী চল, বাড়ী চল—। বাড়ী এসে খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করে নন্দরামের সামনে দিয়ে জাঁক করে বেড়িয়ে আসবে—এই তার মতলব।

বাপে মেয়েয় ফিরছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাড়ী যাচ্ছে, তা দুলি যেন নাচতে নাচতে চলেছে। দোহাত্তির চরের কাছাকাছি এসে বলল—চল না বাবা, ক্ষেতের দিক দিয়ে ঘুরে যাই একটু—

উঁহু, রাত্তির বেলা....। জীবধর মাথা নাড়ল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কানাই যেদিন ধান খাওয়াবার চুক্তি ক'রে নিয়েছে, সেই দিন থেকে দুলি ক্ষেত মুখো হয়নি। আজ সে কিছুতে শুনল না, জীবধরকে এক রকম জোর করেই নিয়ে চলল।

গেঁয়ো বনের মধ্যে যেন কিসের আওয়াজ। দুলি হাঁক দেয়, কে? কোন সাড়া নেই, চারিদিক চুপ চাপ। দুলি বলে—বাবা, মানুষ আছে ওখানে।

জীবধর বলে—আছে, আছে। মাছ ধরছে কারা।...আরে আরে, চললি ঐ জঙ্গলের মধ্যে ম্যাচ ম্যাচ করে? এমন ডাকাত মেয়ে দেখিনি ত!

জঙ্গলের মধ্য থেকে দুলি চীৎকার আরম্ভ করেছে—বাবা দেখ, দেখসে এসে গয়লার কাণ্ড! আমি তখনই জানি—

জীবধর গিয়ে দেখে, চোর কোদাল সুদ্ধ ধরা পড়েছে। হাতে কোদাল, কোদাল দিয়ে নন্দরাম বাঁধ কাটছিল। আর খানিকটা কাটতে পারলেই খালের নোনা জল ধান বনে পড়ে সোনার ধান ডুবিয়ে দিত। সাংঘাতিক ছেলে!

দুলি কোমরে দু-হাত দিয়ে মল্ল যোদ্ধার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। বলল—দেখ, শয়তানিটা দেখ একবার। নোনা লাগলে গরুকে ধান খাওয়াবার ম হয়, না?

নন্দরাম কিন্তু একটুও অপ্রতিভ নয়। জবাব দিল—হয়ই ত। গরুকে আমি খাওয়াবই। তুই জিতে যাবি, তাই হতে দেব নাকি?

দুলি বলতে লাগল—দেখলে বাবা? কেমন হিংসুটে দেখ একবার। খবর পেয়েছে, ক্ষেতের ধান আমাদের পাওনা। বাঁধ কেটে অমনি সব ডুবিয়ে দেবার মতলব করেছে—

কোদাল ছুঁড়ে ফেলে নন্দরাম খাড়া হয়ে দাঁড়াল।—ক্ষেতের ধান তোমরা পাবে সর্দার খুড়ো? নায়েব তাই হুকুম দিয়েছে?

জীবধর নন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল—এ সব কার কীর্তি, সে কি জানিনে, বাবা? নকুল বরকন্দাজের কাছ থেকে সমস্ত শুনে এসেছি। নায়েবের কাছে হল না দেখে, তুমি নিজে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বলে এসেছ। কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি। বাপের নামে লাগিয়ে এলে। কানাই যখন শুনতে পাবে, তার মনটা কি রকম হবে বল ত?

দুলির কালো চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল। গয়লা ব'লে এসেছে! ম্যানেজারের কাছে যেতে সাহস হ'ল ওর?

জীবধর বলল—ও ছাড়া আবার কে! আমি বরাবর সন্দেহ করেছিলাম, মিথ্যে ব'লে ও আমার কাছে লুকিয়ে এসেছে।

—তবেই দেখ কি রকম লোক। দুলির চোখে মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠল। বলতে লাগল—চুরি ক'রে বাঁধ কাটে, আবার মিথ্যে কয়। ওকে যে কি করে তুমি ভাল বল—

তিন-চারটা লণ্ঠন আ'ল পথে এসে বাঁধের উপর উঠল। কানাইয়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে, ডাকছে—জীবধর।

জীবধর সাড়া দিলে সকলে সেইখানটায় এসে দাঁড়াল। কানাই ক্রুদ্ধ-স্বরে বলল—কেষ্ট গিয়ে খবর দিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি—

সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তাদের মুখের দিকে এক নজর চেয়ে শুষ্ক-মুখে জীবধর বলল—কি বলেছে কেষ্ট ?

জবাব দিল দক্ষিণ পাড়ার মধু।—মাথামুণ্ডু কি আর বলবে। মাছ ধ'রে এই পথে ফিরছিল। গিয়ে খবর দিল, বাঁধের এই দিকটায় কোদাল পড়েছে। এক রশি আগের থেকে আমরা তোমার গলার আওয়াজ পেলাম. কোদালও ঐ পড়ে রয়েছে।....তা দিনটা বেছেছ ভাল, সর্দ্দার—সবাই বাইচ দেখতে গেছে। আমরাই ক'জন সকাল সকাল ফিরেছি।

তুলি জ্বলে উঠল।—বাঁধ কাটতে বাবার বয়ে গেছে। কাটছিল ঐ নন্দা—

—নন্দা কাটছিল বাঁধ ?

কানাই বলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়চ কেন মধু, তা হ'তে পারে। হারামজাদা হয়েছে কুলের মুষল। তারপর জীবধরের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—ওর কানে যে কি গুরুমন্তোর দিয়েছে সর্দ্দার-ভাই, রাত-দিন ও তোমাদের হয়ে ঝগড়া করে। ধানগুলো আমার গোলায় উঠলে ওর সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে কিনা, তাই ও বাঁধ কাটতে লেগেছে—

নন্দরাম বলল—তোমার গোলায় ধান উঠবে কি ক'রে, বাবা ? ম্যানেজার হুকুম দিয়েছে, যাদের জমি তাদেরই ধান। আমি বাঁধ কাটি আর নোনা জলের তুফান বইয়ে দিই, তোমার তাতে কি যায় আসে ?

—সত্যি নাকি ? কানাই জীবধরের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

জীবধর বলল—ম্যানেজার বলেছে তাই বটে। কিন্তু ক'টা ধানের জন্য তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব বুঝি! ধান আমি নন্দকে দিয়ে দিলাম—ও তোমাদের। আমি আর ওদিকে ছায়া মাড়াতে যাচ্ছি না।

কিন্তু দুলির আপত্তি আছে। সে বলল—না, যাব না—এক-শ' বার যাব। ধান দাও—দিয়ে দাওগে। কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই—গরু দিয়ে ধান না খাওয়ায় সেটা দেখতে হবে।

কানাই ব'লে উঠল—দেখতে হবে বইকি মা। হারামজাদার কাণ্ড-জ্ঞান মোটে নেই, ওকে দেখবার জন্যই একজন পাহারাদার দরকার। সর্দ্দার-ভাই, ধান-টান থাকগে, তুমি এই দুলি মা'টিকে দিয়ে দাও। ধান দিলে লাভ হবে না কিছু—হারামজাদা গরু দিয়ে খাইয়ে দেবে—

লণ্ঠন নিয়ে ওরা একটু এগিয়ে পড়েছে। দুলি আর নন্দ পিছিয়ে গেছে। অত ঝগড়া করবে, তা পা চলবে কখন? নন্দ সদম্ভে বলল—ওরে দুলি, গয়লা গয়লা করতিস্ যে বড়—এবার যদি তোকে কেউ ডাকে গয়লা-বউ?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—গয়লার ব্যবসা রাখতে দেব বুঝি! রাঙীকে দিয়ে আসছেবছর আউশের চাষ হবে।

ঘন কাল আউশ ধান। কোমর সমান উঁচু হয়েছে, রাতের বাতাসে দুলছে, ফিস ফিস করছে। আল-পথে চলেছে দুলি আর নন্দ। ধান তাদের গায়ের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

উৎসর্গ

শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র

অরুণ তাহার প্রকাশকের নিকট হইতে বাড়ী ফিরিল রাত্রি নয়টারও পরে। ক্লান্তপদে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যখন নিজের ছোট ফ্ল্যাট্‌টিতে সে চাবি খুলিয়া ঢুকিল, তখন যেন আর আলো জ্বালিবার মতও দেহের অবস্থা নাই। অবশ্য আলো জ্বালিবার খুব বেশী প্রয়োজনও ছিল না। পূবের জানালায় শুধু শার্শি দেওয়া ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যায়। সে পাঞ্জাবি ও গেঞ্জিটা খুলিয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিল, তাহার পর ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

নীচে তখনও কর্ম্মমুখর কলিকাতা ঘুমাইয়া পড়ে নাই। তখনও ট্রাম-বাস পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে, দোকান-পাটও সব বন্ধ হয় নাই। শহরের কর্ম্মব্যস্ততার এই মিলিত কোলাহল এতটা উপঁরে আসিয়া কেমন যেন মধুরই লাগে। নীচেকার উজ্জ্বল আলো এখানের চন্দ্রালোককে ম্লান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার একটা রেশ এ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। বেশ লাগে অরুণের এ ব্যাপারটা। সে নিজের একান্ত কাছে কলরব পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নির্জ্জনবাসেও তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই শহরতলীতে যায় নাই, শহরের জনতামুখর এই বিশেষ ব্যস্ত রাজপথটিতেই আসিয়া ফ্ল্যাট্‌ ভাড়া করিয়াছে।

ফ্ল্যাট্‌ তো ভারি! মোট দেড়খানা ঘর। ঘর বলিতে ওই একটি, পাশে যে স্থানটি আছে তাহাকে আধখানা ঘর বলিলেও বেশি সম্মান করা হয়—চলন মাত্র, একটি ছোট টেবিল পড়িলেই আর নড়বার উপায় থাকে না।

অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলি হইতে তিল তিল করিয়া স্থান বাঁচাইয়া এই অদ্ভুত তিলোত্তমা তাহার অদৃষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য একপক্ষে তাহা ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, নাহলে পনেরো টাকা ভাড়ায় একটা পৃথক ফ্ল্যাটই বা মিলিত কোথায়? অরুণের এখন যা মানসিক অবস্থা, মেসের বাসা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ শুধু একজন পুরুষকে ঘরও বড় একটা কেহ ভাড়া দিতে চায় না। আর যদি বা পাওয়া যায়, সেও বড় গোলমাল।

তাহার চেয়ে এই-ই বেশ। পনেরোটি টাকা ভাড়া দেয় আর এই বাড়ীরই দারোয়ানকে দেয় সাতটি টাকা। সে-ই দুই বেলা রান্না করিয়া দিয়া যায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সুতরাং মাছ-মাংস সে খায় না, দিতেও পারে না। কিন্তু তাহাতে অরুণের বিশেষ অসুবিধা হয় না, নিরামিষই তাহার ভাল লাগে। আর একটি ঠিকা ঝি আছে, সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিয়া যায়। এই তাহার সংসার।

ইহার বেশি আজ আর সে চায়ও না, বরং এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বরাবর বজায় থাকিলেই সে খুশী। মাস-ছয়েক আগে এই ব্যবস্থার কথাও সে কল্পনা করিতে পারিত না। দুইটি কি তিনটি গোটা পাঁচ-ছয় টাকার টিউশনি সম্বল করিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, মেসের দুই বেলা ভাত এবং কোনমতে কোথাও একটু মাথা গুঁজিবার স্থান, ওইটুকুই ছিল তাহার পক্ষে বিলাস।—একেবারে সম্প্রতি, মাত্র ছয় মাস আগে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, চল্লিশ টাকা মাহিনার একটা মাষ্টারি মিলিয়াছে এবং চাকরিটা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই সে আশা করে। অন্ততঃ সেই ভরসাতেই সে মাস-তিনেক আগে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া লইয়াছে।

অবশ্য শুধু মাষ্টারিই আজ আর তাহার একমাত্র অবলম্বন নয়, প্রায় বছর-দুয়েক আগে, গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে, উপার্জ্জনের আর একটী পথও হঠাৎ সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খুব ছোটবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে সে কবিতা ও গল্প লিখিত। এতদিন পরে মানসিক অবসাদে যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া

পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন সে সেই পুরাতন অভ্যাসের মধ্যেই আবার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল। এবার আর কবিতা লিখিবার চেষ্টা করে নাই, শুধু গল্প। একে একে দু-একটী সাময়িক-পত্রে সে গল্প ছাপাও হইল, ক্রমে তাহার দরুণ পাঁচ টাকা সাত টাকা দক্ষিণাও মিলিতে লাগিল। সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর, আজ তাহাই মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—বাংলা দেশের এক বিখ্যাত প্রকাশক একেবারে তিন শত টাকা দিয়া তাহার একখানি উপন্যাস লইয়াছেন, এবং সেটি ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহারই শেষ কয় পৃষ্ঠার প্রুফ এবং বাকী এক শত টাকার চেক প্রকাশক দিয়া দিয়াছেন।

অরুণ একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। প্রুফটা দেখিতেই হইবে, আলোটা জ্বালা দরকার। প্রকাশক মোহিতবাবু অনুরোধ করিয়াছেন, ইস্কুল যাবার পথেই তো প্রেস পড়বে, যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে যাবার পথে প্রুফটা প্রেসে ফেলে দিয়ে গেলে বড্ড ভাল হয়। দশটার আগে পৌঁছলে কাল ছাপা শেষ হয়ে পরশু বইটা বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রথম উপন্যাস বাহির হইবে। তাহার নিজের আগ্রহও বড় কম নয়। সে আলোটা জ্বালিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মোহিতবাবুর আর একটা কথা, টাইটেলের চার পাতা বাদ দিয়েও আর দুটো পাতা বাঁচছে। 'উৎসর্গ' করবার যদি কাউকে থাকে তো লিখে দিন না। প্রথম বই আপনার, কাকে 'উৎসর্গ' করবেন ভেবে দেখুন।

কথাটা খুবই সাধারণ। কিন্তু ইহার পিছনে কতখানি অপ্রীতিকর চিন্তা এবং স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে!

অরুণ আর আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল না। নীচে কোলাহলমুখর,

আলোকোজ্জ্বল রাজপথের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার চেয়ারেই আসিয়া বসিল। তাহার প্রথম বই কাহাকে উৎসর্গ করিবে—এই প্রশ্নটার সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আজ এই সত্যটাই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। আত্মীয়, বন্ধু, স্নেহভাজন, কোথায়ও এমন কেহ নাই, যাহার হাতে তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর ফল, বহু সাধনার বস্তু এই বইখানি তুলিয়া দেওয়া যায়।

অথচ আজ তাহার সবই থাকিবার কথা। মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন বটে কিন্তু বাবা সে অভাব জানিতে দেন নাই কখনই। অতি যত্নে মানুষ করিয়া বি-এ পাশ করাইয়া আফিসেও ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এবং সংসারে লোকের অভাব বলিয়া অনেক খুঁজিয়া সুন্দরী পুত্র-বধূও ঘরে আনিয়াছিলেন। সেদিন কিন্তু জীবনকে বেশ রঙীন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বৎসর কাটিতে না কাটিতে কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! বাবা মারা গেলেন, তাহারই মাস কয়েকের মধ্যে হঠাৎ আফিসটিও উঠিয়া গেল। সেই যে চাকরি গেল—আর কিছুতেই কোথাও কোন কাজ মিলিল না। এক মাস, দুই মাস করিয়া বৎসর, ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বাব বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং একে একে নীলিমার গহনাগুলি সব গেল। তাহার পর ঘরের আসবাব-পত্র, সর্ব শেষে বাসন-কোসনও আর রহিল না। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছোটখাটো টিউশনি হয়ত পায় কিন্তু সেও পাঁচ সাত টাকার মাত্র। তাহাতে খাওয়া পরা বাড়ী ভাড়া সবগুলি চলে না। তাই বাড়ী ছাড়িয়া সে ফ্ল্যাটে আসিল। সেখান হইতে ভাড়াটে-বাড়ীর নীচের তলায় একখানা অন্ধকার ঘর, তবু ভাড়া দেওয়া যায় না। অপমানের ভয়টা বড় বেশী ছিল বলিয়া বেশী ধার করিতে সে পারিত না। যাহা কিছু সামান্য পাইত কোন মতে ঘর ভাড়াটা দিয়া দিত, সুতরাং নিজেদের ভাগে দিনের পর দিন চলিত উপবাস।

উঃ, সে দিনের কথা মনে করিলে আজও বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। ত

নৈরাশ্য ও তিক্ততা। এতটুকু আশা, এতটুকু আনন্দের আলোও কোথাও নাই। সারাদিনই প্রায় কাজের চেষ্টায় ঘুরিত। গভীর রাত্রে ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিত, হয়তো নীলিমা তখনও শুষ্ক মুখে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আগে আগে সে প্রশ্ন করিত, নয় তো একটু ম্লান হাসিত, ইদানীং তাহাও আর পারিত না। উপর্য্যুপরি উপবাসে তাহার প্রাণ-শক্তি গিয়াছিল ফুরাইয়া। দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তবু একটা কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরিও সে জোটাইতে পারে নাই।

অরুণের আত্মীয়-স্বজনরা দারিদ্র্য দেখিয়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন। নীলিমারও বিশেষ কেহ ছিল না। অসামান্য রূপ দেখিয়া নিতান্ত গরীবের ঘর হইতেই অরুণের বাবা তাহাকে আনিয়াছিলেন। সুতরাং এক বেলা আশ্রয় দিতে পারে, খাদ্য দিতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত এমন কেহই যখন আর রহিল না, তখন কোন প্রকার ধার করা বা সাহায্য চাওয়ার চেষ্টাও অরুণ ছাড়িয়া দিল। এরপর চলিতে লাগিল শুধু উপবাস। দুই দিন, তিন দিন অন্তর হয়তো ভাত জোটে, তাও এক বেলা।

অবশেষে নীলিমা আর সহিতে পারিল না। আশ্রয় দিবার আত্মীয় ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যথেষ্ট ছিল বলিয়া সর্ব্বনাশ করিবার লোকের অভাব ঘটিল না। অরুণের চরম দুর্দ্দিনে, তাহার ভার বহন করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া নীলিমা একদিন চলিয়া গেল। যাইবার সময় শুধু রাখিয়া গেল, এক ছত্র চিঠি—

'আমি আর সইতে পারলুম না। আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমার ভার ঘুচলে তুমিও হয়তো এক বেলা খেতে পাবে।'

অরুণ অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে বাথ-রুমে গিয়া মাথায় খানিকটা জল থাবড়াইয়া

দিল, তাহার পর মুখ-হাত মুছিয়া জোর করিয়া আলোটা জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাজ সারিতেই হইবে, বৃথা চিন্তা করিবার সময় তাহার নাই।

কিন্তু প্রুফ ছিল সামান্য, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আবার সেই উৎসর্গের প্রশ্ন। সামনে কাগজগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল, টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা নিঃশব্দে জ্বলিতে লাগিল, সে জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার উপরে আর একটা বাড়ীর কার্নিস, যেখানে এক ফালি চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মন তাহার চলিয়া গিয়াছে তখন কত দূরে, অতীতের এক কুৎসিত কর্দ্দমাক্ত মেঘ-ঘন দিনে। যেখানে আলোর রেখা মাত্র নাই, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে—

সেদিন হয়তো তাহার মরাই উচিত ছিল। নিজের স্ত্রী, ভরণ-পোষণের অক্ষমতার জন্য যাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে আবার সেই কালামুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে কি বলিয়া? কিন্তু মরিতে সে পারে নাই। হয়তো স্বাভাবিক-ভাবে মৃত্যু আসিলে সে আদর করিয়াই বরণ করিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বাহির করিতে সে পারে নাই, অত দুঃখের পরেও না। বরং গৃহস্থালীর সামান্য যে দুই একটা তৈজস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বেচিয়া একটা মেসে গিয়া উঠিয়াছিল, এবং নিজের মনেও স্বীকার করিতে আজ তাহার লজ্জা হয়। দুই বেলা ভাত খাইতে পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিয়াছিল। সেই হইতেই সে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসঙ্গ।

তাহার পর আবার একটু একটু করিয়া সে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। আজ বরং তাহার অবস্থা সচ্ছলই, কিন্তু এই সচ্ছলতা একদিন যাহার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সেই জীবন-সঙ্গিনীই গিয়াছে হারাইয়া। আজ আর এ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোন মূল্যই নাই। কোথায় আছে সে কে জানে, সুখে আছে কি আরও দুঃখে আছে! কাহার আশ্রয়ে আছে তাই বা কে জানে, সে কেমন লোক। হয়তো বা

বাঁচিয়াই নাই। দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—হয়তো অকালেই এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে।

কথাটা ভাবিতেই অরুণের দুই চোখ অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বেচারী অত দুঃখই সহিল, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে হয়তো আর ইহার প্রয়োজন হইত না। আজ এই স্বাচ্ছন্দ্যের সে-ও অংশ লইতে পারিত আজ আর তাহার প্রথম উপন্যাস কাহাকে উৎসর্গ করিবে, এ প্রশ্ন উঠিত না। সে হয়তো আজও বাঁচিয়া আছে, অথচ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অরুণ কিছুতেই।

নীলিমাকেই সে উৎসর্গ করিবে নাকি শেষ পর্য্যন্ত? কুল-ত্যাগিনী স্ত্রীকে? দোষ কি?

চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

বেচারী নীলিমা, তাহারই বা অপরাধ কি? কি কর্ম্মটাই না করিয়াছে সে! দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে, লজ্জা নিবারনের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত জোটে নাই। বহুদিন তাহাকে গামছা পরিয়া একমাত্র ছেঁড়া কাপড় শুকাইয়া লইতে হইয়াছে। তবু—তবু সে গঞ্জনার একটি শব্দও মুখ দিয়া উচ্চারণ করে নাই, কোন প্রকার অনুযোগ করে নাই, আবার স্বামী খাইবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি সে একদিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াই থাকে তো এমন কিছু অপরাধ নয়।

অরুণ তাহার মনের মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া আজ বোধ করি প্রথম, লক্ষ্য করিল যে, সেখানে নীলিমার সম্বন্ধে কোন অভিমান, কোন অনুযোগই আর অবশিষ্ট নাই। হয়তো আছে বেদনা বোধ, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী তাহার নিজেরই অদৃষ্ট। যতদিন নীলিমাকে সে পাইয়াছে, কখনও কোনও অভিযোগের কারণই তো সে ঘটিতে দেয় নাই। স্নেহে, প্রেমে,

সেবার, লীলাচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তাহার সেই কিশোরী বধুর কথা মনে পড়িলে আজও সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। না, যতদিন সে পাইয়াছে, আশ মিটাইয়াই পাইয়াছে। এমন দুর্ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয় বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্যও কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথম যৌবনের, সেই নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রার এক-একটি বিনিদ্র রজনীর যে মধুস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, শুধু সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তো একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। তবে, তাহার কি কোন মূল্যই নাই, সেজন্য কোন কৃতজ্ঞতা নাই? অরুণের নিজের দোষে, অসীম দুঃখের ফলে, একটি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যদি তাহার পদস্খলনই হইয়া থাকে তো সেইটাই কি সে মনের মধ্যে বড় করিয়া রাখিবে আর অতখানি প্রেম, অতখানি নিষ্ঠা সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে? না, মনের এই দুর্ব্বলতা, এই অন্যায় সংস্কারকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না, নীলিমাকেই সে প্রথম বই উৎসর্গ করিবে।

নীচে তখন রাজপথ জনবিরল হইয়া গিয়াছে, দোকান-পাঠগুলি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোও হইয়া উঠিয়াছে ম্লান। সহরের অশান্ত বিক্ষুব্ধতার উপরে যেন চমৎকার একটি সুষুপ্তি নামিয়া আসিয়াছে, সমস্তটা মিলিয়া একটা করুণ অথচ মধুর শান্তি।

সে খানিকটা যেন কিসের আশায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ফ্ল্যাটে তখনও স্বামী-স্ত্রীর আলাপের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, নীচে কোথায় একটা ছেলে কাঁদিতেছে একটানা সুরে। আর সব শান্ত, স্তব্ধ।

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল। তাহার পর দৃঢ় হস্তে প্রুফের কাগজগুলা টানিয়া লইয়া উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি লিখিয়া দিল। বেশী কিছু নয়, শুধু—"শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কল্যাণীয়াসু"।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাই বই বাহির হইয়া গেল। প্রকাশক মোহিতবাবু এক কপি হাতে করিয়া রাত্রে আসিলেন রক্ষিতার বাড়ী। উপরে উঠিয়া

তাহার সামনে বইখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এই নাও, তোমার সেই বই বেরিয়েছে।

সে বসিয়া কি একটা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বইটা তুলিয়া লইল। চমৎকার বাঁধাই, উপরে রঙিন ছবি, তাহারই মধ্যে ঝকঝক করিতেছে বই ও লেখকের নাম। খানিকটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বইটা বিছানার পাশে একটা টিপয়ের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া মোহিতবাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরে মন দিল। চাদর ও জামাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মোহিতবাবু বলিলেন, বাবা বাঁচলাম! যা তাগাদা তোমার, ওই বইটা যেন আমার সতীন হয়ে উঠেছিল।

তাহার পর নীচের ঢালা বিছানাটায় দেহ এলাইয়া দিয়া কহিলেন, রামটহল গেল কোথায়? একটু তামাক দিতে বলো।....বেরুল তো, এখন খরচাটা উঠলে বাঁচি। তোমার কথা শুনে একগাদা টাকা দিয়ে বইটা নিলাম, ওর আদ্ধেক টাকাও কেউ দিত না।

ও পক্ষ তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, নিশ্চয়ই উঠবে। অত ভাল লেখা, লোকে নেবে না?

মুখটা বিকৃত করিয়া মোহিত কহিলেন, কে জানে কি লেখা, আমি কি আর কোনটা পড়েছি ছাই! তুমিই খালি ওঁর নাম করতে গলে পড়ো।

হ্যাঁ গো মশাই, শুধু বুঝি আমি? ভালোই যদি না হবে, তাহলে অতগুলো মাসিক-পত্র ওঁর লেখা ছাপে কেন?

মোহিতবাবু একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওদের তো ভারী বুদ্ধি, ওরা যা পায় তাই ছাপে।....তোমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যতগুলো কাগজ অরুণবাবুর লেখা ছাপে, সবগুলোই তো তুমি নিতে শুরু করেছ দেখছি।

কি করব, একলা সময় কাটে কি করে আমার? তুমি কিছু ভেবো না,

ও বই নিশ্চয় ভাল বিক্রি হবে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও, দেখবে, ভাল সমালোচনা বেরুলেই বিক্রি হতে শুরু হবে।

হ'লেই বাঁচি। একেবারে নতুন লেখক, ভয় করে বড্ড।

মোহিতবাবু খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে রামটহল তামাক দিয়া যাইতে, উঠিয়া বসিয়া গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা ভারী মজার ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। শুনেছ, ওঁর বউয়ের নামও নীলিমা।

নীলিমা হেঁট হইয়া জল-খাবারের থালা রাখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, কে বলেছে?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন, ওই দেখনা বইটা খুলে, উৎসর্গ করেছেন তার নামে।

নীলিমা তাড়াতাড়ি বইটা খুলিয়া উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা বাহির করিল। মিনিট খানেক সেদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু ও যে ওঁর বউয়ের নাম, তা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

মোহিতবাবু মুখ হইতে নলটা সরাইয়া বলিলেন, নামটা দেখে ভারী মজা লাগল। বলতে তো পারিনা কিছু, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে মশাই? অরুণবাবু জবাব দিলেন, 'আমার স্ত্রী।' অদ্ভুত মিল, না?

নীলিমা কোন উত্তর দিল না। তখনও তাহার চোখের সামনে সেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা খোলা, কিন্তু অক্ষরগুলি তখন আর চোখে পড়িতেছিল না, সব যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

আরও মিনিট দুই পরে বইটা বন্ধ করিয়া সে ঈষৎ রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, বস তোমার চা-টা নিয়ে আসি—

কিন্তু তখনই সে নীচে গেল না। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গলির উপরের এক ফালি অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কে জানে কাহার উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মোহিতবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

সবার উপরে মানুষ সত্য

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বৌদিদি বললেন, "দেখলে তো ভাই তোমার দেশের ধারা। একটু ফ্যান দাও, দুটি ভাত দাও, ক'রে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী প্রাণ বিসর্জন করল, কিন্তু দেশের জন্যে নয়। এই মানুষগুলো যদি মরণ ধ্রুব জেনে দেশের নামে মরত তাহ'লে কি একটা বিপ্লব—"

দাদা বললেন, "চুপ, চুপ, চুপ।" এই ব'লে তিনি জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন। দিয়ে বিদ্যুতের পাখা খুললেন।

আমার গলা চেপে ধরেছিল কী একটা শক্তি। বন্ধ স্বরেও আমার কণ্ঠের কুণ্ঠা দূর হ'লো না দেখে দাদা বললেন, "গরমে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না।"

আমি বললুম, "কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু গরমে নয়, অন্য কোনো কারণে।"

বৌদিদি বললেন, "শুনতে পাই—"

আমি বললুম, "একটা গল্প মনে পড়েছে। শোনাব?"

বৌদিদি বললেন, "নিশ্চয়।"

দাদা তখন জানালাগুলো খুলে দিয়ে বললেন, "যাক, গল্প। বাঁচা গেল। আমারও গলা খুলল।"

আমি যেদিন কলেজে ভর্তি হই আমার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হয় বোকু বিশ্বাস, তার ভালো নাম বিরাজমোহন। প্রথম দিন থেকেই আমাদের হৃদ্যতা জন্মায়। তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমরা দু'জনেই লোকেও

ডিভিসনে পাশ করি অথচ আমাদের পাওনা ফার্ষ্ট ডিভিসনের চেয়েও বেশী। তখন গুজার অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, আমরা পড়াশুনা করিনি, পরীক্ষাটা দিয়েছিলুম গুরুজনের উপরোধে। আমরা যে দেশের জন্যেই সেকেণ্ড ডিভিসনের চূণকালি মেখেছি, আমাদের এই ত্যাগ আর কেউ স্বীকার করত না, করতুম আমরা দু'জনেই।

কিন্তু আমাদের দু'জনের স্বভাব ছিল দু'রকম। বোকু ছিল এক নম্বর আলাপনবীশ আর আমি তো চিরকাল মুখচোরা। বোকু আমার কাছ থেকে ক্রমে সরে যেতে লাগল, আমিও তার অভাবে ম্রিয়মান হলুম না। কারণ আমাকে উঠে পড়ে সেকেণ্ড ডিভিসনের কালিমা ক্ষালন করতে হচ্ছিল। একদিন শুনলুম, বোকু দেশবন্ধুর ডাক শুনে স্বরাজ-মন্দিরে গেছে, তার মানে শ্রীঘরে। নিজের জন্যে আমি লজ্জা বোধ করলুম, বোকুর জন্যে গর্ব্ব।

এর পরে সে কলেজ বদল করল, আমিও তার সঙ্গে বন্ধুত্বের খেই হারিয়ে ফেললুম।

বিলেতে আবার আমাদের দেখা। সেখানে তার আর এক মূর্ত্তি। দেশে যখন ছিল, তখন তার চুল ছিল উস্কো-খুস্কো। চোখে ছিল ভাঙ্গা চশমা, তাই পরে সে হকি খেলত দারুণ। বয়স্যেরা আদর ক'রে ডাকত, "বোকু বাব্।" বাবু নয়, বাব্। পরণে বেশীর ভাগ সময় লুঙ্গী আর কুর্ত্তি। দুটোই খদ্দরের। একটা টুপিও যেন ছিল। ঠিক মনে পড়ে না। আর বিলেতে সে পুরোদস্তুর সাহেব। সে যখন খেলার পোষাক পরে টেনিস খেলতে যেত তখন তাকে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুমার ব'লে ভ্রম হতো।

আমরা তাকে হিংসা করতুম তার রাশি রাশি সাহেব বন্ধু দেখে। চাণক্য পণ্ডিত যাই বলুন না কেন, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজা পায় না একালে। পূজা পায়, খেলোয়াড়।

আমার অনুযোগের উত্তরে বোকু বলত, "দেখ হে, আমি যে ওদের সঙ্গে এত মিশি তার কারণ কি এই যে ওরা ইংরেজ। না, ওরা মানুষ। মানুষের

জাত আছে, কিন্তু সে জাতের চেয়ে বড়। ধর্ম আছে, কিন্তু সে ধর্মের চেয়ে বড়। রং আছে, কিন্তু সে রঙের চেয়ে বড়। একটা আস্ত মানুষ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমার মনেই থাকে না সে ইংরেজ আমি বাঙালী, সে ক্রিশ্চান আমি হিন্দু। সে মানুষ, আমিও তাই। আচ্ছা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে কম মিশি।”

সে কথা ঠিক। বোকু যে আমাদের উপেক্ষা করত তা নয়। ওর আপন-পর ভেদ ছিল না, আমাদের ছিল। অমারা ওকে ভুল বুঝতুম। বলতুম, বোকুটা বিলেতে এসে বকে গেছে, দেশপ্রেমিক না হ'য়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়েছে। দেখা হ'লে ক্ষেপিয়ে বলতুম, “কি হে বিশ্বপ্রেম বিশ্বাস, আছ কেমন ?”

বোকু বলত, “হাঁ হে দেশপ্রেম রায়, আছি ভালোই।”

বোকু ফিরল ব্যারিষ্টার হ'য়ে, বসল পাটনায়। আমি থাকি বাংলা দেশে, দেখা হয় না। ভেবেছিলুম, বোকু তেমনি সাহেব আছে কিন্তু শুনে অবাক হলুম, যে আইন অমান্য ক'রে সে জেলে গেছে। নিজের জন্যে লজ্জাও হলো, আবার ওর জন্যে হলো গর্ব্বও।

জেল থেকে বেরিয়ে বোকু যা পসার জমিয়ে তুলল, তা প্রত্যাশাতীত। পাটনা থেকে যারা আসত, তারা বলত, বোকু বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, নামে বোকু হ'লে কী হয়। শুনতুম, সে তেমনি দিলদরিয়া, তেমনি মিশুক আছে। বিয়ে করেনি। রোজগার যা' করে তা দু'হাতে ওড়ায়। তার বাড়ীতে নানা জাতের, নানা ধর্মের লোক খায়, শোয়, মাসের পর মাস কাটায়। কাউকে একবার পেলে সে ছাড়ে না। তা তিনি মহাত্মা গান্ধীই হোন বা মিষ্টার জিন্নাই হোন। “আইয়ে হজরৎ, তশরিফ্ লাইয়ে” এই ছিল অনবরত তার মুখে লেগে।

অথচ পলিটিক্সে সে ছিল বামপন্থী। এ কথা সে সভাসমিতিতে স্পষ্টই জানিয়ে দিত। তার সহকর্মীরা ক্ষুণ্ণ হ'লে বলত, “ইণ্টারন্যাশনাল সোশ্যালিজ্ম হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজমের চেয়ে বড়।”

এমন যে বোকু তার এক অতি প্রিয় ইংরেজ বন্ধু ছিলেন, নাম জেনিংস্। তিনি লণ্ডনের এক খবরের কাগজে কাজ করতেন। বোকু তাঁকে বিলেত ছাড়বার আগে আমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল, পরেও অনেকবার এ দেশে আসতে লিখেছিল। তিনি আসবার সুযোগ পাননি। সুযোগ পেলেন এই যুদ্ধের মাঝখানে।

ক্রিপ্‌স্ যখন ভারতবর্ষে এলেন মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে, জেনিংস্ এলেন বিশেষ সংবাদদাতা রূপে। তারপর ক্রিপ্‌সের বিদায়ের পর এদেশে থেকে গেলেন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে। বোকু তাঁকে পাটনায় এনে পুরো পনেরো দিন ধরে রাখল। রাজনীতি সম্বন্ধে তার নিজের বলবার ছিল অনেক।

পাটনা থেকে তিনি কলকাতা গেলেন, কলকাতা থেকে আরো কয়েক জায়গায়। এর পরে পাটনায় ফিরলেন বোকুর কাছ থেকে বিদায় নিতে।

এবার কিন্তু তার ওখানে উঠলেন না, উঠলেন এক ইংরেজের বাড়ী।

বোকু বলল, "কেন, বল তো?"

তিনি বললেন, "আমি কি বলতে বাধ্য।"

বোকু বলল, "না, না, বাধ্য হবে কেন। কাজ নেই বলে।"

তিনি গাঢ়-স্বরে বললেন, "আমার দোষ নেই কিন্তু কার দোষ তাও আমি বলব না। কিছু মনে কোরো না, বোকু।"

"কিছু মনে করব না, ফিল্।"

তাদের দেখাশুনা সমানে চলল। কিন্তু কোথায় যেন খচ্‌খচ্ করছিল। একদিন কথাবার্ত্তায় ধরা পড়ল।

জেনিংস্ বললেন, "তোমাদের নেতারা যে ধুয়ো ধরেছেন, ভারত থেকে চ'লে যাও। সত্যি যদি আমরা চ'লে যাই তখন কী হবে! জাপানকে রুখবে কে?"

বোকু বুঝিয়ে বলল, "জাপানকে রুখতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে চাই দায়িত্ববোধ। নানা কারণে দেশের লোক দায়িত্ব নিতে চায় না। যাতে তারা দায়িত্ব নেয়

সেইজন্যে দরকার দায়িত্বের হস্তান্তর। ভারত থেকে চ'লে যাও বলতে এইটুকুই বোঝায়। এর বেশী নয়।"

"বেশ তো, দায়িত্ব নাও না। কিন্তু দায়িত্ব নিলেই কি দায়িত্ব পালন ক'রতে পারবে? যদি এত সোজাই হতো তবে চীন কেন নাজেহাল হচ্ছে?"

"তাহ'লেও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী।"

"ওসব এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের সময় নেই, বোকু। যারা দায়িত্ব পালন করতে জানে তাদের বিদায় দিয়ে তোমাদের লাভের মধ্যে হবে মাস দু'তিন স্বাধীনতা, তার পরে শো দু'তিন বছর পরাধীনতা।"

বোকু মনে মনে জ্বলছিল। বলল, "কে জানে, হয়তো আমরা শো দু'তিন বছর স্বাধীন থেকে যেতে পারি।"

"আমাদের বিনা সহয়তায়?"

"তোমাদের সহায়তায়।"

"নন্‌সেন্স। আমি ভেবেছিলুম, তুমি একজন রিয়ালিষ্ট।" তিনি রেগে উঠলেন। "চীনের তবু চিয়াং কাইশেকের মতো সেনাপতি আছে। তোমাদের কে আছে?"

বোকু বলল, "পণ্ডিত নেহরু।"

"ওহ্‌। সেই মহা পণ্ডিত।" এমন সুরে বললেন, যেন কোন এক হেডে পণ্ডিতের কথা হচ্ছে। অবজ্ঞার সুর।

বোকু আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না। বলে উঠল, "কই, কোনো দিন তো শুনিনি যে ষ্ট্যালিন রণশিক্ষা করছেন। তা সত্বেও মার্শল ষ্ট্যালিন, মার্শল ষ্টালিন ব'লে তাঁকে করযোড়ে উপাসনা করছেন যাঁরা, তাঁরা কি একবার ভুলেও জেনারেল নেহরু বলতে পারেন না।"

"হা-হা-আ। জেনারেল নেহরুউ।" জেনিংস্‌ ব্যঙ্গ করলেন। "তা হ'লে প্রথম দিনেই পরাজয়। মাই ডিয়ার বোকু, আমি ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিষ্ট।"

বোকু পাল্টা শুনিয়ে দিল, "মাই ডিয়ার ফিল্, আমি রিয়ালাইজ করছি যে তুমি একজন ইম্পীরিয়ালিষ্ট।"

হাতে হাত মিলিয়ে ফিলিপ বললেন, "মাফ কোরো, যদি রূঢ় হয়ে থাকি। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছিনে কী ক'রে তোমরা আমাদের ছেড়ে একটা দিনও বাঁচবে। সেইজন্যে সন্দেহ হয় যে, তোমাদের মতলব জাপানের সঙ্গে রফা করা।"

বোকু হাত ছাড়িয়ে নিল। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "গুড্ বাই।"

কিছুদিন পরে অগাষ্ট মাস এলো। ধরপাকড় সুরু হলো। ধরা পড়ল বোকুও। তার পরে যে সব ব্যাপার ঘটল তার বিবরণ দিয়ে কাজ নেই। শুধু এই বললে যথেষ্ট হবে যে, আমাদের দু'জনের বন্ধু হরদীপ সিং জনতার হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হ'লেন এবং আরো কয়েকজন বন্ধু আর একটু হ'লে সপরিবারে নিহত হ'তেন। তখন থেকে তাঁরা এমন চটে রয়েছেন যে, গান্ধীর নাম শুনলে হিংসার গন্ধ পান ও কংগ্রেসের নাম শুনলে ষড়যন্ত্রের। নেতারা জেলে আছেন বলেই তাঁরা নিরুদ্বেগে আছেন। তবে এ কথাও তাঁরা ব'লে থাকেন যে, ঘাট মেনে ঘরে ফিরে আসাই হচ্ছে সুবুদ্ধির কাজ।

বোকু তো ছাড়া পেয়ে বোকা বনে গেল। করবার নেই কিছু, অথচ সবাই বলে, "কিছু একটা করুন বোকু বাবু।"

বোকুর শরীর ভালোই ছিল, তবু কাগজে ছাপিয়ে দিল যে অনেক রকম রোগ হয়েছে, হাওয়া বদলের জন্যে হিমালয়ে যেতে হবে। যমালয়ের চেয়ে হিমালয় শ্রেয়। তাই তার অনুবর্তীরা চুপ করে।

যাবার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে এমন সময় তার অতিথি হ'লেন, তার এক মুসলমান বন্ধু আলি জমান। তিনি ভারত-সরকারের কোন এক ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, ভারতময় ঘুরে বেড়ান।

আলি যেমন আমুদে লোক বোকুও তেমনি। তিনিও চার দিনের জায়গায় আট দিন থাকলেন, সেও যাত্রার দিন পেছিয়ে দিতে লাগল। মনে

হলো, বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হবে না, আড্ডা দিয়ে ও খানাপিনা ক'রে তার আয়ুপরিবর্দ্ধন হবে।

কিন্তু কপাল মন্দ। ঠিক এমনি সময় গান্ধীজী ক'রলেন অনশন। আর বোকুরও অশনে অরুচি এলো। ওদিকে আলিও আমোদ ভুলে বিমর্ষভাবে বসে থাকলেন। গান্ধীর উপরে উনি যে খুব প্রসন্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু গান্ধী চ'লে যাবেন, ভারতবর্ষ থাকবে, এ কথা কল্পনা করতেই ওর চোখে জল আসে। বোকুকে বলেন, "যতই দোষ করুন, আমরা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারি।"

খালাসের হুকুম যখন হলো না তখন বোকু ভেঙে পড়ল অবধারিত মৃত্যুশোকে। যদিও সে কত বার সন্দেহ করেছে, যে গান্ধী ধনিকদের মিতা, শ্রমিকদের কেউ নয়। আর আলি তার বন্ধুকে ফেলে পাটনা থেকে প্রয়াণ করলেন না। ওকে সঙ্গ দেবার জন্যে আরো কিছু দিন থামলেন।

তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ধূমোদ্‌গার করলেন বোকুর চেয়েও বেশী। এক টিন সিগরেট এক ঘণ্টায় খতম। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত যা বললেন তাতে বোকুর পিলে চমকাল।

"পাকিস্থান। পাকিস্থান ছাড়া উপায় নেই, ইয়ার।"

"ও কথা কী ক'রে আসে?"

"কী ক'রে আসে? আজ যদি হিন্দু মুসলমান এক বাক্যে বলত, গান্ধীজীর মুক্তি চাই, তাহ'লে তাঁকে ধরে রাখত কার এত সাধ্য।"

"বলে না কেন তবে।"

"কেন বলবে। পাকিস্থান পেলে তো বলবে।"

বোকু তো হতবাক্‌।

"তুমি বোধ হয় ভাবছ, মুসলমানরা এমন দুর্দ্দিনেও দর হাঁকে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, তোমরাও ইংরেজের চরম দুর্দ্দিনে দর হেঁকেছিলে—ভারত থেকে চ'লে যাও। পলিটিক্‌সের দস্তুরই এই। কী করা যায়।"

বোকু বলল, "তুমি পলিটিক্সের কী বোঝ? আমরা দর হেঁকেছি, না দশকে বাঁচাতে চেয়েছি, তার উত্তর দেবে ইতিহাস।"

তর্ক বেধে গেল। আলি বলল, "ইয়ে বড়ি আফ্‌শোষকি বাত। গান্ধী মরে যাবেন তবু আমাদের পাকিস্থান দিয়ে যাবেন না, এমন গোঁ। কী ক'রে হিন্দু মুসলমান এক হবে, কী ক'রে ইংরেজদের তাড়াবে। মুঝকো তো মালুম হোতা হৈ কি আজাদী কব্‌হি নেহি মিলেগি।"

"কিন্তু পাকিস্থান নিয়ে তোমরা রাখবে কেমন করে। জাপানীরা যদি এক দিক থেকে আসে, রাশিয়ানরা আর এক দিক থেকে।"

"হাস্ল্যালে, ইয়ার।" আলি হো হো ক'রে হেসে উঠল।

"হিন্দু মুসলমানে যদি মেল থাকে তবে তোমাদের সিপাহীরা আমাদের জন্যে লড়বে, যেমন মার্কিন সিপাহীরা লড়ছে ইংরেজদের জন্যে। মার্কিনরা যদি উত্তর আফ্রিকায় লড়তে পারে হিন্দুরাও পারবে বেলুচিস্থানে ও আসামে।"

বোকু বলল, "তা ঠিক। কিন্তু দেশটাকে দু'ভাগ ক'রলে হিন্দুদের দিল্ যখম হবে। লড়তে ওদের জোর থাকলে তো লড়বে। তোমরা আমাদের দিল্ জান না, ইয়ার।"

তখন আলি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তাহ'লে গান্ধীকে বাঁচাতে পারা যাবে না, আজাদীরও আশা নেই।"

এবার বোকু পুনরুক্তি করল জেনিংস্ যা বলেছিলেন তার। "মাই ডিয়ার আলি, আমি ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিষ্ট।"

আলি উত্তর দিল, "তুমি দেখছি ব্রিটিশ ইম্পীরিয়ালিষ্টদের জুনিয়ার পার্টনার হিন্দু ইম্পীরিয়ালিষ্ট।"

বোকুর ইচ্ছা করল, সীতার মতো বলতে, "মা ধরণী দ্বিধা হও কিন্তু সে একটি কথাও কইল না। কথা কওয়া বন্ধ ক'রে দিল।

বোকু যে সময় আলমোড়া যায় তার মাস কয়েক পরে আমিও। এসব তার কাছে সেইখানেই শোনা। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না,

আমার ছুটি। বোকুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা ভাই, এখনো কি তুমি বিশ্বাস করো যে, মানুষ তার জাতের চেয়ে বড়, তার ধর্মের চেয়ে?"

"বিশ্বাস করতে তো চাই। কিন্তু করতে দেয় কে!" বোকু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। "মানুষ বলে যাদের ভালোবাসতুম তাদের একজন ম্যান নয়, ইংলিসম্যান। আরেকজন ম্যান নয়, মুসলম্যান!" এই বলে সে মুষড়ে পড়ল!

আমার গল্প শেষ হলে বৌদিদি বললেন, "সত্যি আমার মনে হয় স্বাধীনতা কোনো দিন মিলবে না। নইলে এত বড় মন্বন্তর মাথার উপর দিয়ে যায়, আমরা যে অসহায়কে সে অসহায়।"

দাদা বললেন, "চুপ! চুপ!" তিনি জানালার দিকে তাকালেন। তাঁর টিকটিকিকে বড় ভয়।

আমি বললুম, "বৌদি, কোনটা বড় ট্র্যাজেডী বলতে পারো? মন্বন্তর না মনান্তর?"

"নিশ্চয় মন্বন্তর।"

"না, বৌদি; পাঁচ কোটি ইংরেজ আরশ কোটি মুসলমানের সঙ্গে ত্রিশ কোটি হিন্দুর মন মিলছে না। কোনো দিন যে মিলবে তারও লক্ষণ দেখছিনে। ঠিক এমনি মনান্তর থেকেই এসেছে এই যুদ্ধ। বিশ বছর ধরে ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে আগুন জ্বলে উঠল এক দিন। কবে নিববে তাও জানিনে। একটা নিবলেও নিষ্কৃতি নেই, বৌদি। কারণ আরেকটার পূর্ব্বাভাস দেখছি।"

দাদা শিউরে উঠলেন!

বৌদিদি বললেন, "তুমিও যেমন।"

"থাক, বৌদি। আপনাদের সুখস্বপ্নে বাদ সাধব না। কিন্তু আমার বন্ধুর সুখস্বপ্ন ভেঙেছে! সে এখন প্র্যাকৃটিসে মন দিয়েছে বটে, কিন্তু ভুলতে পারছে না যে মানুষ কোথাও আছে। আছে শুধু ইংলিসম্যান, মুসলম্যান, জারম্যান, ব্রাহ্মম্যান। কোনটা বড় ট্র্যাজেডী, মানুষের অন্তর্দ্ধান, না মানুষগুলোর মৃত্যু?"

বিকলন



শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

একটা দিনের কথা বেশ ভালভাবে মনে করতে পারে ফাইম মণ্ডল;—কাদের যেন মোকদ্দমায় সাক্ষী সেজে গিয়েছিল বড় নগরের নকল করে তৈরী করা ছোটখাটো রকমের কোনো মহকুমায়। এক জন লোক বোধ হয় বেদে, সাপ খেলাচ্ছিল বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে। ইয়া লম্বা লম্বা সাপ—বিষাক্ত কি না ফাইমের আজ আর তা' মনে পড়ে না, শুধু ভয় দেখাবার কেমন যেন চমকালো দ্যোতনা নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সাপগুলো; ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের মাঝখানেও. সাপগুলোর জুগুপ্সিত নড়া-চড়া;—একটা অভিনব চেতনার মধ্যে আজো সে কথা ফাইম মণ্ডলের মনে পড়ে।

ছেলে বয়স তখন ফাইম মণ্ডলের। পরের জমিতে বাপ, দাদা চাষ করে বেড়ায়—সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় ফাইমকে, খুচরো কাজের সাহায্য করবার জন্যে। টুকিটাকি এটা ওটা বিরক্তিকর ছোট রকমের অনেক কাজ করতে হতো ফাইমকে। তখনকার সেই সব দিনের কথা স্পষ্টভাবে আর মনে পড়ে না ফাইমের। শুধু যা' মনে আছে সেই সাপওয়ালাকে—মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, গেরুয়া না বাদামী রঙের ঢোলা কামিজ পরা—গায়ে লম্বা লম্বা সাদা-কালোর চাকা চাকা দাগ সাপ খেলাচ্ছিল সে—কেমন দু'নলা বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে। যাদের মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবার জন্যে ফাইমকে সেই মহকুমার উপনগরের ভিড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ভয়ে সব ভুল করে সে নাকি তাদের কেস ফাঁসিয়ে

দিয়েছিল—আবছা আবছা তার সেকথাও মনে আছে। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে সেই সাপুড়েটাকে, চোখের ওপর যেন তার চেহারাটা ভাসছে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাইম সাপ খেলানো দেখতে লাগলো, চাকা চাকা ডোরাকাঁটা মসৃণ অথচ কালো সাপগুলোকে দেখতে ভয় লাগে, কিন্তু বাঁশীর সুরের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে নৃত্যশীল ভঙ্গীটি ফাইমের ভারি ভালো লেগে গেল। একটুখানি সামনের দিকে সরে এসে দাঁড়ালো সে—ভয়-ডর বিসর্জ্জন দিয়ে।

চেহারার দিক থেকে ফাইমের সৌন্দর্য্য বা লালিত্যের কোনরকম কিছু বলবার ছিল না। কালো পাথরে খোদাই করা নীরেট মূর্ত্তির মত ফাইম মণ্ডল, মাংসপিণ্ডও সবল ছিল। শুধু মিট মিট করা সুগোল এবং ছোট ছোট চোখ দুটি আর হাত-পায়ের অতি সংক্ষিপ্ত সঞ্চালন ছাড়া তার জীবন-স্পন্দন বোঝা যেত না।

সাপুড়ে বেদেটি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ফাইমের দিকে। খেলা শেষ হয়ে গেছে, তবু এই ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সাপুড়ে বোধ হয় বলেছিল,—কি চাও খোকা? দেব সাপ ধরিয়ে? ইয়া লম্বা সাপ—ফট করে কামড়ে দেবে।

নিশ্চল ফাইম মণ্ডল তার সরল চোখ দু'টো নির্ভয়ে তুলে ধরেছিল সাপুড়ের দিকে। হয়তো অনুরোধ করেছিল, দাও না আমাকে সাপ খেলানো শিখিয়ে। জল-ঢোঁড়া সাপ খেলা শিখিয়ে। তারপর তোমার মতন অমন বড় বড়—অমন কালো কালো সাপ খেলা শিখিয়ে। খুব ভালো সাপ খেলাতে পারি যেন।

ফাইমের এইটুকু শুধু মনে পড়ে। ভিজে স্মৃতির আবছা ছায়ার মত মনে হয় সাপুড়েকে, সাপুড়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম প্রবাহকে। এর চেয়ে খুব বিশদভাবে ফাইম কিছু মনে করতে পারে না।

তিন বছর কিংবা আরো কিছুকাল পরে ফাইম ফিরে এল নিজের গাঁয়ে। ইতিমধ্যে সাংসারিক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে অনেক। বুড়ী-মাকে পেছনের

বাগানে বাঁশ ঝাড়ের পশ্চিমে মাটির তলায় শোয়ানো হয়েছে, দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে। পরের জমিতে চাষ করবার আর দরকার হয় না এখন। লাঙ্গল দিয়ে বছরের ধান জোগাড় করবার মত নিজেদের জমি জোটাতে পেরেছে দাদারা। মোটের ওপর ফাইমকে ছেড়ে দিয়েও তো এদের সংসার বেশ চলেছে। শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যও এসেছে অল্প বিস্তর।

দাদা জিজ্ঞাসা করলো,—কোথায় ছিলিরে ফৈম এতদিন? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, অসুখ করেছিল নাকি খুব?

ফাইম বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চেয়ে রইল। কিছু বিস্ময়, কিছু বেদনা এসে জমা হল সে চোখে। মনে হল একবার উচ্চকিত স্বরে সে কেঁদে ওঠে। কিন্তু তারুণ্যের লঘুতাকে দূরে ফেলে ফাইম সজীব হয়ে উঠলো। সে বললে,—সাপ খেলা শিখতে গিছলুম। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সাপ ধরার মন্ত্র শিখেছি—যে সাপই কামড়াক না কোনো লোককে—ঠিক আমি তাকে সারিয়ে দেব। আর আমি যা ইচ্ছা করবো—তাই করতে পারি। যেমন ধরো কারুর কোনো অসুখ করলো, তা' আর সারবে না কোনো দিন···এমন মন্ত্র দিতে পারি—সেই অসুখকে চিরকাল ধরে রাখতে পারি।

দাদা চমকে উঠলো,—চুপ কর তুই ফৈম! এমন সব কথা বলতে নেই। মন্ত্র শিখে কোনো লোকের কখনো সর্ব্বনাশ করে? কখনো তা' করতে নেই।

সে কথা ঠিক—সর্ব্বনাশ করবার কেমন যেন নিস্প্রাণ চেতনায় ফাইমের মনটা অস্থির হলেও, তার ওপর নিষেধ আছে গুরুর, কখনো যেন সে এ ধরণের সর্ব্বনাশ কোনো লোকের না করে—সাপুড়ে গুরুর কাছ থেকে এই মর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছে। কাজেই বাজে কথা নয়—তাছাড়া ফাইমের মনে পড়লো—যেদিন ফাইম এরকম দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, সেদিন সে তার জীবনের ওপর অভিশাপ নেবে; কখনো এ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করলে, কিংবা ভাবলে পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। যাক সে সব।

খাপছাড়া অনুভব, সুখ-দুঃখ বোধ, আশ্চর্য্য চেতন,—সব অতিক্রম করে ফাইম দাদাদের সংসারে মিশে গেল।

আজ একে সাপে কামড়ায়, ফৈমের ডাক পড়ে—সে ছুটে যায়। আধঘণ্টা বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, নানারকম কসরৎ করে—লোকটা উঠে বসে। কত রকমের তুকতাক করতে হয় তাকে। কখনো বা দংশনকারী সাপ আসে—আশ্চর্য্য বানিয়ে দেয় ফাইম সবাইকে। কেউ কেউ বা সাপ নিয়ে ফাইমের খেলা দেখে যায়, সন্তুষ্ট হয়ে দু'চার পয়সা বখশিসও দেয় কেউ।

প্রতিবার ফাইমের মনে হয়েছে—গুরুর নিষেধের কথা। নৈলে ঐ যে ভিখারীটা পায়ের ঘাকে সযত্নে সতেজ করে রেখে সহরে চলে যায় রোজ ভিক্ষা করতে, ওর ঘাকে চিরকালের জন্যে ফাইম যেমন অবস্থায় আছে, তেমনি করে ধরে রাখতে পারে। দাদার হাত কেটে গিয়েছিল কাস্তের সরু ফলায়, ফাইমের মনে হল যে-কোনো মুহূর্ত্তেই সে দাদার হাতখানাকে চিরদিনের মত পঙ্গু করে রাখতে পারে। অনেক কষ্টে, অনেক ছটফটানি আর অসম্ভব যন্ত্রণার পর সে যাত্রায় দাদার হাতখানা বেঁচে গেল।

আশ্চর্য্য, অত্যন্ত সঙ্গোপনের সঙ্গে ফাইম শিখে নিয়েছে এই মন্ত্র। সর্ব্বনাশ করবার এই রকম মন্ত্র। এখনো পর্য্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত তার মনে জমা হয়নি। বিশেষ করে তার চেতনায় এজন্যে কোনো অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়নি। একবার ফাইমের মনে হয়েছিল, একটা পশুর কোনো একটা অঙ্গকে আহত করে সে তার শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়, কিন্তু মনের কারুণ্যের দিকটায় বিশ্রীরকম একটা বেদনা অনুভব হয়েছিল, কেমন যেন মায়া—বড় বেদনাময় অনুভব—যেটা মোটেই ওস্তাদসুলভ মনোবৃত্তি নয়। সুতরাং সে ধরণের সুযোগ জুটিয়ে নেবার প্রবৃত্তিকে দমিয়ে ফেললে ফাইম।

নিজের মনেই ফাইম মণ্ডল মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। সোজাভাবে

অত্যন্ত সরলভাবে সে মনে করতে পারে, যে এ রকমের কোনো মন্ত্রই সে জানে ;—তা' হলেই তো ব্যাপারটা চুকে যায়।

দাদাকে সে বললে,—তোমরা অমন করে রোজা রোজা বলে ডেকো না আমায়। আমি সব মন্ত্র ভুলে যেতে চাই। এই সব মন্ত্র শিখে আজকাল খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমি, আমি—

দাদা হেসে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন রে, কি আবার হল তোর, ফৈম ?

ফাইম অত্যন্ত সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগলো—যখনই কোনো কাটা ঘা, পোড়া ক্ষত দেখি—মনে হয় চিরকালের মত ওটাকে স্থায়ী করতে যখন পারি আমি, দিই তাই করে। মনটা খুব খারাপ হয়ে ওঠে। মন্ত্রের দু'একটা বর্ণ পর পর মনে পড়তে থাকে, ঠোঁটে এসে যায় হড়কে। চাপতে যাই, কাণ-মাথা গরম হয়ে যায়। আমি এ সব যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চাই, মুক্ত হতে চাই মনের এমন ধারা কষ্ট থেকে। তাই মন্ত্র-তন্ত্র সব ভুলে যেতে চাই। আমিও মাঠে যাবো তোমাদের সঙ্গে, কাস্তে হাতে, লাঙলের ফলা কাঁধে। মাঠে চাষ করবো, দুঃখে-সুখে দিন গুজরাণ করবো তোমাদেরই মত। সেটা খুব ভালো। আমি আর এ সহ্য করতে পারছি না!

দাদা বললে,—তুই যে বলিস, ওই মন্ত্রটা তোর খাঁটি কি না—তা' তুই নিজেই জানিস না। তাই বলি—যখন জানিসই না, তখন মনে কর ওটা একদম মিথ্যে কথা। মন্ত্র কখনো অমনধারা হয় ?

ফাইম বেশ উত্তেজনার সঙ্গে বললে,—সেই জন্যেই তো আমার কেবলই মনে হয়, দেখি পরীক্ষা করে আমি জানি কি না। কিন্তু পাছে কারুর খারাপ হয়ে যায়—তাই চেপে যাই, ক্ষেপে উঠলেও রুখে যাই মনকে। মনের কষ্ট চুপি চুপি সহ্য করি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি খুবই সহজ ? খুবই অনায়াসলব্ধ ? মনকে শক্ত করতে গিয়ে সে যেন নিজেকে আরো হাল্কা, আরো বেশী পরিমাণে লঘু করে দিয়েছে। পাগল হয়ে যাবে না কি সে ? ফাইম চোখের ওপর দেখেছে কত বিভিন্ন

রকমের ক্ষত। কারুর কাটা ঘা, পুঁজ-রক্ত ঝরা তাজা টাটকা ঘা, পোড়া দগদগে ঘা—আরো জঘন্যতর, আরো নোংরা কত রকমের ক্ষত, কত কি। ফাইমের যখনই এ সব চোখে পড়ে, তখন কেমন যেন একটা বিমর্ষ যন্ত্রণার অভিভারে সে কাতর হয়ে ওঠে। যন্ত্রণাটা ঠিক মনে নয়, মনের কোনো বিশেষ অংশে নয়, অন্তরের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমানায় তো নয়ই—রক্ত সঞ্চালনেও নয়, তার চেতনার সঙ্গে কেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বলে বোধ হয়।

মাঠ থেকে সন্ধ্যার পর অন্ধকার পথ বেয়ে আসবার সময় ফাইম অনুভব করলে, তার পায়ে কি যেন ফুটে গেল। বাড়ীতে এসে প্রাথমিক সেবা চললো। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, পা-টা বেশ ফুলেছে। তার পরদিন ব্যথা বিশেষভাবে জেঁকে বসলো, অসম্ভব বাড়তে লাগলো! এরও দু'দিন পরে ধরতে আরম্ভ করলো পাক এবং সুরু হল ভেতরে ভেতরে পচন।

টোট্‌কা ওষুধ চললো। কবিরাজীর পর এল ডাক্তার। কাঁটাটা ভেতরে রয়ে গেছে বোধ হয়, তাই এত দুর্ভোগ। ছুরি বসিয়ে পায়ের কাঁটাটা টেনে বের করলেই আপদ চুকে যাবে। মাত্র পাঁচটা মিনিট কষ্ট সহ্য করতে হবে বৈকি। ফাইমের ততক্ষণ ওই আকাশের কোণে উড়ে যাওয়া চিলটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে। চিলটা ডিগবাজী খাচ্ছে কেমন! চিলেরা অমন উল্টেপাল্টে বিচরণ করে শূন্যে। মনটা খুসী হলেই তারা ডিগবাজী খায় অমন। পাখীর জাত বলে কি খুসীর অনুভব প্রকাশ করতে নেই—উঃ! ব্যস, ছুরি বসানো শেষ হয়ে গেছে ফাইমের পায়ের ওপর।

কাঁটা একটা পাওয়া গেল অনেক খোঁজাখুঁজির পর। সাপের শিরদাঁড়ার ভাঙা কাঁটা—কি সাপ তা' কে জানে। চিতি হতে পারে, হেলে, কেউটে, গোখরো কিংবা চন্দ্রবোড়া। ডাক্তারের কমপাউণ্ডার সঙ্গে ছিলেন, ঘা-টা ধুইয়ে বেশ করে বেঁধে দিলেন।

দাদা বললে,—দেখিস ফৈম, তুই যেন তোর সেই মন্ত্রটা আবার আওড়ে বাহাদুরি দেখাতে বসিস নি।

তাইত! অকস্মাৎ চমকে উঠলো ফাইম মণ্ডল। কিন্তু না, না, না। তার নিজের দেহে বিষাক্ত ঘা পোষণ করবার মন্ত্র সে আওড়াতে পারবে না। কিসের মন্ত্র? কিছুতেই তা' সে আবৃত্তি করতে পারবে না মনে মনে! অথচ তার যেন মনে পড়ে যাচ্ছে সব অক্ষরগুলো একটির পর একটি। সর্ব্বপ্রথম নিজের দেহ বন্ধন করে নিতে হয়।

ফাইম সচেতন হল। কি করতে চলেছে সে? বার বার অন্য চিন্তা-প্রবাহে তার মনন-প্রক্রিয়া বইয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। মন্ত্র, কিসের মন্ত্র? অনেক অমন অবস্থাকে সে দমন করেছে, আরও বৃহত্তর প্রলোভনকে দিয়েছে সে চূর্ণ করে আর সে কিনা এখন নিজের দেহের ক্ষতকে পোষণ করবার বিকৃত বাসনার গতিতে ডুব দিয়ে নিজের মনের সমস্ত শক্তিকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে!

তার চেয়ে সে মনে করুক, গভীর কোনো জঙ্গলে এক দুর্দ্দান্ত সিংহের সামনে পড়েছে সে, ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সামনে পড়েছে! ভয়ে কাতর হয়ে উঠলো ফাইম মণ্ডল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হলে চলবে না। উলটো লাফ দিয়ে সে বনের একদিকে একটা স্বল্প উঁচু গাছের ওপর উঠবার চেষ্টা করলো। সিংহটা ফাইমের এই চালাকিটুকু বুঝতে না পেরে ঠকে গেল। সিংহটাও এক লাফ দিলে ফাইমের দিকে থাবা বাড়িয়ে কিন্তু ফাইমকে নাগালের মধ্যে পেল না, একটুর জন্যে বেঁচে গেল। শুধু পায়ের কিছু জায়গায় নখের আঁচড় বসিয়ে দিয়ে গেল। সেই আঁচড় থেকে হল ঘা আর সেই ঘায়ের ওপরে ফাইম মন্ত্র পরীক্ষা করে দেখবে তার সেই মন্ত্র সত্যি কি না; পরখ করবার এমন সুযোগ সে হাত ছাড়া করবে না। প্রথমে সে নিজের দেহ বন্ধন করে নেবে। দেহ বন্ধের পর, গুরুকে প্রণাম করে আরম্ভ করবে আসল মন্ত্র। বেশ মনে পড়ে যেতে লাগলো তার মন্ত্রের বাণীগুলো। আশ্চর্য্য, একটি অক্ষরও ভোলেনি তো ফাইম মণ্ডল। স্মৃতি-শক্তিকে তারিফ করতে হয়। সব মনে পড়ছে—সমস্ত কথাগুলো।

সচেতন হয়ে ফাইম মণ্ডল চীৎকার করে উঠলো,—না, না, আমি জানি না! জানি না কোনো মন্ত্র। আমি কিছু জানি না! বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো,—মন্ত্র এড়াবার জন্যে সিংহের মুখে পড়ে নিজেকে বিপন্ন ভাবার মধ্যেও সেই মন্ত্র! নিজের দেহ বন্ধনের পর, গুরুকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে দক্ষিণ মুখ হয়ে সেই মন্ত্রোচ্চারণ! ফাইম অভিভূত হয়ে গেল। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, কঠিন হয়ে বিস্ফারিত চোখে সে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে যেন আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে পায়ের ঘাও পুড়ছে দাউ দাউ করে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ফাইম মণ্ডল।

এর পরের বার ডাক্তার এসে জানিয়ে গেলেন, ফাইমের ঠ্যাংটা আর সারবে না, বিষিয়ে গেছে!

গাঁজার ধোঁয়া

সম্বুদ্ধ

শাস্ত্রে বলে, মহাদেবের জটা হইতে ভঙ্গ বৃক্ষের জন্ম। চলতি ভাষায় ইহার নাম ভাঙ্। ভাঙের পাতা বাটিয়া খাইলে তাহাকে বলে সিদ্ধি। ভাঙের গাছ চিরিয়া যে রস বাহির হয়, তাহার নাম চরস। ভাঙের ফুল পোড়াইয়া ধোঁয়া খাওয়া হয়, তাহার নাম গঞ্জিকা বা গাঁজা।

এই গাঁজার অভিনব ক্ষমতার কথা সকলেই জানেন—খাইয়া বা শুনিয়া। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার মতে গাঁজার প্রভাব হয় সমস্ত স্নায়ু-কেন্দ্রের উপরে। গাঁজা খাইলে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয়, তাহার ফলে মানুষের কর্ম্ম-শক্তি বাড়ে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ কল্পনাবাহী শিরাকে উত্তেজিত করা। গাঁজার ঝোঁকে মানুষ অসম্ভব স্বপ্ন দেখে, দুঃসাধ্য কর্ম্মে অনায়াসে সংকল্প করিয়া বসে। গাঁজা মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, স্বর্গে তোলে, হয়তো আবার নরকেও ডুবায়। কেবল তাহাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনকে ছাড়াইয়া সমষ্টি ও রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ লইয়া পর্য্যন্ত টান লাগাইবার শক্তি সে রাখে। ভণ্ডুল বাধাইবার ক্ষমতা অসীম বলিয়াই গাঁজা ধ্বংসের দেবতা মহাদেবের প্রিয় সামগ্রী।

আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাস করি। আমাদের মত এত বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার ইতিহাস। দিকে দিকে তাহার বিজয় অভিযান অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাকে বাধা দিবার সামর্থ্য কাহারও হয় নাই। অথচ এই

জয়যাত্রার পথেও একবার অন্তত বাধা পড়িয়াছিল আর সে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল এই গাঁজার ধোঁয়া। হয়তো সে বাধা একান্তই ক্ষণিকের। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার গুরুত্বও হয়তো বেশী নয়। তবুও এমন ঘটনা পৃথিবীতে বেশী ঘটে নাই বলিয়াই ইহার বৃত্তান্তটা মনে করিয়া রাখিবার মত।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই ঘটনাটি ভারতবর্ষের। অথচ আমরা ইহার সন্ধান রাখি না। তাহার কারণ, বহুকাল এই কাহিনীটি সরকারী দপ্তরখানায় প্রাচীন নথি-পত্রের তলায় চাপা পড়িয়াছিল। সম্প্রতি ভারত-সরকারের 'হিষ্টরিকাল রেকর্ডস' দপ্তরটি ভারতীয়দের আয়ত্তে আসিয়াছে, তাহারই ফলে এই কাহিনীটির পুনরাবিষ্কারও সম্ভব হইরাছে। এই চমকপ্রদ ঘটনার বৃত্তান্ত এতকাল লোক লোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। এখন যে ইহাকে আবার নূতন করিয়া প্রকাশ করা গেল, ইহার দরুন কৃতজ্ঞতা সমস্তখানিই প্রাপ্য 'হিষ্টরিকাল রেকর্ডস' কমিশনের।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়; ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নোট জাল করিয়াছেন। তখনকার আইন অনুসারে জালের অপরাধে মৃত্যু দণ্ড হইতে পারিত। এই অভিযোগ প্রমাণ করিয়াই নন্দকুমারকে প্রাণ দণ্ড দেওয়া হয়। সত্যই তিনি জাল করিয়াছিলেন কিনা এবং সত্যই তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুবিচার হইয়াছিল কিনা ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। সে তর্কাতর্কির আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা, ইংরাজের প্রভাব বিস্তারের পথে নন্দকুমার বাধার সৃষ্টি করিতে ছিলেন, ইংরাজ দরবারে অসন্তুষ্ট হিন্দুরা নন্দকুমারকে ঘিরিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। অতএব যে প্রকারেই হউক, তাঁহাকে অপসারিত না করিলে চলিত না।

নন্দকুমারের বিচারের গুরুত্ব যদি এতখানি হয়, তবে কোন কারণে সেই

বিচারে বাধা পড়িলে তাহার গুরুত্বও সহজেই অনুমেয়। এইরূপ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল গাঁজার ধোঁয়া। সেই কাহিনীটিই আমি বলিতেছি।

ডালহাউসি স্কোয়ারে এখানে সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাড়ী। (পুরানো কারেন্সি অফিস) তাহার সমরেখায় প্রায় পাঁচ শত গজ পূর্ব্বদিকে সরিয়া তখন কুমার রাজারাম রায়ের বৃহৎ প্রাসাদ ছিল। রাজারাম, নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জ্ঞাতি বংশ, 'কুমার' ইঁহাদের বংশ পদবী।

তখনকার দিনে এদেশী অভিজাত বংশীয়েরা অনেকেই জীব-জন্তু পুষিতেন। কেহ ঘোড়া রাখিতেন, কেহ বা পারাবত পুষিতেন। ইহাদের মধ্যে রাজারাম রায়ের পশুশালা ছিল অতি বৃহৎ। আলিপুরের বাগান তখনও হয় নাই। রাজারাম রায়ের মত এত বড় পশুশালা বাংলা দেশে তো আর ছিলই না, সমগ্র ভারতেও বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। বাঘ, সিংহ, ভালুক হইতে আরম্ভ করিয়া সাদা ইঁদুর, খরগোস পর্য্যন্ত এবং ময়ুর, রাজহাঁস হইতে টিয়া, মুনিয়া, বুলবুল—এমন পশু বা পক্ষী ছিল না, যাহা এই পশুশালায় মিলিত না। কিন্তু বিশেষ করিয়া রাজারামের ঝোঁক ছিল বিভিন্ন প্রকার বানর ও হনুমানের উপর। রাজারাম নিজে রাম-ভক্ত ছিলেন; তাই রামের অনুচর বানর তিনি নিজের বাড়ীতে সযত্নে পালন করিতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে তাহাদিগকে খাবার দিতেন, বীরাষ্টমীতে তাঁহার প্রাসাদে মহা ধুম-ধামে মহাবীরের পূজা হইত। প্রাসাদের একটী মহল লইয়া তাঁহার পশুশালা। দ্বিতলের প্রায় সমস্তটাই ছিল বানরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার যে সময় আরম্ভ হয়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে রাজারাম রায়ের আর্থিক অবস্থা হঠাৎ খারাপ হইয়া পড়ে। তাঁহার বড় সম্পত্তি ছিল নদীয়া ও চব্বিশ পরগণায় কতক লইয়া একটা বড় চর। নদীর ভাঙ্গনে এই চরটা অতি অল্পদিনের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। পশুশালার দরুণ তাঁহার ব্যয় ছিল অত্যাধিক; অথচ অনটনে পড়িয়াও পশুশালা ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। প্রাসাদের লাগাও কয়েক বিঘা জমি

লইয়া তাঁহার ফুলের বাগান ছিল, বাধ্য হইয়া এই জমিটাতে তিনি ভাড়া বসাইলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক পশুশালার সংলগ্ন জমিটা ভাড়া লইল আলি খাঁ নামক একজন পাঞ্জাবী পাঠান। সে এইখানে তামাক, ভাঙ, গাঁজা, চরস প্রভৃতির আড়ত করিল। তখন পর্য্যন্ত সরকারী আবগারী বিভাগ ভাল করিয়া স্থাপিত হয় নাই, আইনেরও তত কড়াকড় ছিল না। সমস্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় আলি খাঁর প্রায় একচেটিয়া ছিল। তাহাঁর আড়তে সর্ব্বদাই শত শত মণ মাদক সঞ্চিত থাকিত।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার যেদিন শেষ হইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে আলি খাঁর আড়তে আগুন লাগে। তখন দমকল ছিল না; লোকজন যাহারা জুটিল, তাহারা প্রাণপণ চেষ্টাতেও আগুন নিবাইতে পারিল না। গাঁজা ও চরসের ধোঁয়ায় বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার কাছে যায় কাহার সাধ্য!

আলি খাঁ সেই অগ্নিকাণ্ডেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। লোকজনেরা দূরে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। আলি খাঁ উন্মত্তের মত বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওদিকে প্রাসাদে রাজারাম রায়ও হাহাকার করিতে লাগিলেন। বাতাসে বাহিত হইয়া পুঞ্জীকৃত ধূম পশুশালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে, পশু-পক্ষীদিগকে রক্ষা করার আর উপায় নাই। অবশেষে প্রাসাদের এক গঞ্জিকাপায়ী ভৃত্য সাহস করিয়া সেই ধূম ঠেলিয়া পশুশালায় প্রবেশ করিল এবং যতদূর সাধ্যে কুলাইল, খাঁচা ও ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া আসিল। ধোঁয়ার আক্রমণটা দ্বিতলেই অধিক হইয়াছিল। শত শত বানরের অনেকেই তখন অজ্ঞান, বাকিগুলি দ্বার খোলা পাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

সে রাত্রে আর তাহাদের উদ্দেশ হইল না। হইল পরদিন সকালে।

তখন সরকারী অফিস, আদালত প্রভৃতিতে সকাল বিকাল কাজ হইত। মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের শেষ দিন, রাত্রি শেষ না হইতেই সুপ্রীম কোর্টের আশে পাশে লোকের ভিড় জমিয়াছে। আদালতের সময় হইল, গোরা

সৈন্যের পাহারা বসাইয়া বিচারপতিগণ, সাক্ষী ও আসামী আদালতে উপস্থিত হইলেন! আদালত গৃহের দ্বার খুলিয়া দেখা গেল, অদ্ভুত কাণ্ড। আদালত গৃহের সমস্ত আসন পূর্ণ করিয়া সারি সারি বানর ও হনুমান গম্ভীর মুখে বিলাতী কায়দায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে।

এই বানরেরা গত রাত্রির পলাতক, রাজারাম রায়ের পশুশালার জীব। গাঁজার ধোঁয়া মস্তকে ঢুকিয়া ইহাদের কি প্রকার ভাবোৎপত্তি হইয়াছিল, বলা কঠিন; রাতারাতি জানালা বাহিয়া বাহিয়া ইহারা আসিয়া সুপ্রীম কোর্ট দখল করিয়াছে। সাক্ষীর কাটগড়া, ব্যবহারজীব ও দর্শকের আসন—কোথাও আর স্থান নাই। কেবল আসামীর কাটগড়াটি শূন্য। হয়তো অজ্ঞাত সংস্কার-বশেই সেখানে কেহ বসে নাই।

বিচারকদের দেখিয়া চক্ষু স্থির। মহামান্য আদালতের অবমাননা যাহা হইবার তো হইয়াছেই, এখন বিচার চলে কি করিয়া! তাঁহারা আদেশ দিলেন, ইহাদের তাড়াইয়া আদালত খালি কর—

গোরা প্রহরীরা বানর তাড়াইতে অগ্রসর হইল। প্রথমে দূর হইতে করতালির কোলাহল, তারপর লাঠি ও সঙিন দিয়া খোঁচাইবার ভঙ্গি করা, কলা প্রভৃতি খাদ্য ছড়াইয়া লোভ দেখানো—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বানরেরা যে যাহার আসনে স্থির বসিয়া খালি চাহিয়া চাহিয়া দেখে আর মুখ ভ্যাংচায়। ইতিমধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আদেশ করিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম হইতে কামান লইয়া আইস।

ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থিত সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন স্যার গড্ ফ্রে-হেজ। তিনি কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া নিজেই চলিয়া আসিলেন। সুপ্রীম কোর্টের দুইটি দরজাতেই কামান বসানো হইল। হেজ স্বয়ং দ্বারে দাঁড়াইয়া বানরদের শেষবার সতর্ক করিয়া দিলেন,—পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হইতেছে, ইহার মধ্যে তোমরা আদালত গৃহ ছাড়িয়া যাও। নইলে তোমাদের

মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী হইব না। পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হইলেই আমি গোলা চালাইবার আদেশ দিব।

হেজ সাহেব ঘড়ি খুলিয়া সময় গণিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, পনেরো মিনিটও যায়—অথচ একটি বানরও জায়গা ছাড়িয়া নড়িয়া বসে না।

সাহেবের ইংরাজী কথা বানরেরা হয়তো বুঝিতে পারে নাই। এই মনে করিয়া, দোভাষীর দ্বারা বাংলা, উর্দু করিয়া কথাটা তাহাদের বলা হইল, কিন্তু ফল ফলিল একইরূপ। বানরেরা যে সাহেবের কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিয়াছে বা সে কথা পালনের জন্য তাহাদের তিলমাত্র মাথা ব্যথা আছে, এমন কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। হেজ সাহেব ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি মিলিটারি মানুষ, সোজা কথা বোঝেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, গোলা চালাইবার হুকুম দেই?

হেষ্টিংস সম্মতি দিলে সেদিন একটা বিপর্যয়কাণ্ড ঘটিত। কিন্তু তিনি সম্মতি দিলেন না। প্রধান বিচারপতিও আপত্তি করিলেন। কামান চালাইলে কেবল বানর মরিবে না, সেই সঙ্গে আদালত গৃহও ধূলিস্মাৎ হইবে। ব্রিটিশ সরকারের সুপ্রীম কোর্ট ভাঙ্গিবার আদেশ দিবে কে? আর ভাঙা বাড়ী যদি বা পরে আবার বানানো যায়, উপস্থিত এখন আদালত ভাঙিলে বিচার শেষ হয় কেমন করিয়া?

ঘটনা সেদিন কোন পথে গড়াইত, তাহা বলা শক্ত; রক্ষা করিল ওয়ারেন হেষ্টিংসের একটি বক্রোক্তি। প্রহরী বেষ্টিত মহারাজ নন্দকুমার ধীরভাবে একপাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া হেষ্টিংস মুখ বিকৃত করিলেন। তিক্ত-স্বরে কহিলেন, মহারাজ বুঝি অবশেষে রামচন্দ্রের শরণ লইয়াছেন? বানর সেনার সাহায্যে বাঁচিবেন!

বিলম্বিত বিচারের প্রহসনে তেজস্বী নন্দকুমার শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হেষ্টিংসের শ্লেষবাক্য তাঁহার সর্বাঙ্গে আগুণ ধরাইয়া দিল। ধীর স্বরে তিনি

কহিলেন—সাহেব, নন্দকুমার বানরের সাহায্যে প্রাণ বাঁচায় না। আমাকে সময় দিন, আমিই বানর তাড়াইয়া দিতেছি।

এরপর নন্দকুমারের বিশাল দুইটি চক্ষু জনতার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া অবশেষে এক ব্যক্তির মুখের উপর গিয়া স্থির হইল। তাহাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া নন্দকুমার বলিলেন, তুমি যেরূপে পার বানর তাড়াইয়া দাও, আমার সম্মান রক্ষা কর।

এই ব্যক্তির নাম শিউলাল মিশ্র, নন্দকুমারের বিশ্বস্ত পাচক। বিহারের আরা জিলায় দেওহার গ্রামে ইহার জ্ঞাতীরা এখনও বাঁচিয়া আছে। মহারাজ নন্দকুমার নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণ। আদালতে তিনি অপর লোকের হাতে জলটুকুও গ্রহণ করিতেন না। সেইজন্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নির্বন্ধক্রমে শিউলাল আদালতেও তাঁহার সহিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। নন্দকুমারের জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত যে কয়জন লোক রাজ-রোষ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিল, শিউলাল তাহাদের অন্যতম।

শিউলাল সেদিন যে উপায়ে আদালতের মর্য্যাদা রক্ষা করিল, তাহা সে নিজে মাথা খেলাইয়া বাহির করিয়াছিল, না মহারাজই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিবার এখন আর উপায় নাই। কিন্তু এই উদ্ভাবন যাহারই হউক, যে বুদ্ধি খাটাইয়া সে কাজ উদ্ধার করিল, তাহা যেমন আশ্চর্য্য, তেমনই অশ্রুতপূর্ব্ব!

নন্দকুমারের কথা শুনিয়া সে এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। তারপর মুখ তুলিয়া হেষ্টিংসকে বলিল—সাহেব, আমার মিনতি, আর আধ ঘণ্টাকাল আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করুন, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। বলিয়া সে দ্রুতপদে আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল।

সত্যই সে কিছু করিতে পারিবে—একথা হয়তো হেষ্টিংস বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তখন আর অপেক্ষা না করিয়াই বা করিবেন কি? তিনি গোলন্দাজদের বলিলেন—তোমরা অপেক্ষা কর, দেখা যাক।

শিউলালের কথা ব্যতিক্রম হইল না। আধ ঘণ্টারও কম সময়ে আদালতের দ্বারে একখানি বন্ধ গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার ছাদে চালক, পার্শ্বে বসিয়া শিউলাল। গাড়ী থামিতে না থামিতে শিউলাল লাফাইয়া পড়িল, তারপর দ্রুতহস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনটি নব যুবতী মেম গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

আদালত হইতে শিউলাল সোজা আর্মানিটোলায় ছুটিয়াছিল। ঘণ্টায় জনপ্রতি দেড় টাকা হিসাবে মোট সাড়ে চার টাকায় এক ঘণ্টার জন্য সে মেমেদের ভাড়া করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

মেমেদের কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে শিউলাল পথেই তাঁহাদের তালিম দিয়া আনিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহারা সোজা গিয়া আদালতের মধ্যে ঢুকিলেন, বিস্মিত জনতা ত্রস্তে সরিয়া পথ করিয়া দিল।

আদালতের দ্বার পার হইয়া মেমেরা আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের পিছন পিছন শিউলালও ঢুকিয়াছিল। তাঁহারা দাঁড়াইতেই সে হাঁকিয়া বলিল, হতভাগা ব্যাটারা, মেমসাহেবদের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছিস?

তাহার এই অতর্কিত চীৎকারে বানরেরা চমকিয়া পিছন ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গেই আর এক অদ্ভুত কাণ্ড। সমস্ত বানর-বাহিনী একযোগে 'ইঃ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তারপর ঠেলাঠেলি করিয়া দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি দিয়া যে যেভাবে পারিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল। চক্ষের পলকে যেন মন্ত্রবলে আদালত ঘর খালি হইয়া গেল।

এইরূপে শিউলালের বুদ্ধি বলেই সেদিন ব্রিটিশ আদালতের সম্মান বজায় রহিল। নন্দকুমারের বিচারও শেষ হইল। শিউলাল সেদিন উপস্থিত না থাকিলে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইয়া যাইত।

শিপ্রার তীরে

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

প্রাচীন উজ্জয়িনীর পুরানো কেল্লাটি শিপ্রার তটে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তারই একটু এদিকে একটি পুরানো বাংলো। বাংলোটি এতদিন পড়েই ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেটিকে পরিষ্কার তক্‌তকে করে তোলার জন্য ক'জন লোক অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরদিনই ষ্টেশন থেকে বরাবর মোটর ছুটিয়ে সেখানে এসে উঠলেন কলকাতার কোন এক কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ সেন।

অধ্যাপক সেন এখানে এসেছেন কি একটা গবেষণার ব্যাপারে। পুরাতত্ত্ব-বিদ হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁর আসার খবর পেয়েই এখানকার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জ্যোতিষবাবু ছুটে এলেন। বললেন,—আসার খবরটা যদি একবার দিতেন তাহলে আমরা এর চেয়েও অনেক ভালো ব্যবস্থা করতে পারতাম।

জ্যোতিষ ও অমিতাভ এক সময়ে সহপাঠী ছিলেন।

অমিতাভ হেসে বললেন,—কেন, এ ব্যবস্থা কিছু কি খারাপ হয়েছে জ্যোতিষবাবু?

—না, তা নয়। তবে এদিকটায় লোকে বড় একটা থাকে না। কারণ অনেক অসুবিধা।

—সেইজন্যেই তো পছন্দ করেছি এই দিকটা। লোকজনের ভীড় কম হবে, কলেজের ছেলেরা এসে জ্বালাবে না, নির্ঝঞ্ঝাটে সারাদিন বসে পড়াশুনা করা যাবে।

—কিন্তু এই বাংলোটীর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি।

—অর্থাৎ ?

—লোকে বলে, কেমন যেন একটা ভয় আছে।

—ভূতের ভয় ? অমিতাভ এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—আপনি ও সব বিশ্বাস করেন ? যে মরে গেল সে তো ফুরিয়ে গেল, সে কখনও আর ফিরে আসতে পারে ?

—তা তো জানি। কিন্তু আমরা যে একটা প্রত্যক্ষ দেখলাম। মুংগের থেকে এক ডেপুটি এসে এই বাড়ীতে উঠলেন, বছর তিনেক আগে। একদিন সকালে দেখা গেল, ওই উঁচু পাথরখানির পাশে তিনি পড়ে আছেন আর মাথাটি তাঁর একেবারে থেঁৎলানো।

—আপনি কি বলতে চান, তাঁকে ভূতে মেরেছে ? একটা ছায়া কখনও একটা স্থুলদেহের কোন ক্ষতি করতে পারে,—আপনিই বলুন ? আমার মনে হয়, তাঁর কোন শত্রু ছিল তাই সুবিধা পেয়ে সেই তাঁকে খুন করেছে।

—তার আগেও কিন্তু এই রকম আরো দু'টি ঘটনা ঘটেছে এই বাংলোয়।

—তাহলে এটা একটা রীতিমত খুনীর আড্ডা বলুন ? তা' ভালই হোল, মানুষই হোক আর ভূতই হোক, একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে।

—যাই হোক, রাতটা একটু সাবধানে থাকবেন।

—নিশ্চয়। আপনি যখন বলেছেন, টর্চ্চ আর লাঠি দাছা আজ থেকে হাতের কাছে নিয়েই শোব—

আসলে কিন্তু অমিতাভ মোটেই ভয় পান নি। কবে কি ঘটেছিল, সেই কথা শুনে এমন সুন্দর বাংলোটি ছেড়ে দিবার লোক তিনি নন। বারান্দা থেকে তরঙ্গময়ী শিপ্রাকে চোখে পড়ে, মন জুড়িয়ে যায়। দূরের পাহাড়-গুলোকে দেখায় মেঘের মত। মহাকালের মন্দিরের সোনার ঘটটি ঝল্‌মল্ করতে থাকে সারাদিন। এমন জায়গা ছেড়ে কেউ কখনও নতুন উজ্জয়িনীর ভাড়ের মধ্যে গিয়ে বাস করতে পারে!

অধ্যাপক অমিতাভ শুধু নিষ্করুণ ঐতিহাসিকই নন, কবিত্বের এক ফল্গুধারা লুকিয়ে আছে তাঁর অন্তরে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর অমিতাভ এসে বসেন শিপ্রার তটে।

উচ্ছল নদী নাচতে নাচতে তটের গায়ে আঘাতের পর আঘাত ঢেউ তুলে, নতুন সহরকে পাশ কাটিয়ে, তর তর করে বহে গেছে, হারিয়ে গেছে দূরের পাহাড়ের পিছনে। ছল ছল করে একটা সংগীতের মূর্চ্ছনা শোনা যায়, মৃদু-মধুর বাতাস মনকে দোলা দেয়। ভালো লাগে বসে থাকতে, ভালো লাগে,—দূরে যেখানে দৃষ্টি হারিয়ে যায়, সেদিকে চেয়ে থাকতে।

কোন এক সময় অমিতাভের চোখে পড়লো, একটুকরো কালো পাথর সূর্য্যের আলোয় চিক্ চিক্ করছে। সাধারণ উপলখণ্ড বলে সেটিকে মনে হয় না। কৌতূহলী অধ্যাপক পাথরের টুকরোটি কুড়িয়ে নিলেন।

পাথরটি সত্যই অসাধারণ। নিখুঁত পালিশ করা কালো এক টুকরো পাথর। তার এক পিঠে ফুটে উঠেছে সুশ্রী এক নারীর মুখ—কেশের চূড়াটি থেকে কণ্ঠহারটি পর্য্যন্ত। অজন্তার দেয়াল থেকে কে যেন পাথরখানিকে ভেঙে এনেছে। জলের ধাক্কায় রেখাগুলির নৈপুণ্য ম্লান হয়েছে কিন্তু লাবণ্য একেবারে নষ্ট হয়নি। চিত্রটির নীচে লেখা আছে—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

অতীত যুগের কোন শিল্পী তার প্রিয়াকে প্রেম নিবেদন করেছিল এই কঠিন পাষাণ-প্রতীকে।

এমন এক টুকরো পাথর এখানে এভাবে পড়ে থাকার কথা নয়। অমিতাভ ওটি হাতে করেই ফিরলেন। সন্ধ্যা বেলাটি হারিয়ে গেল ওই পাথরের টুকরোটির মধ্যে। অধ্যাপক বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন ক্ষোদিত নারীমূর্ত্তিকে। তখন ফটো তোলার যন্ত্র ছিল না, ছিল না কাগজের উপর রঙের খেলা দেখাবার মত সামগ্রী, শিল্পী তাই তার কালো দেশের কালো মেয়ের রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য কালো পাথরখানিই বেছে নিয়েছিল। তারপর তার সমগ্র নিপুণতা কেন্দ্রীভূত

করে তার মানসীর মুখের প্রতিটি রেখাকে প্রতিদিন ধরে কত চেষ্টায়, কত সাধনায় তিল তিল করে রূপায়িত করেছিল ওই পাথরখানির উপর। তারপর কত যুগ কেটে গেছে, শিল্পীও তার প্রিয়া কবে মহাকালের বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে; কিন্তু তাদের প্রেম আজও জেগে আছে ওই কালো পাথরখানির বুকে।

সেদিন বিকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল। সন্ধ্যার পরেই সুরু হোল জল-ঝড়। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। বজ্রপাতের মুহুর্মুহু শব্দ সচকিত করে তুলছে চারিপাশকে। অমিতাভ একা বসেছিলেন, প্রাচীন ইতিহাসের একখানি বই পড়ছিলেন নিবিষ্ট মনে।

কিন্তু বজ্রপাতের ঘন ঘন শব্দে তাঁর মন হয়ে পড়ছিল বিক্ষিপ্ত, পড়া একটুও এগুচ্ছিল না। বিকালে কুড়িয়ে পাওয়া কালো পাথরখানি সামনে পড়েছিল, সেটিকে নাড়াচাড়া করতে করতে অমিতাভ মৃদু হাসলেন।

কড়কড় করে বাজ গর্জ্জে উঠলো। বাজটি পড়লো অত্যন্ত কাছে। মনে হোল, যেন ঠিক জানলার বাইরেই এবার পড়েছে! অধ্যাপকের বুকটি দুরদুর করে উঠলো। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, তিনি বড় একা—একান্ত নিঃসহায়।

আবার একটা বাজ পড়লো।

তারপরেই ঘট্‌ঘট্ করে দরজার বাইরে যেন কে ধাক্কা দিলে।

আবার বজ্রপাত!

পর মুহূর্ত্তে আবার সেই ধাক্কা।

অমিতাভ এবার সত্যই উঠলেন। দরজা খুললেন। একটা জলের ঝাপটা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিলে। সামনে কাউকেই চোখে পড়লো না, যতটা দেখা যায় সবই ঘন অন্ধকার। জিজ্ঞেস করলেন,—কে?

সহসা বিদ্যুৎ চমকে উঠলো! সেই আলোয় চোখে পড়লো, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। বললেন,—ভিতরে এসো!

নিঃশব্দে তরুণী ঘরে এসে ঢুকলো। আলোর আভায় বৃষ্টির জল চিক্‌মিক্‌ করে উঠলো তার সর্ব্বাঙ্গে। অমিতাভ বললেন,—এমন জলঝড় মাথায় করে কেউ কখনও পথে বের হয়?

—তুমিই তো আমায় ডেকে আনলে।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি!

তরুণী এবার মুখ তুললো। অমিতাভ সুযোগ পেলেন তাকে ভালো করে দেখবার। বড় বড় দু'টি চোখে কাজলের ক্ষীণ রেখা অসামান্য হয়ে উঠেছে, সাগরের ছায়া পড়েছে সেই চোখে। মাথার এলো চুলে পুরাণো কালের শিখী ছন্দে কবরী বাঁধা। বুকে কাঞ্চীদাম। উন্নত দুই স্তনের মাঝে কনক-কণ্ঠহারের মধ্যমণি ধুক ধুক করছে। শ্যামলিমার মাঝে, কত রূপ লুকিয়ে থাকে তা' তার সুশ্রী সুঠাম দেহটীর পানে তাকালেই বোঝা যায়। মুখখানি কেমন যেন চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখা।

তরুণী বললে,—তুমি কেন চুরি করে আনলে আমার জিনিষ?

—তোমার জিনিষ আমি চুরি করে এনেছি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই কালো পাথরখানি—

—ওটা তোমার?

—হ্যাঁ, ওটা আমার। ওযে আমিই।

অমিতাভ একবার পাথরখানির পানে তাকালেন, তারপর তার উপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে তাকালেন তরুণীর মুখের পানে। হুবহু এক। কোথায়ও একটুকু ব্যতিক্রম নেই। কালো পাথরের বুকে ওই রেখাগুলি যেন জীবন-রূপ নিয়ে এসেছে তার সামনে। মনটা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। কোথা থেকে এলো এ? একি তবে অশরিরী, প্রেতাত্মা?

তরুণী বললে,—কি কথা বলছ না যে? ফিরিয়ে দাও আমার জিনিষ আমাকে! পাথরখানি তুলে নেবার জন্য সে হাত বাড়ালো।

এবার অধ্যাপকের পুরাতাত্ত্বিক মন সচেতন হয়ে উঠলো। তরুণী পাথরখানি ধরার আগেই তিনি সেটি ছোঁ মেরে তুলে নিলেন।

তরুণী চোখ তুলে মৃদু হেসে বললে,—তোমারই দেওয়া জিনিষ তুমি আজ ফিরিয়ে নেবে? নাও—

তার মুখের উপর বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা জল আলোর আভায় মুক্তার মত টল্‌টল্‌ করে উঠলো; মনে হোল, অভিমানে তার চোখ দু'টি যেন ছল্‌ছল্‌ করছে, এখনই উপছে পড়বে বুঝি!

অধ্যাপক বললেন,—আমার দেওয়া?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমারই দেওয়া, সব ভুলে গেলে? দেখতো আমার মুখের পানে—চেন না আমায়? দেখতো আমার চোখের পানে—এ চোখ কি তুমি দেখোনি কোন দিন?

তরুণী মুখখানি তুলে ধরলো অমিতাভের সামনে। ডাগর চোখ দু'টি মেলে ধরলো তাঁর মুখের উপর। সেই চোখের তারায় অমিতাভের মুখের ছায়া পড়লো। তাঁর মনে হোল, সহসা তিনি যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন সেই তারার ছায়ায়!

কতক্ষণ সেই চোখের পানে অমিতাভ তাকিয়েছিলেন, তা' জানেন না। ধীরে ধীরে সেই চোখের মাঝে ভেসে উঠলো, মহাকালের অত্যুচ্চ মন্দির।

মহাকালের মন্দির। তার শীর্ষের স্বর্ণচূড়া মেঘের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির গাত্রে পাথরের কারুকার্য্য দৃষ্টিকে মোহিত করে। শত শত কনক-দীপের ঔজ্জ্বল্যে ভিতরের মণি-রত্ন ঝল্‌মল্‌ করছে, বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দ্যুতি। মহাকালের কালো রূপ দীপ্যমান হয়ে উঠেছে ভীষণতর রূপে। চারিপাশ থেকে ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠ ভেসে ওঠে:—

ন ভুমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেষো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিং স্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥

সে কণ্ঠ মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে আঘাত করে, প্রতিধ্বনি গম্‌গম্‌ করে ওঠে চারিপাশে। সন্ধ্যারতি সুরু হয়।

ধুপ-ধুনার ধূমেলতার মধ্যে তালে তালে জাগে শত শত নূপুরের ঝঙ্কার। লাবণ্যময়ী দেবদাসীরা তাদের লীলায়িত দেহে ছন্দের বিভ্রম তোলে। ব্রহ্মচারীদের স্তব-গাম্ভীর্য্যকে ছাপিয়ে ওঠে নূপুরের নিক্কণ। তরুণীদের বুকের কাঞ্চীদামে, বিলম্বিত বেণীর কনকপুচ্ছে, লীলায়িত দেহের কটি-মেখলায় আলোর হিল্লোল নাচে, চারিপাশ আমোদিত হয়ে ওঠে চুয়া-চন্দন, কেয়া-কস্তুরীর সুবাসে।

অমিতাভের মনে হয়, তিনি যেন কয়েক শতাব্দী আগে কালিদাসের কোন এক যুগে ফিরে গেছেন।

কোন এক সময় সন্ধ্যারতি শেষ হয়।

হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ শব্দে বাইরের বিরাট ঘণ্টাটি ঢক্কার তোলে। ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করার আগে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করে :—

অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং
মুক্তি প্রদানায় চ সজ্জনানাম্‌
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষনার্থং
বন্দে মহাকাল মহাসুরেশম্‌ ।।

একে একে সবাই চলে যায়। সবার শেষে এক নবীন ব্রহ্মচারী মন্দির অলিন্দে এসে দাঁড়ায়।

সামনেই সোজা পথ বরাবর চলে গেছে শিপ্রার পাশ দিয়ে প্রাসাদের দিকে। ওই পথের উপরেই মন্দির প্রান্তে সারি সারি ঘর। ওই সব ঘরে আলো ঝিলমিল করে সারা রাত। ওখানে থাকে যত দেবদাসী। সন্ধ্যারতির শেষে তারা ঘরে ফিরে যায়, রূপের হাট বসে ওই পথের উপর। রূপ-পূজারীরা সেই হাটে সুরু করে বিলাসের বিকিকিনি।

বিভূতিভূষণ-মহাকালের মন্দিরের পাশে আজও চলেছে সেই যৌবন-

বিলাস। ব্রহ্মচারী বারেক তাকালো সেই দিকে। তারপর মহাকালের দিকে ফিরে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলো :—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্
পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্ ॥

তারপর ব্রহ্মচারী ধীরপদে অগ্রসর হয়।

অলিন্দ্যের সোপান অতিক্রম করতে গিয়ে সহসা তার চোখ পড়লো, থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক তন্বী দেবদাসী। ব্রহ্মচারী দেখেই তাকে চিনতে পেরে, বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?

—এম্‌নি আছি।

—কারুর প্রতীক্ষা করছ ?

—না।

—কারুর সঙ্গে বিবাদ করে এসেছ ?

—না।

—তবে ? ঘরে ফিরবে না ?

—ফিরবো আর একটু পরে।

—রাত যে ক্রমেই গভীর হয়ে আসছে।

—হ্যাঁ, একটু গভীর রাতেই আমি ফিরি। ওদের ওই কলরব আমার ভাল লাগে না।

ব্রহ্মচারী পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তরুণীর সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নেয়। এমন সুশ্রী সুঠাম তনু দেহ। ভোগের জন্য যার রূপ প্রস্ফুটিত পদ্মের মত শত দলে নিজেকে বিকসিত করে তুলেছে, যৌবনের বিলাস তার ভাল লাগে না ? মেয়েটি তাহলে নিশ্চয়ই নিজের অন্তরকে এখনও চিনতে পারে নি।

ব্রহ্মচারী আর কিছু না বলে ধীর পদক্ষেপে সোপানের পর সোপান বেয়ে নেমে আসে।

হঠাৎ তরুণী পিছু ডাকে,—ঠাকুর!

ব্রহ্মচারী ফিরে দাঁড়ালো।

—ঠাকুর, আমায় তুমি দীক্ষা দেবে? আমি ব্রহ্মচারিণী হব।

—তুমি ব্রহ্মচারিণী হবে!

ব্রহ্মচারীর মুখে এবার মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। যার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুটীতে কামনার আগুন জ্বলছে, সেই হবে ব্রহ্মচারিণী।

অন্ধকারে মেয়েটি সে হাসি দেখতে পায় না। বললে,—চুপ করে রইলে যে?

—ভাবছি....

—কেন, আমি কি ব্রহ্মচারিণী হতে পারি না?

—পার, কিন্তু এখনও তার সময় হয় নি।

—কবে সে সময় আসবে ঠাকুর?

—যেদিন তোমার ভোগের নিবৃত্তি হবে।

—কেমন করে ভোগের নিবৃত্তি হবে ঠাকুর?

—আগে ভোগকে স্বীকার করতে হবে, আকণ্ঠ ডুবে যেতে হবে সেই ভোগের মাঝে। তারপর নিজের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে জাগবে বিতৃষ্ণা। সেই বিতৃষ্ণা থেকেই জন্মাবে ত্যাগের অধিকার।

মেয়েটি ব্রহ্মচারীর মুখের পানে তাকালো, তারপর মাথা নত করে ধীরপদে সোপান অতিক্রম করে চলে গেল।

পরদিন রাত্রে নির্জ্জনে আবার তার সঙ্গে দেখা। সে প্রথমেই বললে,—তোমাকেও কি এই ভোগের মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়েছে, ঠাকুর?

—সকলের বেলায় এক বিধান নয়।

—কেন নয়?

—সব জমিতে কি ধানের আবাদ হয় ?

—অর্থাৎ তোমরা কি বিশ্বাস কর, যে নারীর মাঝে আছে শুধু ভোগের সত্ত্বা আর পুরুষের মাঝে আছে ত্যাগের নিষ্ঠা, তাই না ঠাকুর ? সেই জন্যই তোমরা আমাদের জন্য আলাদা বিধান দাও। কিন্তু নারী ও পুরুষ উভয়কেই যখন আমরা মানুষ বলে মানি, তখন পুরুষের বেলায় যে বিধান আছে, নারীর বেলায় সেই বিধান প্রযোজ্য হবে না কেন ?

ব্রহ্মচারী মৃদু হেসে বললে,—অধিকার দাবী করে পাওয়া যায় না, অধিকার সৃষ্টি করতে হয়।

—কিন্তু ঠাকুর, সেই অধিকার কি শুধু ত্যাগেই সৃষ্টি হয়, ভোগে হয় না ? ত্যাগ ও ভোগ দু'টোই তো জীবনের ধর্ম্ম, তার একটাকে যদি আমরা ভগবত্ত লাভের পথ বলে স্বীকার করি তাহলে আর একটিকে স্বীকার করবো না কেন ?

এমনভাবে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কেউ কোন দিন তর্ক তোলে নি। সহসা সে কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

দেবদাসী উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বলে উঠলো,—তোমরাই তো বল ঠাকুর জীবনটাই একটা স্বপ্ন। সেই জীবনে যে সাধনা আমরা করবো তা-ও তো তাহলে স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কখনও কোন সত্যে গিয়ে পৌছানো যায় কি ? ত্যাগ আর ভোগ, ভগবত্ত লাভের পক্ষে দুই কি সমান নয় ?

ব্রহ্মচারী সুন্দরী দেবদাসীর নিটোল উন্নত মুখখানির পানে তাকালো। ভাবলো,—এত রূপ তো মিথ্যা হবার নয়। বললে,—জীবনকে স্বীকার করলে যৌবনকেও স্বীকার করতে হবে এবং তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে তুমি নিজেই।

দেবদাসী এবার কৃতার্থের হাসি হাসে। কুন্দদন্ত ঈষৎ প্রকাশ পায়, বুকের উপর মধ্যমণি দুলে ওঠে।

পরদিন ঠিক সেই সময় আবার তার সঙ্গে দেখা।

বললে,—তোমায় প্রণাম করতে এলাম ঠাকুর!

ব্রহ্মচারীর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

মেয়েটি বললে,—তুমি আমায় নতুন আলো দেখিয়েছ ঠাকুর, তুমিই আমার গুরু।

ব্রহ্মচারীর চরণ-ধুলো নেয়।

সেই থেকে রোজই সে আসে। ব্রহ্মচারীর মনটাও কেমন যেন উন্মুখ হয়ে ওটে ঠিক সময়টিতে তার দেখা পাবার জন্য।

তারপর একদিন দেখা যায়, ব্রহ্মচারী একখানি কালো পাথরের মাঝে আত্মসমাহিত হয়ে গেছে। একান্ত নির্জ্জনে বসে সেই পাথরখানির বুকে রূপায়িত করে তুলেছে একখানি তরুণ মুখশ্রী,—শিখী-ছন্দে তার কবরী বাঁধা, টানাটানা দু'টি চোখ ঢলঢল করছে, উন্নত বুকের উপর টলটল করছে কণ্ঠহারের মধ্যমণি।

রেখাচিত্র শেষ করে ব্রহ্মচারী তার নীচে লেখে,—"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী"—

একদিন দেবদাসীর হাতে সেই পাথরখানি তুলে দিয়ে বললে,—এই নাও—

—এ, কে?

—তুমি।

দেবদাসী হাসলো। বললে,—তুমি শুধু সাধক নও, শিল্পীও।

পরদিনই চারিপাশে রটে যায়—ব্রহ্মচারী আনন্দ, দেবদাসী কাঞ্চনের কাছে আত্মদান করেছে।

আচার্য্যের কানেও কথাটা যায়। ডেকে বললেন,—যা' শুনছি, তা' কি সত্য আনন্দ?

আনন্দ নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচার্য্যের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠলো। বললেন,—তুমি কি গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে যেতে চাও?

আনন্দ সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। এত দিনের শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা সব ব্যর্থ হবে! তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে বলে উঠলে,—না না।

—তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আচার্য্যের নির্দ্দেশে মন্দিরের রত্নগৃহের একপাশে আনন্দের জন্য স্থান করে দেওয়া হয়। একাধিক্রমে সাত দিন ধরে সেখানে তাকে নিরম্বু উপবাস করতে হবে। তিল তিল করে আত্মপীড়ন করে আত্মার শুদ্ধি সম্পাদন করতে হবে, বিভ্রম থেকে মুক্ত করতে হবে চিত্তকে।

ম্রিয়মাণ আনন্দ নত মস্তকে সেই নিষ্করুণ বিধানকেই স্বীকার করে নিল। রত্নগৃহে সারাক্ষণ তার মৃদু কণ্ঠ শুনা যায়:—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া ন বিত্তং ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি শাস্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসজালং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে॥

কণ্ঠ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। এক ফোঁটা জলের জন্য বুকের মাঝে গুমরে ওঠে। পাকস্থলীতে কেমন যেন এক দুঃসহ যাতনায় বিক্ষেপ সুরু হয়। আনন্দ ভাবে, এই আত্মপীড়ন কি সত্য? মন যা' চায়, তার মাঝে কি ধর্ম্ম নেই? স্তব আবৃত্তি করতে আনন্দ ভুলে যায়, বুকের মাঝে ধক্‌ধক্ করে ওঠে দ্বিধা ও সন্দেহ।

মন্দির ক্রমশঃ জনহীন হয়ে আসে, রাত বেড়ে যায়। আনন্দের চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে সে মুখ তুলে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চন। আনন্দ চমকে উঠলো। বললে—কে, কাঞ্চন!

—জল খাবে আনন্দ ?

—জল !…না না কাঞ্চন, তুমি যাও। তোমার রূপের বিষ আমার মনকে বিষাক্ত করেছে, তুমি যাও।

—তোমার এই প্রায়শ্চিত্তের কোন মানে হয় না আনন্দ। কেন এই আত্মপীড়ন ? যা' প্রত্যক্ষ, যাকে উপলব্ধি করছ, তাকে স্বীকার করবে, না যা' সত্য তাকে বলবে মায়া। আর যা' পেলে না, যা পাওয়া যায় না, তারই পিছনে জীবনটাকে নিঃশেষ করে দেবে ?

—তোমার সঙ্গে আজ আর তর্ক করতে চাই না কাঞ্চন, তুমি যাও—

—জল খাবে না ?

—না না, তুমি যাও।

কাঞ্চন মাথা হেঁট করে চলে গেল।

পরদিন আনন্দের চোখ রক্তাভ হয়ে উঠলো। তৃষ্ণায় দেহের অস্বস্তি বেড়ে উঠেছে, ঝিম্‌ঝিম্ করছে মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে যেন শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। মহাকালের পানে তাকিয়ে শুধু একটি কথা তার মনে হয়, কবে শেষ হবে এই দীর্ঘ সাতটা দিন, কবে সে পান করতে পাবে এক গণ্ডুষ জল। পাথরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

রাত্রিতে আবার কাঞ্চন আসে। বললে,—জল খাবে আনন্দ, জল ?

আনন্দের স্নায়ুগুলি সব সজাগ হয়ে উঠলো। উৎসুকভাবে সে জিজ্ঞেস করলে,—জল এনেছ তুমি, কাঞ্চন ?

কাঞ্চন জলপাত্র এগিয়ে দিলে।

পাত্র গ্রহণ করতে গিয়েই আনন্দ চমকে উঠলো। বললে,—না না, জল আমি খাব না কাঞ্চন, তুমি যাও—

—বেশ, আমি যাচ্ছি আনন্দ কিন্তু তুমি জল খাও। ওই দেবতা পাষাণ, ওঁর তৃষ্ণা নেই, কিন্তু আমরা যে মানুষ। আনন্দ, তুমি জল খাও—

এবার আনন্দের মুখের কাছে কাঞ্চন জলপাত্র তুলে ধরলো। স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জল চক্‌চক্‌ করে উঠলো চোখের সামনে। আনন্দ আর ঠিক থাকতে পারলো না, পানপাত্র নিঃশেষ করে ফেললো নিঃশব্দে। শরীর জুড়িয়ে গেল, স্নায়ু হয়ে উঠলো স্নিগ্ধ, মনে হোল যেন একপাত্র অমৃত পান করলো সে।

পরক্ষণেই তার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠলো। প্রায়শ্চিত্তের ব্রত সে ভেঙেছে, ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠা সে পালন করতে পারলো না। বলে উঠলো,—এ কি করলে, কাঞ্চন?

—অন্যায় তো কিছু করিনি আনন্দ, আমরা যে মানুষ। আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাই যে সত্য....

সহসা কাঞ্চনের কথা বাধা পায়। কাঞ্চনের পাশে এসে দাঁড়ালেন আচার্য্যদেব। ডাকলেন—আনন্দ!

আনন্দ চমকে উঠলো।

—আনন্দ, আজ থেকে দেবালয়ে আর তোমার স্থান নেই, তুমি পতিত। এই মুহূর্ত্তে তুমি দেবালয় পরিত্যাগ কর!

—আচার্য্যদেব!

আনন্দ কথা বলতে চায়, কিন্তু বড় দুর্ব্বল তার স্বর। আচার্য্যদেব সে কথা শুনতে চান না, বজ্রনির্ঘোষে আদেশ করলেন—যাও!

মাথা নত করে আনন্দ বেরিয়ে এলো।

কাঞ্চন এসে তার হাত ধরলো। বললে,—চলো আনন্দ আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

আনন্দ সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। বললে,—ছেড়ে দাও আমায় কাঞ্চন, ছেড়ে দাও। তোমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমায় আত্মঘাতী করেছে, ছেড়ে দাও। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আনন্দ পাগলের মত ছুটলো। ছুটতে ছুটতে সে এসে দাঁড়ালো শিপ্রার তটে। শরতের পরিষ্কার জ্যোৎস্না। জলের বুকে চাঁদের আলো কাঁচের টুকরোর মত ভেঙ্গে পড়েছে। দূরে পাহাড়ের বুক থেকে

ভেসে আসছে মহুয়ার ম্লান গন্ধ। কয়েকটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ স্তিমিত রক্তিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তটের একপাশে। চারিপাশে যেন একটা রঙীন সুরার মাদকতা।

আনন্দ থমকে দাঁড়ালো। জগতের এত রূপ, এ সবই কি মায়া—শুধু প্রলোভন!

কাঞ্চন পিছনে এসে দাঁড়ালো। বললে,—চলো আনন্দ, আমরা যাই, ওই পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো। বনের বাতাসে মহুয়ার গন্ধ আসবে ভেসে, কেতকী আর কৃষ্ণচূড়ার ঔজ্জ্বল্য জাগবে চারিপাশে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে সবুজ ঘাসের উপর। আর তারই মাঝে থাকবো শুধু তুমি আর আমি।

কাঞ্চন, আনন্দের একখানি হাত চেপে ধরলো।

আনন্দ ফিরে তাকালো কাঞ্চনের মুখের পানে। চমকে উঠলো তার চোখের দৃষ্টিতে—শুধু সৌন্দর্য্যের প্রলোভন আর যৌবনের আশক্তি। আশৈশব ব্রহ্মচারী সে, তারও মুক্তি নেই!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আনন্দ হাত ছাড়িয়ে নিলে, তারপর চকিতে লাফিয়ে পড়লো শিপ্রার খর-স্রোতে। আর উঠলো না।

কাঞ্চন দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।…

তরুণী এবার অমিতাভকে বললে,—আমি সেই কাঞ্চন, আজও আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার প্রতীক্ষায়। যাবে আনন্দ, বাঁধবে গিয়ে ঘর ওই পাহাড়ের ওপাশে? সেই চাঁদের আলো, মহুয়ার সুবাস, কেতকী আর কৃষ্ণচূড়ার সৌন্দর্য্য·· তাকে ভোগ করবে শুধু তুমি আর আমি।

কী মিনতি মেয়েটির চোখে, কী ব্যাকুলতা তার কণ্ঠে! অধ্যাপক সম্মোহিত হয়ে যায়, কিসের যেন একটা আকর্ষণ বেরিয়ে আসে মেয়েটির পিছু পিছু।

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্ করে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ঘন ঘন।

দমকা বাতাসে একটা শন্‌শন্‌ শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। সহসা সে সব ছাপিয়ে উঠলো একটা আর্ত্ত চীৎকার, তারপরেই একটা ধারালো অট্টহাসি।

পরদিন সকালে দেখা গেল, বাংলোর সামনে শিপ্রার কিনারায় পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক অমিতাভ পড়ে আছেন। আর তাঁরই পাশে পড়ে আছে একটুকরো কালো পাথর। এক তরুণীর মুখশ্রী রেখাঙ্কিত করা আছে তার উপর আর তারই সঙ্গে ক্ষোদিত আছে, কালিদাসের কবিতার একটি ছন্দ,—"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।"



বীরভোগ্যা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক হাজার একর প্ল্যান্টেশন। নেহাৎ ছোট নয় বাগানটা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিরীষের ছায়ায় ছায়ায় সমান মাপে ছাঁটাই করা গাছগুলো যেন সবুজের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র।

সুপারভাইজার মধুবাবু শোলার হ্যাট্‌টা মাথায় চাপালো। ছ'ফুট দীর্ঘ চেহারার মানুষটা। কালো কঠিন দেহ রোদে জলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড় আর গলার মাঝামাঝি জায়গায় তিনটে সমান্তরাল উজ্জ্বল চিহ্ন। ডুয়ার্সের রামগই ফরেষ্টে বাঘে আঁচড়ে দিয়েছিল। বাঁ হাতের বিশাল কালো মণিবন্ধে ট্যাঁক-ঘড়ির আকারের প্রকাণ্ড একটা রিষ্ট-ওয়াচ শোভা পাচ্ছে।

কুটিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মধুবাবু চারদিকে তাকালো একবার। সতেরো নম্বর প্লটে প্লাকিং চলছে। ওরাওঁ আর সাঁওতাল মেয়েদের হাতগুলো যেন খেলা করে যাচ্ছে গাছের মাথায় মাথায়। পিঠের ঝুড়িগুলোতে সরস চায়ের পাতা স্তূপাকারে জমে উঠেছে।

আকাশে খরখরে রোদ। সূর্য্য যেন আগুন বৃষ্টি করছে। পিঠের সঙ্গে এক একটা করে তালি মারা ছেঁড়া ছাতা বেঁধে নিয়েছে কুলি মেয়েদের কেউ কেউ। নিজেদের জন্যে নয়, ঝুড়ির পাশে কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা আছে ওদের দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান—এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদেরই জন্যে।

বাঁ দিকের লাইনে একটি মেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। একটা

শিরীষ গাছের আড়ালে পড়েছে সে, ভালো দেখা যাচ্ছে না। শুধু গাছের পাতায় পাতায় একটি সুগঠিত বাহু এবং সুকুমার আঙুলের আন্দোলন চোখে পড়ছে। একটুখানি ইতস্তত করে তারই দিকে পা বাড়ালো মধুবাবু।

কুলি মেয়েদের চোখে চোখে বিদ্যুৎশিখার ইঙ্গিত বয়ে গেল। জল-তরঙ্গের মতো খানিকটা মিষ্টি হাসি তিন চারটি কণ্ঠ থেকে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। ওরা বুঝতে পেরেছে—বুঝতে পেরেছে অনেক দিন আগেই। মধুবাবুরও গা সওয়া হয়ে গেছে এসব। আজ একদিন দু'দিন নয়—বাঙলা আর আসামের চা-বাগানে পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছে সে।

হাতের লাঠিটা ঠুকঠুক করে মধুবাবু এগিয়ে গেল নেপথ্যচারিণী—মেয়েটির দিকে। যে গাছ থেকে সে পাতা তুলছিল, ঠিক এসে দাঁড়ালো তারই পাশে অন্য কেউ হলে মুহূর্তে চকিত আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত—কোথায় একটু ভুল হয়ে যায়, কোথায় প্লাকিং এক ইঞ্চি নেমে পড়ে তা' হলে আর কথা নেই, পুরুষ নারী নির্বিচারে মধুবাবুর লাঠিটা তারই পিঠে গিয়ে পড়বে। কিন্তু এ মেয়েটি ভ্রূক্ষেপ করলে না এক বিন্দুও—নির্বিকার মুখেই কাজ করে চলল। রোদ ভয়ানক চড়ে গেছে, বারোটার বাঁশি বাজতে আর দেরী নেই। দৈনিক রোজগারের পয়সাটা এর মধ্যেই যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে হবে।

শিরীষ গাছের আড়ালে অন্য মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। মধুবাবু একবার কাশল :—টুনি, টুনি।

টুনি ঝাঁজিয়ে উঠল এবারে—কাজের সময় বিরক্ত করছ কেন?

—বাঃ, কাজ দেখব না?

—কাজ দেখবে তো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো না। ডাকাডাকি করছ কেন খালি খালি?

—দুত্তোর! খপ্‌ করে মধুবাবু টুনির একখানা হাত টেনে নিলে নিজের হাতের মধ্যে,—রেখে দে তোর কাজ। চার ছ'আনা পয়সা পুষিয়ে দেব আমি।

বিদ্যুৎবেগে হাত ছিনিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো টুনি।

—তোমার লাজ-ডর কিছু নেই বাবু? এই দিনের বেলায়?

মধুবাবু হেসে উঠল। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ মানুষের কালো মুখে খানিকটা অমানুষিক লোলুপতা উঠল রেখায়িত হয়ে।

—কী করব বল্? তুই যে রকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, তাতে দিন-রাত্তির বলে কিছু আছে নাকি আমার?

—ইস্—ইস্!

একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে মধুবাবুকে জর্জরিত করে দিয়ে আরো কয়েক পা সরে দাঁড়ালো টুনি। সুকুমার আঙুলের স্পর্শে চায়ের পাতাগুলো দক্ষিণা বাতাসে ঝরে যাওয়া ফুলের পাঁপড়ির মতো হাতের মধ্যে এসে পড়তে লাগল।

মধুবাবুর স্নায়ুর ওপরে ক্রিয়া করছে দুপুরের প্রখর রোদ। হাজার একর বাগানের শ্যামল সমুদ্রে ফ্যাক্টরীর কালো চিম্‌নিটা ধোঁয়ার নিশ্বাস ছাড়ছে—যেন স্তব্ধ হয়ে আছে একটা অতিকায় জাহাজ। শিরীষের পাতায় বাতাস ঝির ঝির করছে। বাগনের ওপারে সমুন্নত গৌরবে মাথা তুলেছে দুর্গম আর দূরন্তব্যাপী শালের বন—সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক। আর এদিকে ফ্যাক্টরী থেকে উঠছে যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন কলরব। যুদ্ধের তাগিদে মেশিনের আর বিশ্রাম নেই—প্লাই-উডের বাক্সে বন্দী হয়ে হাজার হাজার পাউণ্ড গ্রীণ টী, ব্ল্যাক টী চলে যাচ্ছে ফ্রন্টে। রণ-ক্লান্ত সৈনিকদের সজীব করবার জন্যে, শত্রু নিধনের প্রেরণা দেবার জন্যে।

মধুবাবুর শরীরের রক্ত কোলাহল করে উঠল। ছোট ছোট চোখ দু'টোতে যেন ঝলক দিলে আগুন। শিরীষ গাছটা চমৎকার আড়াল দিয়েছে। কিন্তু কিছু একটা করবার আগেই যেন কার একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগে তার আচ্ছন্ন চেতনাটা সজীব হয়ে উঠলো।

মধুবাবুর চোখে কতখানি জ্বলেছিল আগুন?

তার চাইতে সহস্র গুণে বেশি আগুন আর ছ'টো চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে। সত্য যুগ হলে তার তাপে এতক্ষণে একগাদা ভস্ম-স্তূপে পরিণত হয়ে যেত মধুবাবু। যেন আকাশের সূর্য্যকে অতসী কাঁচের মতো নিজের চোখের মধ্যে প্রতিফলিত করে তারই দীপ্তিটা সে মধুবাবুর দিকে বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো মধুবাবু।

লোকটা তো ছিল অনেক পেছনে, কখন লাইন ধরে এতটা এগিয়ে এসেছে? তাকে লক্ষ্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে এর?

প্রকাণ্ড মণিবন্ধের নীচে প্রকাণ্ড মুঠিতে লাঠিটা শক্ত হয়ে উঠল। ঘাড়ের নীচে জ্বলজ্বল করতে লাগল বাঘের আঁচড়ের দাগটা। সম্বলের মধ্যে তো ধামার মতো একটা পিলে। গায়ে জোর নেই বলে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে না, মেয়েদের দলে মিশে পাতা তুলতে আসে বাগানে। আর সেই রাজুয়ার দৃষ্টিতেই কিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান!

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল মধুবাবুর—যেন রাজুয়াকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। পায়ের ভারী জুতোটা মসমস করে এগিয়ে গেল সে।

রাজুয়ার চোখ তখন নেমে গেছে, কিন্তু উত্তেজনায় তার হাত ছ'টো যে থর থর করে কাঁপছে সেটা মধুবাবুর দৃষ্টি এড়ালো না।

অগ্নিগর্ভ চোখ মেলে মধুবাবু রাজুয়ার কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই প্রকাণ্ড হাতের একটা দশ সেরী চড় এসে পড়ল রাজুয়ার গালে। চড়ের শব্দে সমস্ত প্লটটা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

—হতভাগা, রাস্কেল! কী করেছিস তুই?

চড় খেয়ে রাজুয়া একটা গাছের ওপর উল্টে পড়েছিল। টলতে টলতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কেন মারলি বাবু?

—মারব না ? হতভাগা, শুয়ার ! ক'ইঞ্চি নামিয়ে ফেলেছিল খেয়াল আছে ? তাকিয়ে ত্মাখ দেখি একবার।

অপরাধ হয়ে গেছে সত্যিই। মানসিক উত্তেজনায় কখন যে প্লাকিং নামিয়ে ফেলেছে, রাজুয়ার তা' খেয়াল হয়নি। কিন্তু এমন মারাত্মক কিছু নয়—এ ভুল হামেশাই হয়। মানুষ কল নয়, হাত ঠিক থাকতে পারে না সব সময়ে। কিন্তু শাস্তি যেখানে দিতেই হবে—অপরাধ সেখানে যত গৌণই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

—ভুল্ হয়ে গেছে বাবু।

—ভুল হয়ে গেছে !

বিশ্রী রকমভাবে খড় বড় দাঁতগুলোকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে মধুবাবু খিঁচিয়ে উঠল—লজ্জা করে না ? পুরুষ হয়ে মেয়েদের সঙ্গে পাতি তুলতে এসেছিস, তবু হাত ঠিক থাকে না ? ব্যাটা গো-ভূত, জানোয়ার কোথাকার !

সমস্ত প্লট জুড়ে মেয়েদের হাসি উত্তাল হয়ে উঠেছে। জল-তরঙ্গের বাজনা নয়, দুপুরের জ্বলন্ত রৌদ্রে যেন বিষ মাথানো তীরের মতো তাদের হাসি এসে বিঁধছে রাজুয়ার গায়ে। গালে প্রচণ্ড চড়টা বিছুটির আঘাতের মতো জ্বালা করছে। চোখের কোণে জল এসেছিল, কিন্তু মনের উত্তাপে সে জল শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

মেয়েরা হাসছে—উচ্ছলিত হাসির আবেগে তাদের কালো কালো সুঠাম শরীরে যেন রূপের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। রাজুয়ার পায়ের নীচে মাটি কাঁপতে লাগল। খুন করবে—মধুবাবুকে খুন করে ফেলবে সে। যদি সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনোদিন কুলি লাইনের কাছে পায়, তা' হলে দায়ের এক কোপে সোজা মাথাটা নামিয়ে দেবে মাটিতে।

—ভো—ও—ও……

ফ্যাক্টরীর বাঁশি বাজল—বারোটার বাঁশি। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল পাতি

তোলা। সকালের কাজ এইখানেই শেষ। এইবারে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পাতা জমা দিতে হবে—কাজের ওজন মতো পয়সা মিলবে।

—ভোঁ—ও—ও………

বাঁশি ডাকছে অধৈর্য্যভাবে। লাইন ভেঙে সমস্ত দল ঊর্ধশ্বাসে ছুটল ফ্যাক্টরীর দিকে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল মধুবাবু। হারিয়ে গেল টুনি, হারিয়ে গেল রাজুয়া।

ফ্যাক্টরীর কিন্তু বিশ্রাম নেই।

সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত যন্ত্রগুলো অব্যাহত নিয়মে গর্জন করে চলে। জালের ওপরে মেলে দিয়ে পাতাগুলো উইদারিং করা হয়—যন্ত্রের নির্মম পেষণে সবুজ রসটা নিষ্কাশিত করে এনে ফেলা হয় ড্রায়িং মেশিনে। লেভার হাতলে টান পড়ে, ঘুরন্ত চালনীর ওপরে সাত পাক ঘুরে তলায় এসে জমা হয় চা। তারপরে সর্টিং—বেল্ডিং—অরেঞ্জপিকো, পিকো ফ্যানিংস—কত বিচিত্র নাম। ওদিকে কুলি লাইনের জীর্ণ খড়ো চালগুলোর ওপর ঘনায় বিষণ্ণ অন্ধকার—সারাদিন নাইট্রোজেন টেনে সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ চা গাছ কার্বনের বিষ নিশ্বাস ছাড়ে। ম্যালেরিয়া—কালাজ্বর—অস্বাস্থ্য। মেশিনের উত্তাপে, লোহার কোলাহলে, রোষ্টিংয়ের কটু বাষ্পে আর ক্রুড অয়েলের দুর্গন্ধের মধ্যে কুলিরা কাজ করে। আর সুদূর শহরে ঠিক সেই সময়ে সোণালি চায়ের পাত্র সামনে সাজিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার আসর জমে ওঠে—রেডিয়োতে উদাস করা ক্লারিয়োনেট বাজতে থাকে। চায়ের টেবিলে স্বপ্ন নামে, মনে পড়ে যায় কোথায় পিয়ালি নদীর ধারে তমাল কুঞ্জ—সেখানে সাঁওতাল পুরুষের মাদলের তালে সাঁওতাল মেয়ে নাচছে লীলায়িত ছন্দে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেউ কেউ ভাবে, এর চাইতে সাঁওতাল হতে পারলেই ছিল ভালো।

কিন্তু চা বাগানের সাঁওতালেরা তা' ভাবে না। পিয়ালী নদীর ধারে পেটের ভাতের সংস্থান হয় না, তাই চা বাগানে কাজ করতে এসেছে।

কোথায় গেছে মাদল—ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা' ফ্যাক্টরীর কাঁকর মেশানো ধুলোতে। মহুয়ার মদ নেই, দেশী মদের দাম উঠেছে পাঁচগুণ। নাচবার মতো পায়ে আর জোর নেই—এনোফিলিস, বহু আগেই চুষে নিংড়ে শেষ করে দিয়েছে সব। ৲

ফ্যাক্টরীর পেছন দিককার কাঠের সিঁড়িটা অন্ধকার। রাজুয়া নীরবে তারই ওপরে এসে বসল। বাঁদিকে বাবুদের কোয়ার্টারগুলো বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। আর সেই মাঠ পেরিয়ে যতদূর চোখ যায় শিরীষের ছায়ায় ছায়ায় এক হাজার একরের বাগান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে তরল তমিস্রার নীচে। তারও ওপার পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে নভোস্পর্শী শালের বন—একেবারে টেরাই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

—কোন্ বৈঠা হুয়া হিয়াপর ?

গম্ভীর কঠিন গলা, পাঞ্জাবী কুলি সর্দারের প্রকাণ্ড মুখ আর চাপ-দাড়ি যেন অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

—রাজুয়া।

—রাজুয়া ? হাঃ হাঃ হাঃ.......

অয়েল ইঞ্জিনের মতো শব্দ করে গম্ভীর চড়া গলায় পাঞ্জাবী কুলি সর্দার হেসে উঠল,—বহুৎ আচ্ছা, হাওয়া খাও। পাত্তি তোড়নে মে বহুৎ ভারী মেহনৎ—আঁ—হাঁ ?

নাগড়া জুতোর মস মস শব্দ ফ্যাক্টরীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

কালো অন্ধকারে কালো শরীরটাকে মিলিয়ে দিয়ে বসে রইল রাজুয়া। সবাই তাকে অপমান করে—অবজ্ঞা করে তাকে। দুর্বল শরীর, অপটু স্বাস্থ্য—প্রত্যেকের কাছে একান্তভাবে পরিহাসের বিষয়। তাকে এরা কৃপার চোখে দেখে, মেয়েদের চাইতেও অপটু জীব বলে কল্পনা করে।

কিন্তু কেন এমন হল ? কে এমন করে দিলে তাকে ? দুমকা থেকে যখন এসেছিল, তখনও তো পাথরের মতো ছিল তার স্বাস্থ্য। তার শরীর

দেখে হিংসে করত পুরুষেরা, উজ্জ্বল প্রসন্ন চোখে তাকাতো মেয়ের দল। তার হাতের ছোঁয়ায় যৌবনের আনন্দে মাদল যেন কথা কয়ে উঠত। রোলিং মেশিনে কাজ করেছে, ড্রায়িংএ কাজ করেছে, ডায়নামোতে বেল্ট পরিয়েছে, সারা দুপুর হিউয়িং করেছে। সে সব দিন কোথায় গেল?

এই চায়ের বাগান শুষে খেল তাকে। এখানকার বাতাস যেন চুমুক দিয়ে টেনে নিলে তার শরীরের সমস্ত রক্ত। যেমন করে তাদের সাঁওতাল পরগণায় অভিচার-সিদ্ধ গুণিনেরা পিশাচ চালান দিয়ে টাট্‌কা মানুষের হৃৎপিণ্ড খাইয়ে দেয়, ঠিক তেমনি করে।

রাজুয়ার মনে হল, এই হাজার বিঘার বাগানটাও পিশাচে পাওয়া—কারো নিস্তার নেই, কেউ রক্ষা পাবে না। টানা দু'বছর ধরে কালা জ্বরে ভুগবার পরে আজ আর হাড়-চামড়া ছাড়া তার কোনো অবলম্বন নেই। সমস্ত জীবনটাই যেন ওর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মধুবাবু ওকে চড় মেরেছে। যদি শরীরে একটুও শক্তি থাকত, তা' হলে কি মুখ বুজে সয়ে যেত এই অপমানের জ্বালা? এক ঘুষিতে মধুবাবুর উঁচু উঁচু দাঁতগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মিলিটারীদের সঙ্গে কাজ করতে চলে যেত আসামে। কিন্তু এই শরীর তাকে অপটু, অসহায় করে ফেলেছে—বেঁধে ফেলেছে মৃত্যুর শিকলে। এখান থেকে নড়বার পথ নেই তার। আর টুনি। দু'বছর আগে ওর সঙ্গে টুনির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর স্বাস্থ্যের জন্যে টুনির বাপ শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে ভেঙে দিলে।

দুর্বল শরীরে তবু রক্ত চন চন করে উঠল। ওই মধুবাবু! ওই মধুবাবুকে সে খুন করে ফেলবে—যেদিন হোক—যেমন করে হোক।

কাঠের সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ।

—কে?

—টুনি।

হাল্কা পা ফেলে টুনি উঠে এল ওপরে।

—এখানে বসে আছিস রাজুয়া ?

—আছিই তো। তোর কী তাতে ?

—চটছিস কেন ?

অন্ধকারের মধ্যে টুনির মিষ্টি হাসির শব্দ শোনা গেল।

—আমার ওপরে রাগ করেছিস ? আমি তো তোকে মারিনি।

মারেনি। কিন্তু মারলে এর চাইতে সে বেশী আর কী করতে পারত ? গায়ের মধ্যে রক্ত ফুটছে—রাজুয়া চুপ করে রইল। অন্ধকার নির্জন সিঁড়ি। ইচ্ছে করলেই টুনিকে বুকের ভেতর টেনে নিতে পারে, পিষে ফেলতে পারে একেবারে। কিন্তু শক্তি নেই শরীরে, শক্তি নেই মনে। চোখের সামনে মধুবাবুর অশরীরী মূর্তিটা যেন একটা নির্মম দুঃস্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে। রোদে জলে পোড়া ছ'ফুট দীর্ঘ চেহারা—মুখের হাসিতে লোলুপ নিষ্ঠুরতা। ঘাড়ের নীচে শোভা পাচ্ছে বাঘের আঁচড়ের জয় টীকা। কথায় কথায় হাত চলে, লাঠি চলে। ম্যানেজারের আপনার লোক সে—বাগানে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ।

—মধুবাবু তোকে মারলে ভারী দুঃখ লাগল আমার। একটু সাবধান হয়ে কাজ করলেই তো পারিস।

রাজুয়া তবু জবাব দিলে না।

টুনির কণ্ঠ স্নেহ স্নিগ্ধ—কেন এত কাহিল তুই ? কেন তুই পুরুষের মতো তেজীয়ান হয়ে উঠতে পারিস না ? কেন বোকার মতো পড়ে পড়ে মার খাস ?

তীক্ষ্ণ, তীব্র গলায় রাজুয়া বললে,—তুই এখান থেকে যা' টুনি।

আচমকা টুনি হেসে উঠল। কোথা থেকে কী হল কে জানে, তার কণ্ঠস্বরে সেই স্নেহ আর সহানুভূতির আবেশ যেন মুহূর্তে কুয়াশার মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

—আমি যাব এখান থেকে ? কেন ? তুইই তো যাবি। সত্যি আর বসে থাকিসনে রাজুয়া। তোর দুবলা শরীর, ঠাণ্ডা লাগবে।

—আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

—আমি ভাবব কেন?

নিষ্ঠুরভাবে হাসতে লাগল টুনি।

—মধুবাবু ভাবছে। এক্ষুনি এখানে আসবার কথা আছে তার। এই বেলা পালা রাজুয়া।

বিদ্যুৎবেগে রাজুয়া উঠে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে যদি এই অন্ধকারে প্রাণ-পণে গলাটা টিপে ধরে, তা'হলে কতক্ষণ হাসতে পারে টুনি? কিন্তু কিছুই করল না রাজুয়া—শুধু ক্ষিপ্রবেগে নেমে গেল নীচে।

সিঁড়িতে হাসির শব্দ—টুনি হাসছে। কালো অন্ধকারের মধ্যে সে হাসিটা যেন পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে।

এরপর দু'দিন চলে গেল, বাগানে আর পাতি তুলতে এল না রাজুয়া, কিন্তু দু'হাজার কুলির মধ্যে ওর কথা ভাববার মতো সময় নেই কারো। অবিশ্রান্ত গর্জন চলেছে যন্ত্রের। হাজার হাজার পাউণ্ড চা—ব্ল্যাক টী, গ্রীণ টী। যুদ্ধের দাবী—সভ্যতার দাবী। শহরের ড্রইং রুমে সোনালী চায়ের পাত্র সামনে নিয়ে সোনালী স্বপ্নের বাসর।

দু'দিন বসে বসে রাজুয়া শান দিলে সড়কিতে। ঝক্‌ঝকে করে তুলল সাঁওতালী তীরের ফলাগুলো। একটু গোখ্‌রো সাপের বিষ পেলে মাখিয়ে নিত ওর কাঁড়ের মাথায়। তার পরে অব্যর্থ লক্ষ্য। রক্তের মধ্যে একবার সে বিষ মিশলে আর দেখতে হবে না।

সেদিন ভোরে কুলি লাইনে গুর গুর করে সাড়া পড়ল মাদলের। রাজুয়ার যেন চমক ভেঙে গেল। দূরে কারখানার প্রথম বাঁশি বেজে উঠেছে। কিন্তু সে বাঁশির শব্দ ছাপিয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই মাদলের গুরু-গর্জন। ম্যালেরিয়া—মন্থর রক্তের লক্ষ লক্ষ কণিকায় জোয়ারের ডাক।

মাদলে এ কিসের সঙ্কেত? বসন্ত রাত্রে মহুয়ার নেশায় বিহ্বল হয়ে যে মাদল বাজে এ তো সে নয়। এই মাদলের শব্দে মনে পড়ে যায় তার দেশের কথা—ভুলে যাওয়া একটা বলিষ্ঠ জীবন—একটা অমিত শক্তিমান জীবনের

থা। পাহাড়ের মাথায় নেমেছে কালো মেঘের ঘনবর্ষণ। পাথর গুঁড়িয়ে নামছে ঝোরার জল,—নদীতে বান ডেকেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে শালের ফুল—হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শালের পাতা। শিকারের ডাক। বাঘ, ভালুক, বরা বর্ষার জলে দিশেহারা হয়ে গেছে—কাঁড়ের ফলায় তাদের গেঁথে ফেলবার এই সুবর্ণ সুযোগ।

রাজুয়া বেরিয়ে এল বাইরে। মাদলে সাড়া দিয়েছে রণদামামা—কুলি লাইনের সব জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সার বেঁধে। তাদের পিঠে ধনুক, হাতে বল্লম। যেন যুদ্ধযাত্রা করছে সব।

—কিরে, কোথায় যাচ্ছিস সব?

—আজ বিশুয়া।

বিশুয়া! তাই বটে। পয়লা বৈশাখ। বছরের এই প্রথম দিনটিতে আদিম পৃথিবীর সন্তানেরা বার হয় শিকার করতে—আজ তাদের শিকারের পর্ব দিন। তাদের হিংস্র আরণ্য জীবনের নব-বার্ষিকী বোধন উৎসব। ফ্যাক্টরীর জোয়ানেরা সবাই ছুটি পাবে আজকে—রাজার জঙ্গলে শিকারে আজ আর বিধিনিষেধ নেই। চা বাগানের মালিকেরা সব সময়ে অবিবেচক নয়।

—আমি যাবো বিশুয়া খেলতে।

—তুই!

মাদলের শব্দ ছাপিয়ে মুখর হয়ে উঠল অট্টহাসি—তরল তীক্ষ্ণ হাসির কলরোল। মোটা তারের চাইতে সরু তারের ঝঙ্কারটাই কানের মধ্যে তীব্রতর ভাবে আঘাত করে। ওপাশে সব চাইতে বেশি করে হাসছে টুনিই না? কিন্তু এবার আর রাজুয়ার মাথা সঙ্কোচে নুইয়ে গেল না মাটিতে। চোখের অতসী কাঁচ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ল সূর্য্যের আলো। মধুবাবুর পালা পরে আসবে, তার আগে—

—আমি যাচ্ছি জঙ্গলে।

এক লাফে ঘরে ঢুকল রাজুয়া—বের করে নিয়ে এল শান দেওয়া সড়কী, চকচকে কাঁড়।

জোয়ানেরা আবার প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল—টুনি হাসিতে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়ছে। রাজুয়া আর সেখানে দাঁড়ালো না—একাই সে শিকারে যাবে, একা হাতেই মেরে আনবে সে জানোয়ার। নক্ষত্রবেগে রাজুয়া এগিয়ে গেল বনের দিকে।

বাগানের সীমানা পেরিয়েই শালের বন। ষোল সতেরো মাইল ধরে টানা এই জঙ্গল; তিস্তার পাশ দিয়ে একেবারে টেরাইয়ের অরণ্যে গিয়ে মিশেছে। এক হাতে সড়কী বাগিয়ে ধরে রাজুয়া ঢুকল জঙ্গলের মধ্যে।

লতা-গুল্মে জটিল হয়ে শালের বন চলেছে। মাথার ওপরে আকাশ দেখা যায় না। পায়ের তলায় শুকনো শালের পাতা মড় মড় করছে। কয়েকদিন আগে দাবানল জেগেছিল এই অরণ্যে—শালের শুকনো চারাগুলো পোড়া তামাটে রঙ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে হরিয়াল ডাকছে, ঘুঘু ডাকছে, সামনে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে বন-মুরগী। থেকে থেকে কাঁটা গাছের চাবুক শপাৎ করে মুখের ওপর এসে পড়ছে।

ওটা ওখান দিয়ে কী দৌড়ে গেল? নিশ্চয় সম্বর। ওর একটাকে বসাতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। এখান ওখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে বন-মুরগী। একটা মোরগ, একটা মুরগী আর দু'তিনটে বাচ্চার একটা সম্পূর্ণ সংসার। ইচ্ছে করলেই ওদের কতগুলো সংগ্রহ করা চলে। কিন্তু ছোট শিকারের ওপর রাজুয়ার লোভ নেই, আজ বড় শিকার সে মারবে—বাঘ, ভালুক, সম্বর, নীল গাই—হাতের কাছে যা' আসে।

সামনেই প্রায় দশ হাত নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝোরার ক্ষীণ ধারা। এখানে ওখানে পচা-কাঠের টুকরো জলের মধ্যে পড়ে আছে—ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি নুড়ি। আর ঝোরার দু'পাশে ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাপে মিশে দুর্ভেদ্য আরণ্যময়তা। ওই সব জঙ্গলের মধ্যেই জানোয়ারের আস্তানা।

ঝোরা থেকে জল খায়, দুপুরের খর-রৌদ্রের সময় সূর্য্যহীন জঙ্গলের নীল ছায়ায়—ঠাণ্ডা নরম কালো মাটিতে বসে জিভ মেলে হাঁপায়।

জঙ্গল ভেঙে চলেছে রাজুয়া। বেতের কাঁটায় গা-হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে বাজছে ধারালো নুড়ি। হাঁটু পর্য্যন্ত বসে যাচ্ছে জলে আর কালো কাদায়। কিন্তু কোথায় শিকার?

ঝর—ঝর—ঝর—

ওদিকে জঙ্গল নড়ে উঠল। কী একটা জানোয়ার দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দও যেন কানে এল। নিশ্চয় বরা।

রাজুয়ার সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। জ্বরতপ্ত জ্বলন্ত শরীরে নতুন সাড়া দিলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিশানা ঠিক করে নিয়ে প্রাণপণে বল্লম ছুঁড়ে দিলে রাজুয়া। সাঁওতাল পরগণার পাহাড় থেকে শেখা—শব্দ-ভেদী লক্ষ্য। আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ফাটানো গর্জন। যেন জঙ্গলের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল একটা। শাল গাছগুলো আতঙ্কে যেন আর্তনাদ করে উঠল—চারদিকে ছিটকে উড়ে গেল বন-মুরগী। আর জঙ্গল ভেদ করে হাওয়ার মুখে প্রায় আট হাত উঁচু দিয়ে একটা বিরাট সোনালি আগুন রাজুয়ার গায়ের ওপর এসে উড়ে পড়ল—পরক্ষণেই অরণ্য আলোড়িত করে মিলিয়ে গেল আবার। বরা নয়, গুল-বাঘ নয়—প্রকাণ্ড ডোরাদার। ঝোরার পাশে কাদা আর নুড়ির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাজুয়া।

কুলিয়া বিকেলের দিকে ও:কে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। ডোরাবাঘের থাবায় বুকের ডান দিক থেকে খানিকটা মাংস উড়ে গেছে—বেরিয়ে পড়েছে হাড়গুলো। গালের এক পাশে চামড়া নেই, নগ্ন মাড়ির ভেতর থেকে রক্তাক্ত দাঁতগুলো শুধু উদ্ভাসিত হয়ে গেছে—সেদিকে তাকানো চলে না। অরণ্য-রাজের একটি থাবাতেই যা' হওয়ার তা' হয়ে গেছে।

বাগানের বাবুরা দেখতে এলেন। মধুবাবুর দয়ার শরীর। বললে—ডাক্তার বাবু, একটা এ্যান্টি-টিটেনাস সিরাম দিলে—

ডাক্তারবাবু করুণাভরে হাসলেন।

কোথায় মশাই এ্যান্টি-টিটেনাস সিরাম? কোথায় বা স্ট্রেপ্টোকোকাস্? যুদ্ধের দৌলতে ডিস পেন্সারীতে আছে নাকি কিছু? একটা গরুর গাড়ীতে করে বরং কাল সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, গ্যাংগ্রীন না হয়তো বেঁচে যাবে।

মধুবাবু বললে,—নিতান্ত বেকুব হতভাগাটা। গায়ে এক কড়ির জোর নেই—একা একা ওই অজগর জঙ্গলে গেছে শিকার করতে। যেচে মরণটাকে ডেকে আনল।

আচ্ছন্ন চোখ মেলে রাজুয়া তাকালো একবার। কিছু মনে পড়ছে না। অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে—ম্যানেজারবাবু, ডাক্তারবাবু, মধুবাবু, কুলিরা, আরও অনেকে। ওপাশে দাঁড়িয়ে কে? টুনি না? টুনিই তো।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য। টুনি হাসছে না—এতটুকুও না। বরং কী অদ্ভুত করুণভাবে সে তাকাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাজুয়া আবার চোখ বুজল।

অপরাধ

ঋষি দাস

সকাল বেলা সমীরের ডাক পড়ল বাবার ঘরে। ডাকের কারণটা যে কি, আন্দাজে অনুভব করলে সমীর। ক'দিন ধরে কানাঘুষা শুনছে বাড়ীর ভেতর, শুনছে আড়ালে আবডালে থেকে মত অমত, বাদ প্রতিবাদ, তর্ক বিতর্ক—তাকে নিয়ে, অথচ তাকেই সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। তার বিয়ে, এই মাসেই। কিন্তু এ বিয়েতে মায়ের একেবারে মত নেই। বোনদের তো বটেই। তার নিজেরও আন্তরিক আপত্তি। কিন্তু সুরেশ বাবু—সমীরের বাবা, অত্যন্ত কড়া মানুষ। বলেন,—আমি কথা দিয়েছি নবীনকে। আর তোমরা সবাই জটলা করে, ষড়যন্ত্র করে, আমার অমত করাতে চাও? আমি কোনো মতেই তা' হতে দেব না।

নবীন বাবু, সুরেশ বাবুর বাল্য-বন্ধু। গাঁয়ের এক পাঠশালায় তাঁরা পড়েছিলেন। কিন্তু গোড়া থেকেই বীণাপানির কেমন একটা অকারণ অকৃপা ছিল এই নবীনের ওপর। অকৃপার কারণটা যে কি, তাও জানা যায় নি। দেবতাদের রীতি বোঝাই ভার। নবীনই ছিল পাঠশালার বা ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বাণীর সবচেয়ে বড় ভক্ত—অন্ততপক্ষে স্বরস্বতী পুজোর সময় চাঁদা আদায় আর হৈ-চৈএ সে ছিল অগ্রণী মুখপাত্র। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় তার সেই আয়ত অর্ধনিমীলিত চক্ষু, গদগদ ভাষা, মিনতিভরা কণ্ঠস্বর ছিল দেখার মত, শোনার মত। কিন্তু তবু একগুঁয়ে স্বরস্বতীর সেই ক্রমাগত উপেক্ষা—বোধ হয় নবীনের গায়ের রঙ্টা কালো বলেই। শ্বেতাঙ্গী স্বরস্বতীর

সাদা রঙএর ওপরই টান অন্যায় রকম একটু বেশী,—শ্বেত হংস থেকে সুরু করে সাহেব মেম পর্য্যন্ত। কিন্তু আরাধনার অধ্যাবসায় আর রইল না নবীনের। চুলোয় যাক্ স্বরস্বতী; নিগ্রোর মত চেহারা নবীন রায়ের উপর কৃপা তাঁর হবে না। তাই কাল বিলম্ব না করে হাই ইস্কুলের অর্দ্ধপথ থেকে হঠাৎ পিটটান্ দিয়ে নবীন উঠলো এসে লক্ষ্মীর মন্দিরে—বড়বাজারের এক লোহা-লক্কড়ের আড়তে। শ্বেতাঙ্গী স্বরস্বতীর মত পীতাঙ্গী লক্ষ্মীর অত সৌন্দর্য্য জ্ঞান বা রুচির বালাই নেই। তিনি যেন খাস বাংলার গেঁয়ো বউ। অধ্যাবসায়, একনিষ্ঠা আর যৎসামান্য বুদ্ধি হলেই তাঁর চলে। culture চাইনে। ঝর ঝরে wit এর প্রয়োজন নেই। তাই তো তাঁর বাহন হল পাখীর সেরা প্যাঁচা। প্যাঁচা কোন গুণে মা-লক্ষ্মীর কৃপার অধিকারী হল, সে কথা বুঝি নবীন ইস্কুলের ধাপে ধাপে আছাড় খেতে খেতে ভেবেছিল একদিন।

প্যাঁচার মত নবীন রায় তারপর কৃপাও পেয়েছিল নারায়ণীর। হঠাৎ যুদ্ধ বেধে গেল পৃথিবীতে ১৯১৪ সালে। বিশ বছরের ছোকরা নবীন রায় এক দাঁওয়ে বিশ হাজার টাকা কামিয়ে নিলে। স্বরস্বতীর কৃপা, ছোঃ! কারণ, রাবণ রাজার মত সে আজ বাড়ীতে দশটা প্রফেসর পুষতে পারে হেসে খেলে। পুষছেও। তার একমাত্র মেয়ে কল্যাণী পড়ছে বি, এ। টুইসনি করার জন্যে চার চারটে ফার্ষ্ট-ক্লাস এম, এ। নবীন রায় যেন প্রতিশোধ নিতে চায়,—হে বিদ্যাদায়িনী, তোমার বিত্তের ঝাঁপির ওপর পুরুষের লোভ নেই—পৌরষের প্রমাণ আছে লোহালক্কড়ের সঙ্গে যুদ্ধে। তোমার ওই নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কেতাব মুখস্ত করায় নয়। ও সাজে মেয়েদের—ও কাজটা আসলে মেয়েদেরই।

নবীন রায় জিতেও যাবে দেখছি। কল্যাণী খুব ভালো মেয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম করেছে ইতিমধ্যেই।

এই কল্যাণীর সঙ্গেই সমীরের বিয়ে দিতে চান সুরেশ সরকার। সুরেশ সরকারের পিতৃপুরুষের ওপর ছিল চঞ্চলার অচঞ্চল স্নেহ। উত্তরাধিকার বলে সুরেশ সরকার সেই স্নেহের একমাত্র হকদার। তাছাড়া, স্বরস্বতীর অকুণ্ঠিত

করুণাও আছে তাঁর ওপর। সরকার ঘেঁষা লোক তিনি। বহু সাহেব-সুবো তাঁর বন্ধু। জীবনে অনেক বাহাদুরি করে সম্প্রতি রায়বাহাদুর হয়েছেন। কল্যাণীর সঙ্গে সমীরের বিয়ের পরিকল্পনাও সেই বাহাদুরির আর একটা প্রমাণ। নবীন রায়ের একমাত্র মেয়ে এই কল্যাণী, বিরাট সম্পত্তির কল্যাণময় উত্তরাধিকার তার একার। তাছাড়া মেয়েটি শিক্ষিতা। আর সৌন্দর্য্য! কল্যাণী ওদিকে একটু হার মেনেছে বটে। তবে, সুরেশ সরকারের ওকালতি করা বুদ্ধি। সৌন্দর্য্য তো একটা সাবজেক্টিব ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে ঠিক করেছেন তিনি, 'মানুষের পুঞ্জীভূত সংস্কারের অন্তরালে এই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিলোক। যা' একজনের কাছে সুন্দর, অন্যজনের কাছে তা' অসুন্দর হতে পারে। সৌন্দর্য্যের কোন সুনির্ধারিত মাপকাঠি নেই। চীনেরা ভাবে, গোড়ালি মাত্র, পা-ই হচ্ছে চরণ-কমল, সৌন্দর্য্যলোকের অনুপম সে সৃষ্টি। নিগ্রোরা যুগ যুগ ধরে তাদের ঠোঁট বাড়াবার জন্য কি সাধনাই না করে আসছে! কিন্তু চীনা সুন্দরীদের গোড়ালিমাত্র পা আর নিগ্রোদের প্রস্ফুরিত ঠোঁট কেমন লাগে আমাদের? শুধু কি তাই! আমরা চাই মেয়েদের আজানুলম্বিত কেশপাশ —কিন্তু সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশীয়েরা চায়, ছাটা চুলের লীলায়িত স্তবক।

কিন্তু সুরেশ বাবুর স্ত্রী—সমীরের মা উমাদেবী বলেন,—কালো মেয়ে ঘরে আনবো? তুমি যে কী? আমার কত সাধের একমাত্র ছেলে।

সমীর, উমাদেবীর ছেলেদের মধ্যে সবার বড়। তারপরে পর পর পাঁচটি মেয়ে। তিন জনের বিয়ে হয়ে গেছে। আর দু'টি—লীলা আর নীলা। লীলা হাই ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে আর নীলার বয়স মাত্র ছয়।

বড়দিনের ছুটিতে সমীরের মেজো বোন ইলাও এসেছিল বাপের বাড়ীতে, সরকারী চাকুরীওয়ালা স্বামীর সঙ্গে। বাবার প্রস্তাবটিকে হেসেই উড়িয়ে দিলে সে। বললে,—কলির সঙ্গে দাদার বিয়ে? ইস্!

তারপর সমীরকে লক্ষ করে বললে,—খবরদার দাদা, এমন চোর মেয়ে বাড়ীতে তুমি এনো না বলছি।

চোর! সবাই বিস্মিত হয়ে গেল, কৌতূহলে সবার চোখ বড় হয়ে উঠলো। ইলা বলতে লাগলো,—তুমি তো জানো না দাদা, কলি আমাদেরই সঙ্গে পড়ত। ক্লাসের কেউ ওর সাথে ভালো করে কথাই কইত না। আজ এর পেনসিল, কাল ওর কলম, পরশু তার খাতা—এমনি সব চুরি যেত। কে চুরি করে? আমাদের সবার সন্দেহ হোত ওকেই। তারপর হঠাৎ একদিন স্কুলের পাশে একটা দোকানে হৈ-চৈ ব্যাপার। অনেক লোক জড় হয়ে গেছে। আমরা গিয়ে দেখি, কলিকে দোকানদার ধরেছে—পেনসিল না কি চুরি করেছিল।

সবাই হো-হো করে হেসে লুটোপুটি। সমীর কিন্তু হাসতে চেষ্টা করেও পারলো না। তার সারা মুখে কে যেন চুণকালি মেখে দিল।

লীলা বললে—হ্যাঁ, চোরকে বাড়ীর বউ করে নিয়ে এস! আমরা কিন্তু কেউ বউদি বলে ডাকবো না।

কল্যাণীর এই অপবাদকে অবশ্যি সুরেশ বাবু আর উমাদেবী কেউই কানে তোলেন নি। ছোটবেলা কি করেছে তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর বয়স তাঁদের নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা সমীর কোনো মতেই ভুলতে পারলো না। অদ্ভুত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতিতে তার সর্বাঙ্গ শিরশির করতে লাগলো—যেন চুরি সে নিজেই করেছে! তবু তো বিয়ের এখনো ঠিক নেই!

সমীর এসে বাবার বসবার ঘরে ঢুকলো অপরাধীর মত। সুরেশ বাবু বললেন—কিহে, তোমার মত কি? মত যাই হোক, আমি ওসব শুনব না। আমি যখন কথা দিয়েছি তাকে।

সমীর পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সুরেশ বাবু একটু থেমে আবার বললেন,—আমি তবে দিন স্থির করে ফেলি। কি, কথা কইছ না যে?

সমীর চিঁ-চিঁ করে কি জবাব দিল, সুরেশ বাবু তাতে কান দিলেন না। চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন। সমীর জানত বাবার এই অবস্থা বিশেষের অর্থ কি। তাই সে চুপিচুপি বাইরে পালিয়ে গেল। আর কোনো উপায় নেই। অবশেষে তার বিয়ে হবে ওই চোর মেয়েটার সঙ্গেই?

সমীর নিজের ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসল। সুরেশ বাবুর ঘর থেকে বেরোবার সময় সমীরের মুখের চেহারাটা দেখেছিলেন উমাদেবী। তিনি ছেলের পেছু পেছু ঘরে ঢুকে বললেন,—উনি যাই বলুন, এ বিয়ে আমি তোর কিছুতেই হতে দেব না, খোকা।

সমীরের পাশে এসে তিনি ওর উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলোকে সাজিয়ে দিতে দিতে বললেন,—শুধু টাকার লোভে এত বড় অবিচার আমি সইব না। আমার একটা মাত্র ছেলে—

সমীর মায়ের মুখের দিকে তাকালো। মার সমস্ত মুখখানি স্নেহ ও শুভেচ্ছায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সত্যিই তো সমীরও এ কথাটা কতবার ভেবেছে, সে ধনী বাপ-মার একমাত্র ছেলে, তবু তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থেরলোভে বিয়ে করতে হবে? ছি ছি! সমীর মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় গুম হয়ে বসে রইল।

মা বলতে লাগলেন,—একটা মাত্র বউ আসবে ঘরে, তাও মনের মত হবে না—কালো, কুচ্ছিত। সে আমি সইতে পারব না বাপু।

পরদিন কর্তা বললেন স্ত্রীকে—বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছে করো! বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে আমি আর নেই।

মৃদু হাস্যে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন উমা! তিনি জানেন, পুরুষ মানুষের রাগের সীমা কতদুর।

সমীর এ যাত্রা নিষ্কৃতি পেলো। ধন্যবাদটা পুরোপুরি মায়ের পাওনা। সে যে তাঁর কত আদরের একমাত্র ছেলে।

সত্যিই সমীর চিরদিনই মায়ের আদুরে ছেলে। সে-ই প্রথম এসেছিল মায়ের কোলে। তারপর তার মত আর কেউ আসে নি, বারে বারে এসেছে মেয়েরা। উমা প্রতিবার ভেবেছেন, এবার হয়তো একটা খোকা আসবে। কিন্তু প্রতিবারেই এসেছে খুকীরা। তিনি হেসে মনে মনে ভেবেছেন, এক সমুই যে তাঁর শত পুত্রের সমান। আর ওমনি তাঁর সমস্ত স্নেহধারা অসংকোচে অকৃপণভাবে ঝরে পড়েছে ওর ওপর।

প্রতিদিন সমুর কাছে বসে তার সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা গল্প না করলে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যেত। সমীরেরও ভালো লাগত না। বোনেরা ঠাট্টা করত দাদাকে বুড়ো খোকা বলে। বলত, লবনচুষ খাবে? কখনো বা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মার কাছে নালিশ করত, এ তোমার ভারী অন্যায় মা। দাদা আমাদের চেয়ে কত বড়, তবু ওকে এখনো আদর করো আর আমরা হয়ে গেলুম সব ধিঙ্গি বুড়ো মেয়ে। তোমার দু' চোখের বিষ।

উমাদেবী মৃদু হেসে বলেন—ওযে একলা, আর তোরা পাঁচ জন। ওর আর পাঁচটা ভাই থাকলে তারা সবাই যা' পেত, তা' যে ওর একারই পাওনা।

ছ' বছরের ছোট মেয়ে লীলা মার কোল ঘেঁষে পিট্ পিট্ করে মার মুখের দিকে তাকায়। সমীর মামলা জয়ের আনন্দে কৌতুকের সঙ্গে হাসে।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা পরিবর্তন এলো সংসারে। পরিবর্তনটা এসেছে উমাদেবীকে কেন্দ্র করে। তাঁর শান্ত সৌম্য সংযত মুখখানা যেন হঠাৎ একটা সুগভীর বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। পৃথিবীর সবার ওপরেই যেন তাঁর রাগ। সমীর লক্ষ্য করেছে, কথায় কথায় আজকাল মার সঙ্গে বাবার প্রায়ই ঝগড়া হয়—অতি তুচ্ছ কথায়। বাবা সাতটা কথা জিজ্ঞাসা করলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দেন মা। বাবা রাগ করেন না, প্রতিবাদ করেন না। এ যেন তাঁর ন্যায্য পাওনা। শুধু অপরাধীর মত মুখ কাঁচুমাচু করে পালিয়ে যান। যেন বিরাট একটা অপরাধ করেছেন তিনি। এ অপরাধের জন্য তিনি স্ত্রীর কাছে পরম লজ্জিত। তাঁর চরিত্রের মধ্যেও অকস্মাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেছে। দৃঢ় বলিষ্ঠ সে মনোভাব তাঁর নেই। যেন কত সংকোচ কত লজ্জা প্রতিটি আচরণে, তাঁর এমনি একটা ভাব। তিনি যেন একটা অপরাধ করেছেন আর সেই অপরাধটা একমাত্র উমাদেবীই জানেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছেই তা' গোপন থাকবে না, একদিন পৃথিবীর সবাই জানবে। তাঁর একমাত্র পুত্র সমীরও। ছি ছি, এই বুড়ো বয়সে—

বাড়ীর সমস্ত আবহাওয়ায় যেন অজ্ঞাত একটা অন্যায়ের গন্ধ। কি যে

অন্যায়, তা' সমীর জানবার জন্যেএ বাড়ীর বাতাস শুঁকে বেড়াচ্ছে ক'দিন। ঝি-চাকরদের মধ্যেও তার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। তারা চুপি চুপি কথা কয়, সুযোগ পেলে নিরিবিলিতে আবার হাসেও। তাদের চোখে-মুখে, ঠোঁটে একটা অদ্ভুত তামাসা আর কৌতুকের প্রচ্ছন্নতা যেন উঁকি দিচ্ছে শত সাবধানতার আড়াল থেকে। বোনদের মধ্যে ছোট লীলা নির্বিকার। তবে লীলার মধ্যে পরিবর্তনের ঈষৎ ছায়াপাত হয়েছে। ব্যাপারটা সে যেন সবই জানে। আজকাল পড়াশুনো ছেড়ে রাত্রি-দিন কেবল মার সংগে সংগে ঘোরে। সে যেন মায়ের পরম বিশ্বস্ত,' সর্বাপেক্ষা স্নেহভাগিনী হয়ে উঠেছে। মা, তাকে আস্কারা দিচ্ছেন আজকাল। পড়াশোনা করার জন্যে মার চিরদিনই কড়া নজর ছিল লীলার ওপর। এখন তাতে স্পষ্ট শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। লীলাই মায়ের সব চেয়ে পরম অন্তরংগ।

সমীরের অচেতন আত্মায় লাগছিল সংসারের চারিদিকের চাপা চাপা ভাব আর অস্বাভাবিকতার অভস্র অদৃশ্য ঢেউ। সমস্ত বাড়ীটা যেন দিনের পর দিন তাকে একঘরে করে দিচ্ছে। তাকেই যেন সবার ভয়, তারই সঙ্গে সবার অসহযোগ—সবাই যেন কেবল তাকেই এড়িয়ে চলে। সবাই ষড়যন্ত্র করছে তার বিরুদ্ধে—একটা অন্যায়কে গোপন রাখতে, সমীর স্পষ্ট অনুভব করে।

কিন্তু একটা পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছে সমীরকে। মা আজকাল তার কাছে আসেন না বড় একটা। সমীর অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছে, স্নেহের অজস্র লতাতন্তু চারিদিকে যে রঙীন রেশমি জাল বুনে তুলেছিল তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ধরে, তা' যেন এই মহীয়সী নারী ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে সংহৃত করে নিচ্ছেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত সরে যাচ্ছে দূরে—স্পষ্ট অনুভব করে সমীর।

সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি নেমেছে আকাশে। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সমীর তার ঘরে বসে আছে চুপচাপ, হঠাৎ মা এসে ঘরে ঢুকলেন। সমীর চোখ তুলে

তাকালো। মা সমীরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন,—আজ আর কোথাও যেয়ো না যেন!

সমীর মার কথায় কান দিলে না।' অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখখানা দেখতে লাগলো। সে দেখতে চায়, আচারে-ব্যবহারে যে পরিবর্তন সে অনুভব করেছে, মার মুখে-চোখে সে পরিবর্তনের কোনো স্পষ্ট পরিচয় আছে কি না। সমীরের মনে হোল, মার মুখখানা আগের চেয়ে ঢের সুকুমার হয়ে উঠেছে। চোখ দু'টোও চকমকে।

চোখে চোখে পড়তেই সমীর মুখ নামিয়ে নিলে। পুত্রের এই জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি উমার সর্বাঙ্গ লজ্জায় রাঙা করে দিল। তাঁর পা দু'টো যেন ছুটে পালাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল কিন্তু নিজেকে তিনি যথাসম্ভব সংযত ও গম্ভীর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমীর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে লাগলো। ভাবল, কল্যাণীকে একবার নিজে দেখে আসবে, সে হয়তো কুশ্রী নয়। হয়তো তার চটুল হাসি, মৃদুল কথা পৃথিবীর অনেক মেয়ের চাইতেই মিষ্টি।

লীলা সেদিন বিকালে দাদার ঘরে চা দিতে ঢুকছিল। চিরদিন মা তাকে চা দিতেন। কিছুদিন হোল চা দেওয়ার ভার পড়েছে লীলার ওপরে। বোন টেবিলের ওপর চা আর খাবার সাজিয়ে দিল। কিন্তু সেদিকে যেন লক্ষ্য দেয়নি এমনি ভংগিতে সমীর বসে রইল। লীলা বললে,—ভাবছ কি? চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নীরবে সমীর দু'টো খাবার গালে পুরে চায়ের কাপে চুমুক দিল। গ্রীবা বাঁকিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গে দাদার চা পান দেখছিল লীলা। সমীর মুখ তুলতেই দেখলে, লীলার ঠোঁট দু'টোতে কৌতুকের ইংগিত। সমীর বিরক্ত হয়ে বললে,—কে চা করেছে! তুই বুঝি?

লীলার মুখে অন্ধকার নেমে এল। হ্যাঁ, কেন?

চা হয়েছে, না ছাই হয়েছে।

তাই নাকি? লীলার মুখ থেকে অন্ধকারটা এক টুকরো লঘু মেঘের মত সরে গেল। সে চোখ দু'টো ঝক্‌মকে করে হেসে বললে,—মার হাতের চা ভিন্ন তোমার ভালো লাগে না, না? মায়ের ওপর একচেটে অধিকার জমিয়ে তোমার ভারি আস্কারা হয়ে গেছে। এবার দাঁড়াও! লীলা বলে চললো,—হাসি, কৌতুক আর নকল গাম্ভীর্যে—তাই তো রাত-দিন ভগবানকে বলি, হে ভগবান, এবার যেন আমাদের একটি ভাই হয়। আমরা পাঁচ বোন আছি। দাদা একলা। তাই তার ভারী গুমোর। হে ভগবান, মার পেটে এবার যেন একটা ভাই আসে।

সমীর স্তম্ভিত হয়ে যেন ভূতের মত শুনছে। লীলার ব্যাখ্যান যখন শেষ হোল, তখন নিমিষে সমস্ত গোপন জটিল ব্যাপারটা যেন খান-খান হয়ে চোখের সম্মুখে ধ্বসে পড়ল একটা অস্পষ্ট আধ-অনুভূতির প্রাসাদের মত। সমীর দৃষ্টিহীন নিস্পলক চোখে দেখল, সেই অনুভূতির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আর্তনাদ করছে একটি মহিয়সী কল্যাণময়ী নারী—যে মাকে এতদিন সে দেখে এসেছে, ভালোবেসেছে, ভক্তি করেছে, পৃথিবীর কাদামাটির ঊর্ধে যাকে সে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দিয়ে স্বর্গীয় সুষমায় দেবোত্তমা করে তুলেছে।

বোনের ঠাট্টার কোনো উত্তর দিল না সমীর। সমস্ত রক্ত-স্রোতে সে তিক্ত একটা অনুভূতির আস্বাদ পেল। ঘৃণায় তার সমস্ত দেহটা শির-শির করে উঠছে—যেন হাজার হাজার পিচ্ছিল কেঁচো তার রক্ত-স্রোতে উজান বেয়ে পা থেকে মাথার দিকে উঠছে। সমীর বুঝি কাঁদতে পারলেই সুখী হোত। তার পূজার পদ্ম যে আজ কাদায় পড়ে মলিন হয়ে গেল! একি দুর্যোগ, একি অবিচার!

একটু বাদে সমীর বেরিয়ে পড়লো। চায়ের দোকানে এসে পড়লো, খবরের কাগজে, পাশবিক অত্যাচারের খবর, গণিকা-বৃত্তির সংবাদ—বেশ লাগল। সে যেন নিজের অন্তর দিয়ে দু'টোকেই আজ অনুভব করছে—এর চেয়ে বড় সত্য যেন আর কিছু নেই!

সেদিন বাড়ী ফিরতে সমীরের অনেক রাত হোলো।

ায়িকা

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সুশান্তর বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কারই বা না হয়?• আপনাদের হয় খরচ পত্র নিয়ে, সিনেমা দেখা নিয়ে, নয়তো বাপের বাড়ী যাওয়া নিয়ে। সুশান্তদের ব্যাপারটা কিন্তু এ হিসাবে দাম্পত্য-কলহের ইতিহাসে বেশ মৌলিক।

বেচারী সুশান্ত গল্প লেখে। শুধু লেখেই না, তার গল্প মাসিক পত্রিকায় ছাপানো হয় এবং এ জন্যে সে কিছু কিছু পারিশ্রমিকও পায়। কিন্তু এই গল্প লেখাই তার হল কাল। বিয়ের বছর দুই পরেই স্ত্রীর সঙ্গে বেধে গেল বিষম ঝগড়া গল্প লেখা নিয়ে।

স্নেহ বললো,—নিজের মাথা থেকে কচি কচি মেয়েগুলিকে টেনে টেনে বার করে, ফড়িংএর মতো প্যাঁটি প্যাঁট করে টিপে মারবে, সে হবে না : হয় ওদের বিয়ে-থাওয়া দিয়ে সংসারে থিতু-ভিতু করে দাও, নয় ওদের ছেড়ে দাও। মেয়েমানুষ নিয়ে এ সব ছিনিমিনি খেলা কিছুতেই সহ্য করবো না—হ্যাঁ!

সুশান্ত হতাশ দৃষ্টিতে স্নেহের মুখের দিকে তাকালো।

স্নেহ বললো,—অবন্তীকে কিছুতেই তুমি বিষ খাওয়াতে পাবে না—ওর সঙ্গে যেমন করে হক, অনিলের মিলন করাতেই হবে; তাতে তোমার আর্টের কপালে যা' থাকে তা' থাকবে। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষকে অমন অকূলে ভাসাতে আমি দোব না!

সুশান্ত বললো,—তুমি যখন রোজই কলায়ের ডাল আর মোচার ঘণ্টর

উৎপাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলো, তখন আমি কিছু বলতে যাই? যখন গ্যাব গ্যাব করে তেলে ভাজা মুইসেন্সগুলো গেলো, আমি বাধা দিই?

স্নেহর স্পষ্ট উত্তর এলো, না।

—তুমি যখন টান করে খোঁপা বেঁধে, খুর লাগানো জুতো পরে, বেঁড়ে ছাতা হাতে, চলন্ত পিপের মতো গড়াতে গড়াতে পাশের বাড়ী ধাওয়া দাও, আমার কোন আপত্তি আছে কি না জানতে চাও একবারও?

—না। এ সব আমার নিজের ব্যাপার।

—এও তেমনি আমার নিজের ব্যাপার। এতে তোমার মাথা দেবার দরকার কি? তুমি কি বোঝো সাহিত্যের? আর্টের মার-প্যাঁচ কত জটিল, আর কি রকম মোচড় দিলে গল্প জমে, তা' কি আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো?

আর রক্ষা নেই! স্নেহ কেঁদেই আকুল—আমি কুচ্ছিত, আমি পিপে, আমি পাড়ায় পাড়ায় বেড়াই, আমি মুক্ষু, বেশ বেশ। আর যদি কখনো তোমার কোন কথায় থাকি ত....নিজে ত খুব ভালো, সারাদিন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে নস্যি নিচ্ছেন. আর যাত্রার দলের ছোকরার মতো....!

সুশান্ত এক সময় স্নেহের প্রাইভেট মাষ্টার ছিল, তাই থেকেই উভয়ের বিবাহ। সে গর্জ্জন করে উঠলো—স্নেহ, বড্ড সাহস হয়ে গেছে, না?

স্নেহ আর কিছু বললে না। ঘুমন্ত মেয়েটার পিঠে একটা চাপড় মেরে তাকে কাঁদিয়ে, আবার দুধ দিয়ে ভোলাতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো।

সুশান্ত বিরক্ত হয়ে, আলোটা একটু উস্কে দিয়ে, অসমাপ্ত লেখাটা তুলে নিলো। অবন্তীর পরিণতি এবং অনিলের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে মনে মনে সে যেটা আঁচ করে রেখেছিল, স্নেহর জ্বালাতনে তা' গেছে ভেস্তে। সেই বিশ্লিষ্ট গল্পের সূত্রকে আবার জোড়া দেওয়া যে কি মুস্কিল, তা' ঐ কাঁদুনে ক্যাবলা ম্যাট্রিক পাশ মেয়েটা কি বুঝবে?

রাগে সুশান্তর কান্না আসছে। সে হঠাৎ জেদ করলো, সে শুধু অবন্তীকে মারবে না, তাকে বিষ খাইয়ে মারবে—হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার পেট চেরাবে, তার দেহাবশেষ শেয়াল দিয়ে খাওয়াবে এবং অনিলের আবার বিয়ে দিইয়ে, তার বিয়ের শোভাযাত্রা সেই ভীষণ শ্মশানের পথ দিয়ে নিয়ে যাবে। দেখি স্নেহ কি করে! এতদূর ধৃষ্টতা তার—সে আসে.... !

এমন সময় টেবিলের ওপর টুক করে একটি শব্দ, তারই সঙ্গে হাতের চুড়ির চাপা একটি ঝনৎকার! সুশান্ত বুঝলো, ঝগড়া করলে কি হবে—স্নেহর মনটা পড়ে আছে অবন্তীর পরিণামের ওপর—সে ঘুমুতে পারেনি, তাই উঠে এসেছে। আচ্ছা, এইবার সে বোঝাবে। জোরে কলম চালাতে সুরু করে দিলে সে।

হঠাৎ কে কলমটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো—রেগে মুখ তুলতেই সুশান্ত অবাক! কে এ, চোখে চশমা, দু'হাতে দু'গাছি সরু সরু চুড়ি—পরণে ভাগ্যচক্র সাড়ী, পিঠে এলো চুল, হাতকাটা ব্লাউস গায়ে? ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ, সামনের খাটে ঘুমুচ্ছে স্নেহ আর তার মেয়ে—সে বসে গল্প লিখছে। ভয়ে সুশান্তর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে বললো,—কে আপনি?

—চেনেন না আমাকে?

—না।

—অথচ আমাকেই খুন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কি করেছি আমি আপনার?

বলেই একটু ফোঁপানি ও কান্না! সুশান্ত হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

বললো,—আপনাকে আমি খুন করতে যাচ্ছি—সে কি? নাম কি আপনার?

—আমার নাম অবন্তী!

—অবন্তী!

—হ্যাঁ অবন্তী, আপনার গল্পের নায়িকা। আমায় আপনি বিষ খাওয়াতে

বসেছেন? না না, অনিলকে দিন আমায়, বরং আমরা দু'জনে লেকে ডুবে মরি—কিন্তু একা একা আমাকে এ শাস্তি কেন?

সুশান্ত কি পাগল হয়ে গেল? গল্প গল্পই—তার নায়ক-নায়িকারা অলস মস্তিষ্কের খেয়াল-গড়া জিনিষ—তারা চেহারা ধরে আসতে পারে এবং নিজেদের দাবী এমন স্পষ্ট করে জানাতে পারে? কিন্তু এ ত অবন্তী ছাড়া আর কেউ নয়। তার নিজের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলছে—সেই সাজ, সেই ভঙ্গী, সেই স্বভাব।

সে বললে,—আমার খেয়ালে যার জন্ম, তার ভাগ্যও ঘুরবে ফিরবে আমারি খেয়ালে। তুমি কে? তোমার অস্তিত্ব কোথায়? কেন আমি তোমার খুসীকে প্রশ্রয় দোব?

অবন্তী একটু এগিয়ে এলো—খাতাখানা হাত দিয়ে চেপে ধরলো, তারপর বললো,—বটে?

—জানেন না সবারই জন্ম খেয়ালে, কিন্তু তাদের ভাগ্য জন্মদাতার খেয়ালে ঘোরে না—ঘোরে নিজের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির তাগিদে? আমায় তুমি মারতে পাবে না—কিছুতেই না।

—আলবৎ মারবো, নইলে আমার গল্প সুরেন ভট্টাচার্য্যির লেখার মতো খেলো হয়ে যাবে। আমি তোমায় মারবো এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সেই হত্যার সাফাই গাইবো—আর্টের প্রয়োজনে সেটাই অনিবার্য্য।

—বোঝাচ্ছি। নিজের স্ত্রীর ওপর চটে, তুমি অন্যের প্রণয়িণীর প্রাণ নিতে চাও, আর আর্টের দোহাই দিয়ে তারই সাফাই গাইতে এসো? তুমি এখন কে? তোমার মাথা থেকে যার জন্ম, তোমার মাথার বাইরে এসে সে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ সৃষ্টি—তার সুখ-দুঃখের ওপর তোমার খুসী কিসের জন্যে তুমি খাটাবে? সে চলবে আপন খুসী মতো।

সুশান্ত চটে উঠলো। বললে,—আমার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর হাত দিতে এসেছো—লজ্জা করে না?

—না।

বলেই অবন্তী পটাপট গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ছিঁড়ে একটা ঘুরপাক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অবাক হতবুদ্ধি সুশান্ত ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ফুলতে লাগলো। শুধু বললো,—হা-রা-ম-জা-দী!

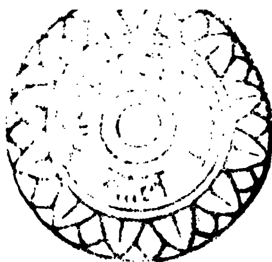
হঠাৎ তার কাণে এলো, মরণ আর কি! সাহিত্য করছেন না আমার মুণ্ডু করছেন—বসে বসে ঢোলা হচ্ছে আর আমাকে খিস্তি করা হচ্ছে!

সোজা হয়ে বসেই সুশান্ত দেখে, তার গল্পটি টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া—টেবিলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

সে বললো—স্নেহ, অবন্তীর বিয়েই দোব—সে এসে তাই বলে গেছে!

স্নেহ বললো,—আগে দিলে কি ক্ষতি হত? কিন্তু আমি ঘুমুলে সে আসে কেন, খ্যাংরার ভয়ে বুঝি?

বংশধর



শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

বড় রাস্তার ওপর দোতলা ছোট্ট বাড়ী। আশেপাশের বড় বড় অট্টালিকার মাঝে এর অস্তিত্ব যেন কতকটা চাপা পড়ে গেছে। তবে যাদের একান্ত প্রয়োজন তাদের সন্ধানী দৃষ্টি ব্যর্থ হয় না কোনদিন—তারা এ বাড়ীটি আবিষ্কার করে সহজেই। সদর দরজার ঠিক ওপরে তারে বাঁধা কাঠের একখানা সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় হরফে লেখা :—

মিসেস্ সৌদামিনী হালদার,
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রী।

সৌদামিনীকে এ অঞ্চলের সকলেই জানে। এককালে সহরে ওর নামডাক ছিল যথেষ্ট, ইদানীং বয়সের দরুণ পসারটা একটু কম। তবে এখনও যে মাঝে মাঝে মোটারকম দাঁও দু'একটা না জোটে তা' নয়। মাতৃত্ব যাদের কাছে বিড়ম্বনা, সন্তান যারা চায় না, তাদের একমাত্র ভরসা এই সৌদামিনী।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগেই একখানা ট্যাক্সি এসে থামলো সৌদামিনীর বাড়ীর সামনে। ট্যাক্সি থেকে নামলো উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে। দরজার কড়া নাড়তেই ঝি বেরিয়ে এসে বললে,—"আমাদের মা-ঠাকরুণকে খুঁজছেন বুঝি? বসুন বাইরের ঘরে।

বাইরের ঘরে মিনিট পনেরো বসে থাকার পর ডাক এল ওপর থেকে। মেয়েটি ঝির পিছু পিছু চললো ওপরতলায়।

সৌদামিনীর বসবার ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার চারিদিকে চারখানা গদী-আঁটা চেয়ার। টেবিলের ওপর একটি সুদৃশ্য ফুলদানি—তাতে এক ঝাড় রজনীগন্ধা। দেওয়ালে খানকতক বিলাতী ছবি, দামী ফ্রেমে বাঁধানো। ঘরের এক কোণে একটি ছোট টেবিলের ওপর টেলিফোন। মেয়েটি ঘরে এসে বসতেই সৌদামিনী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। প্রত্যেক রুগীকেই, বিশেষ করে নতুন যারা, সৌদামিনী তাদের পরীক্ষা করে খুব মনোযোগের সঙ্গে। মেয়েটি অনিন্দ্যসুন্দরী, ভদ্রবংশের বলেই মনে হয়। মুখে চোখে তার কেমন এক দুঃসহ ব্যাকুলতা।

মিনিট খানেক লক্ষ্য করেই সৌদামিনী বুঝতে পারলে, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা —আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ তার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট। তবু চিরদিনের অভ্যাসমত প্রশ্ন করলে,—"বল তো মা, কী তোমার দরকার ?"

মেয়েটি আবেগকম্পিতকণ্ঠে বললে,—"আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, কিন্তু ভরসা করে আসতে পারিনি—ভয়ে পিছিয়ে গেছি বারবার। কিন্তু আজ আর ভয় করলে চলবে না, তাই চলে এসেছি সাহস করে। এতদিন যে কেউ টের পায়নি আমার অবস্থা এইটেই আশ্চর্য্য। আমি অত্যন্ত বিপন্ন, আমাকে রক্ষা করুন আপনি। আমি অবিবাহিতা, ব্যাপারটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, লজ্জায় আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না, আমার আত্মীয়-স্বজনেরও মাথা হেঁট হবে।"

সৌদামিনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উপদেশ দেবার ভান করে বললে,—"তুমি এক কাজ করো, বাছা। তোমার মার কাছে সব কথা খুলে বল। মা একটা ব্যবস্থা করে দেবেন যা' হোক। শরীর খারাপ হয়েছে বলে দিন কতক হয়তো পাঠিয়ে দেবেন কোথাও, তারপর প্রসব হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনবেন সেখান থেকে।"

—"মা আমার নেই, মারা গেছেন অনেক কাল আগে। বাবাকে আমি

বলতে পারবো না কিছুতেই। বাবা আমায় বিশ্বাস করেন খুব, এ কথা শুনলে তিনি মর্ম্মাহত হবেন।"

—"কিন্তু তোমার প্রণয়ী নিশ্চয়ই.... "

—"আমার প্রণয়ী যদি জীবিত থাকতো তাহলে সে আমায় বিবাহ করতো নিশ্চয়ই। সে মারা গেছে বর্ম্মার যুদ্ধে—তখনও আমি জানতে পারিনি যে আমি অন্তঃসত্ত্বা..."

—"কতদিন হল সে মারা গেছে?"

—"চার মাসের কিছু বেশী।"

—"এর আগেই তোমার আসা উচিত ছিল আমার কাছে।"

—"আমার সাহস হয়নি। আমি ভাবতেই পারিনি এমন অবস্থা হবে আমার..."

—"গোড়ার দিকে যদি আসতে, আমি হয়তো সাহায্য করতে পারতাম; কিন্তু এখন আর কিছু করবার উপায় নেই।"

মেয়েটি হঠাৎ সৌদামিনীর পা দু'টো জড়িয়ে ধরলে—"বাঁচান আমাকে। আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করলেই বাঁচাতে পারেন। আমাদের কলেজ-হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ গাঙ্গুলী আপনার ঠিকানা দিয়েছেন আমায়। তাঁর সঙ্গে আপনার নাকি অনেকদিনের পরিচয়। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, আপনার কাছে সাহায্য পাবোই আমি। তাঁর নাম করে অনুরোধ করলে আপনি...."

—"কৈ তাঁকে তো আমি চিনি না।"

প্রতিবাদ করলে সৌদামিনী—"ও সব কাজ আমি করি না কোনদিন.... আমায় অন্যায় অনুরোধ করো না বাছা।"

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে,—"আমার অবস্থা আপনাকে খুলেই বলেছি, আপনাকে এটা করতেই হবে। আপনি যা' চান তাই আমি দেবো।

আপনি রাজী না হলে আমি আত্মহত্যা করবো—বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সৌদামিনী অনভিজ্ঞ নয়। মেয়েটি যে এই বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, এটা সে বুঝতে পারলে। বুঝে খুশীই হল। মানুষ যখন মরিয়া হয় তখন আর টাকার মায়া সে করে না।

সৌদামিনী সস্নেহে মেয়েটির কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে,—"আমি অবশ্য নিজে এ কাজ করতে পারবো না। তবে আমি একজন বড় ডাক্তারের কাছে তোমায় নিয়ে যাবো, যিনি তোমায় সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু...."

—"তাঁর ফি-র কথা বলছেন? যত টাকা তিনি চান আমি দিতে প্রস্তুত।"

আনন্দের আতিশয্যে মেয়েটির স্বর কেঁপে ওঠে।

—"আমি যে ডাক্তারের কথা বললাম, তাঁর হাত খুব পাকা, বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। তবে টাকাটা লাগবে কিছু বেশী। হাজার টাকার কমে সব কেস্ তিনি হাতে নেন না।"

—"টাকার জন্যে ভাববেন না, যেমন করে হোক আমি জোগাড় করবো।"

—"বেশ, কাল সকালে তাহলে এসো। আজ রাত্রেই দেখা করে জানবো ডাক্তার রাজী আছেন কি না। কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল!"

ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সৌদামিনী তার হাতখানা ধরে বললে,—"ভয় কি বাছা, দু'চার দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কাছে যখন এসে পড়েছ তখন বিপদ তোমার একরকম কেটেই গেছে।"

ডাক্তার মিত্র তাঁর লাইব্রেরী ঘরের সামনে উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করছেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত, চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, কেস্‌টা ভারি জটিল, অস্ত্রোপচার করা সমীচীন কি না তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর সহকারী বলে, অস্ত্রোপচার না করলে মেয়েটিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না, ধাত্রীরও মত তাই। ধাত্রী বলেছে, মেয়েটি বারান্দা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছিল গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করবার জন্যে ই আঘাতও পেয়েছে গুরুতর। মেয়েটি ভারি বোকা। স্বেচ্ছায় এমন বিপদ

কেউ ডেকে আনে! কিন্তু বোকাই বা বলি কেমন করে? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। এই অসহায় অবস্থায় সন্তান পালনের দায়িত্ব ও বহন করবে কি করে? নিজের ভরণপোষণ করাই যার পক্ষে শক্ত, সে কি করে আর একজনের ভার গ্রহণ করবে? কিন্তু ভ্রূণ-হত্যা মহাপাপ। ভগবানের সৃষ্ট আত্মাকে ধরণীর আলো থেকে তিনি বঞ্চিত করবেন কোন অধিকারে? তাছাড়া ঐ সন্তানকে যদি বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে মায়েরই তো মঙ্গল—ও-ই তো মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারে একদিন!....ডাক্তার মিত্রের মনে পড়ে তাঁর একমাত্র পুত্র অরুণের কথা। আজ চার মাস হল সে মারা গেছে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব আশা গেছে নিবে, ভবিষ্যৎ ডুবে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। অরুণ যদি বিয়ে করে সংসারী হত, ও যদি রেখে যেত একটি ক্ষুদ্র শিশু, তাহলে হয়তো ঐ অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ক্ষীণ রেখা তিনি খুঁজে পেতেন। ....ডাক্তার মিত্রের চোখ সজল হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করেন।

মিনিট দুই তিন পরেই তাঁর সহকারী ডাক্তার প্রশান্ত সেন এসে হাজির হল। প্রশান্ত বলিষ্ঠ, সুদর্শন যুবক, বয়সে ডাক্তার মিত্রের চেয়ে অন্ততঃ বিশ বছরের ছোট। যদিও ডাক্তার মিত্র প্রশান্ত সেনের অতি আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী সব সময় সমর্থন করেন না, তবু তার প্রতিভা ও নৈপুণ্যের ওপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা। জটিল কেস-এ তার মতামতের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রশান্ত চেয়ারে বসতেই ডাক্তার মিত্র বললেন,—"বল তো প্রশান্ত, কী করা যায় এ ক্ষেত্রে?"

—"আমার মনে হয়, এখনই অপারেশান্‌এর ব্যবস্থা করা উচিত। বেশী দিন মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলে রাখা সঙ্গত হবে না।"

—"আমার একটু সন্দেহ আছে...."

—"কিন্তু সন্দেহ করবার কোন কারণই তো দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটি

দিবা-রাত্র অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে। চোটটা লেগেছে ভীষণ, পড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সৌদামিনী পরীক্ষা করেছিল ওকে। ভেতরে গোলমাল কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।"

—"আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। দেখো প্রশান্ত, বয়সটা তোমার কম, মেয়েদের কথা সহজেই বিশ্বাস করো ?"

—"এ আপনার অন্যায় অনুযোগ। মেয়েটির কথা ভাবুন দেখি একবার। প্রতি মুহূর্ত্তে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে সে—এমন অবস্থা হয়েছে তার, যে মৃত্যুকেও সে বরণ করতে প্রস্তুত। আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় ওকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া ? তাছাড়া এখনই আমরা যদি অপারেশান্ না করি তাহলে প্রসবের সময় ওর মৃত্যু নিশ্চিত।"

—"বেশ, তুমি যদি অপারেশান্ করা দরকার মনে কর, আমি আর আপত্তি করতে চাইনে। কাল তাহলে ব্যবস্থা করা যাক্।"

—"হ্যাঁ, কালই।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে প্রশান্তকে সঙ্গে করে ডাক্তার মিত্র এসে হাজির হলেন সৌদামিনীর বাড়ী। সৌদামিনীর বাড়ীতেই অস্ত্রোপচার হবে। সৌদামিনী দিন কয়েক দেখা-শোনা করবে রোগিণীকে।

সুমিত্রা—ঐ নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছে মেয়েটি। পালঙ্কের ওপর বসে সৌদামিনীর সঙ্গে সে গল্প করছিল। সৌদামিনীকে একটু চিন্তিত বলে মনে হল, কিন্তু সুমিত্রার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়ামাত্র নেই। প্রথম যখন দেখে, প্রশান্ত আকৃষ্ট হয়েছিল ওর রূপে, এখন সে মুগ্ধ হল ওর সাহস ও দৃঢ়তা দেখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল। ক্লোরোফরম্ দেবার জন্যে প্রশান্ত এগিয়ে এল সুমিত্রার কাছে। সুমিত্রা মৃদুস্বরে বললে,—"আপনাকে একটি অনুরোধ জানাতে চাই। আমার ঐ ব্যাগের মধ্যে ঠিকানা লেখা এক-খানা চিঠি আছে—যদি অপারেশানের পর আমার চেতনা আর ফিরে না আসে, তাহলে ঐ চিঠিখানা পৌঁছে দেবেন যথাস্থানে।"

প্রশান্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।—"ভয় কি, আপনি অনায়াসে ভাল হয়ে উঠবেন। এমন তো কত জনেরই হয়।"

—প্রশান্ত সান্ত্বনা দিলে তাকে।

সপ্তাহ দুই পরের কথা। সুমিত্রাকে দেখতে এসেছেন ডাক্তার মিত্র। এসে দেখেন, সুমিত্রা যাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত।—"এরই মধ্যে তুমি চলে যাচ্ছ, সুমিত্রা?" গম্ভীর মুখে বলেন ডাক্তার মিত্র—"তোমার শরীর সুস্থ হয়েছে বটে, তবে এখনও কিছুদিন তোমায় সাবধানে থাকতে হবে।"

—"আমার ওপর আপনার স্নেহ পড়ে গেছে—তাই আপনি ছেড়ে দিতে চান না।" হেসে জবাব দেয় সুমিত্রা।

—"সত্যি, তোমার সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। সাহসী রুগীদের ডাক্তাররা পছন্দ করে বেশী।"

ডাক্তার মিত্র যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন সুমিত্রা একখানা খাম তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—"এটা নিন অনুগ্রহ করে। আমাকে স্মরণ করে রাখবার মত কিছু হয়তো পাবেন এরমধ্যে।"

—"না না, ও আমি নেবো না।" ডাক্তার মিত্র হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন খামটা—"আমার যা' ফি, তা' আমি পেয়েছি, ওর বেশী আমি নিতে পারি না।"

—"আপনি ভুল করছেন, ডাক্তারবাবু। এটা একখানা চিঠি। আপনি হয়তো জানেন, ডাক্তার সেনকে বলেছিলাম এটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে যদি অপারেশানের টেবিলেই আমার মৃত্যু হয়। এটা নিন, ডাক্তারবাবু—সময়মত পড়বেন!"

ডাক্তার মিত্র চিঠিখানা নিলেন।

সারাদিন কাজের মধ্যে সুমিত্রার চিঠিখানির কথা মনেই পড়েনি ডাক্তারের। রাত্রে লাইব্রেরী ঘরে বসে চিঠিখানা খুললেন তিনি। সুমিত্রার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর। খাসা মেয়েটি—যেমন সুন্দর ওর চেহারা, তেমনি চমৎকার ওর কথাবার্ত্তা। ভগবানের কী অবিচার—এই বয়সে ওকে বিধবা

করলেন! আর ঐ শিশুটি—সুন্দর সবল গোলগাল ছেলে, হতভাগিনী বিধবার ও সান্ত্বনা হতে পারতো!···কিন্তু এ কী? চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের ওপর তিনি হাতড়াতে লাগলেন চশমার জন্য। নিশ্চয়ই দেখতে ভুল হয়েছে তাঁর! কম্পিত হস্তে ডাক্তার চিঠি পড়তে লাগলেন :—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি আমার যে কত বড় উপকার করেছেন তা' আপনি জানেন না। লোকে বলে, প্রতিশোধে আনন্দ আছে—আজ দেখছি কথাটা ঠিকই। প্রতিশোধ বড় মধুর—প্রণয়ের মত মধুর। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বুলি তবে। আপনার ছেলে ভালবাসতো আমায়, আমায় বিবাহ করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু আপনি বাধা দেন তাকে। আপনারা বড়লোক, রেল-আপিসের সামান্য কেরাণীর মেয়েকে আপনার ছেলে বিয়ে করবে কি করে! বংশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে যে এতে! কিন্তু ভালবাসা মানুষের গড়া ব্যবধান মানতে চায় না—তাই আমাদের ভালবাসা গভীরতর হয় দিনের পর দিন। আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় বিবাহ করবে বলে। আমার নাম হয়তো' শুনেছেন আপনি—আমার নাম সুপ্রভা। পরিচয় গোপন করবার উদ্দেশ্যে নাম নিয়েছিলাম সুমিত্রা। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার জন্যে আপনার ছেলে চাকরি নিলে যুদ্ধে, ডাক্তার হয়ে গেল বর্ম্মায় এবং সেখানেই হল তার মৃত্যু। খবরটা যখন পেলাম, তখন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। এর পর হঠাৎ এক দিন টের পেলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা। প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলাম, ক্রমশঃ সাহস এল মনে। মনে মনে ভাবলাম, কেন আমি এই সন্তানের ভার বহন করবো একা? কেন আমি লজ্জা ও অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেবো আমার মা-বাপের ওপর? ওঁরা গরীব হতে পারেন, কিন্তু ওঁদের সম্মানবোধ কারো চাইতে কম নয়? আপনার দোষেই আমার সন্তান স্থান পেলে না সমাজে। আপনার ছেলে আমায় বিবাহ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল, যুদ্ধে মারা না গেলে সে আমায় বিবাহ করতো নিশ্চয়ই—আপনার

তর্জ্জন-গর্জ্জনকে সে উপেক্ষা করতো অনায়াসে। আপনার কৃতকর্ম্মের ফল আপনি ভোগ করবেন না কেন? আভিজাত্য গর্ব্বে আপনি গর্ব্বিত—সে গর্ব্বে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে আপনার ছেলের আকস্মিক মৃত্যু। বংশরক্ষা করবার আর কোন উপায়ই নেই আপনার। বংশলোপ অনিবার্য্য। আমার সন্তান অবশ্য আপনার বংশ রক্ষা করতে পারে, কিন্তু সে-সুযোগ আমি দেবো কেন? যারা আমায় অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে রেখেছিল তাদের আমি করুণা করবো কেন? তাই আমি সৌদামিনীকে খুঁজে বের করলাম আর তার সাহায্যে ধুলো দিলাম আপনার মত একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখে। আমার গর্ভস্থ সন্তান সুস্থই ছিল, পড়ে যাওয়ার কাহিনীটা সম্পূর্ণ কল্পিত, সময় পূর্ণ হলে সন্তানটি যে জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হত না এ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। প্রতিশোধ আমি নিয়েছি, যতটুকু চেয়েছিলাম পেয়েছি তারও অনেক বেশী। আপনার বংশধরের জীবন স্বহস্তে আপনি নষ্ট করেছেন এ চিন্তা অহরহ আপনাকে ক্লিষ্ট করবে, দুঃসহ করে তুলবে আপনার অবসর মুহূর্ত্তগুলি। আপনি যেমন আমায় বঞ্চিত করেছেন সংসারের সুখ-শান্তি থেকে, আমিও তেমনি ছিনিয়ে নিলাম আপনার একান্ত কাম্য বংশধরকে।

ইতি—প্রণতা
সুপ্রভা

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ডাক্তার মিত্রের সর্ব্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসে, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়া, বার বার শূন্যপানে, তাকান উদ্‌ভ্রান্তের মত। মনে হয়, একখানি সুন্দর কচি মুখ শূন্যে ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে!

হারাণের নাতজামাই

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝ রাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি আর কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম, বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘাঁটির ঘরের পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও যেত, অতি সহজে, অনায়াসে গায়ে ফুঁ দিয়ে। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে কিছুতেই ধরাতে চায় না, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ কখনো তার পাত্তা পায়? দেড় মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুসী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বাঁধবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর ঘর কখানা, যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল, আঁটঘাট বাঁধাই ছিল—খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে, খবর দিয়েছে কেউ। আজই বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে হঠাৎ, সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে তার পরে। এমনও কি কেউ আছে তাদের

এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে অনেক চাষীর। জানা যাবে, সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল জানা-যাবে, গোপন থাকবে না। দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী।

খবর যাক, খবর পেয়ে আসুক, ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোন গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি! তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জান নয় দেবে আপনজনটার জন্যে!

চোখ কচলে উঠেই লাঠি, সড়কি, দা, কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ্‌দপ্‌ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় কয়েকজন পুলিশ সশস্ত্র।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি ঠিক হারাণের বাড়িটা চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙ্গে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন বাড়ী?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি?

বলে কিন্তু জানে যে, কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি হারাণ, শুধু একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলেটাকে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু'এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা

ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব!

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা, কি বলে, কি কয়!

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

হাসির কথা নয়।

একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙ্গুলের ইসারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গলায় নিদারুণ আপসোসে ফুষে ওঠে, আঃ! ভাল শাড়ীখান পরতে পারলি না?

বলেছ নাকি? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙ্গে তাঁতের রঙীন শাড়ীখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়ীটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা—আপনার নাম জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ী হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রথম প্রৌঢ় বয়সেই তার বিধবার চুল ছাঁটা মুখখানিতে দুঃখ দুর্দ্দশার ছাপে ও রেখায় কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে।

গাঁ ভেঙ্গে তেড়ে আসতেছে, রুখে। তাই না ভাবতেছিলাম, ব্যাপারটা কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, সারছে। দশ-বিশটা খুন-জখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই, সামলাই।

র'ণ, র'ণ, ময়নার মা বলে, ছাখেন কি হয়। আপনে তো আছেন।

শ' দেড়েক চাষী, চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু'চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ীর পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলবার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমত নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটা।

হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া, হাঙ্গামা করা উচিত নয়।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তাল্লাস করতি দিমুনা।

প্রায় দু'শো গলা সায় দেয়, দিমুনা!

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় সুরু হয়ে গেছে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল—র'ও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর-ডাকাইত নাকি, যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে?

ময়নার মা বলে, ছাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফির্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া

দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা। মন্মথ বলে ভড়কে গিয়ে, ঘর তাল্লাসে তোমার আপত্তি নেই?

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপি চুপি আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জ্বলে যায় ময়নার মার।—সদর দিয়া আইছে!

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল হেঁকে, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা কাটা ছাঁটা ঠেকানো আংটাক অর্ত্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটি মাত্র ছাড়া আওয়াজের মত।

ময়নার রঙীন শাড়ীর ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মত চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার অনাবৃত স্তনটি। এ যেন কবিতা। বি, এ, ফেল মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাস্তব আঘাত, এমন যোয়ান মর্দ্দ মাঝ বয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গায়ের দু'জন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তবু যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মত!

গর্জ্জন করে হারাণকে শেষ প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনীর বর?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না।

অ! মন্মথ বলে।

তার কিছু বলা বা করা উচিত ভাবে ভুবন।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কত্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইনের হাটে আইছি, ঠাইরেণ পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া মরে।

তুমি অমনি ছুটে এলে ?

আমুম না? রতি ভরি সোনা-রূপা যা' দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে! মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। জাতে চাষা, আর কত হবে। আর কিছু করার নেই, বাড়ীগুলি তাল্লাস ও তচনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু'পা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র বেপরোয়া ভাব, ভয়-ডর নেই একেবারে। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মত আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথা, কানা হাঁড়ি-পাতিল, জিনিষ-পত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়ীতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ, এসব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্ত্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—রঙীন শাড়ী-জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি-বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না।

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরছে, শো' না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাছা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে, ময়নার মা'র গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দু'বার ময়নার মা সস্নেহে আদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এর পর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই। মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

দেখতে দেখতে মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতীপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাসা কেউ কখনো করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূণ্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা, বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা। সে যে এমন রসিকতাও জানে কে ভেবেছিল!

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুসী উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মধ্যে এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?

লাজের রঙে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময় আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ-সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘর-কাচা সার্ট, কাঁধে

মোটা সুতির ফরসা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ীর দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি? কখন আইলা?

শোন, শোন।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কি ব্যাপার?

কেমনে কমু?

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দু'জন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

বাড়ীত্ নাই। তুমি কেডা, হালার পুতরে খোঁজ ক্যান?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দু'জনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?

তা' ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নেই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই।

শাউড়া পাইছিলা দাদা একখান!

নিজের হইলে বুঝতা! জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, এগোতে আরম্ভ করে। দু'জনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে।

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ

গণে। তাই, ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে হাসি মুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়—তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। আস, বাবা আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে ?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত চাপা গোসা জামায়ের কাটাছাঁটা এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পিঁড়ি পাততে পাততে চকিতে ময়না তাকিয়েছে কবার, একটিবার অন্ততঃ চোখা-চোখি হতই ব্যাপারটা অল্প-বিস্তর কিছু হলে। পড়ন্ত রোদে লাউ-মাচার শাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুর-বাড়ীর পণ করেছে জগমোহন। লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই ? হায় ভগবান !

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা ছাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন ছাখে না জানতে চাইবে জগমোহন, তখন বলবে কথাটা। কিন্তু শালার খবরে এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না জগমোহনের।

খাড়াইয়া রইলা যে ? বস বাবা, বস ?

ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না যামু গিয়া।

অখনি যাইবা ?

ও একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে ?

শুইছিল ? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব ?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শ্বাশুড়ী জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় বুঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ। ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, একদণ্ড ঘরে গিয়া ঝাঁপ দিছে, তুমি দোষ দেখলা! অন্যে তো কয় না ?

অন্যের বৌ হইলে কইতো।

ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান হাসাহাসি করে।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। .

তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি ? আইছে হারামজাদা ? হায় ভগবান, আইছে ? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়া বেড়ানি নিন্দা ছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কি হইছে গো ময়নার মা ? নিতাই পালের বৌ শুধায়, মাইয়া কান্দে ক্যান ?

দিশা ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান! কাঁদে না কাঁদে ক্যান ? ভাইটারে ধইরা নিছে কাঁদব না ?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া ?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও। ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জম্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাদের অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। আবার তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা ছাখো।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?

জামায়ের অভাব কি! মাইয়া আছে কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে পা তোলে জগমোহন তা' নয়। ময়নার মারও তা' জানা আছে, যে শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই কখনো গট-গট করে বেরিয়ে যায় না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো এখনো বাকী আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। ঘরে কিছু নেই, মুড়ি-মোয়া কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতে হবে জামায়ের।

চোখ মুছে, নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো?

না। কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

হারাণ কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান্!

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে। তখন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মুড়ি-মোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, তখন ময়না চাপা স্বরে ডুক্‌রে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামায়ের সাথে লড়াই নেই।

আবার জিজ্ঞাসা করে হারাণ, আসে নাই? আমার মরণডা আসে নাই? হায় ভগবান্!

চুপ করে ছিল জগমোহন, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—পুলিশে ধরছে ক্যান?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল। সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরবার পথে একা পাইয়া ধরছে।

ধরছে কেন?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে যায়। কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে; মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।

থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও? আথা ধরাই? পোলাটারে ধরছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

কবে আইবা ?

দেখি।

উঠি উঠি করে দেরী হয়। তারপর আজ সন্ধ্যা-রাতে পুলিশ হানার সোর ওঠে কাল মাঝ-রাত্রির মত। আজ মন্মথের সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। চোখ সাদা।

প্রথমেই হারাণের বাড়ী।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা ?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে ?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্য্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জ্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।

বাড়ীর সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্য্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মত না হলেও লোক মন্দ জমে নি। কিন্তু দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েৎ মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পাণা পুকুরটা পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আটটা বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয় নি। শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোকও ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ীর লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে!

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে, নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই ? কই গেল ? হায় ভগবান্।

কন্যাদায়

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

বোনের বিয়ের জন্যে মা চলেছেন মামাদের কাছে। কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কিনা জানবেন—বিয়ের দিন কাছেই।

অধীর ষ্টেশনে এলো মাকে নিয়ে। ট্রেণের দেরী আছে; এদিকে ওদিকে অসংখ্য যাত্রী ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যে মা আর ছেলে দাঁড়িয়ে ট্রেণের আশায়—ময়লা কাপড় একটা পরণে, গায়ের ওপর একটা আধময়লা চাদর—চাদরটা যেমন পাতলা তেমনি ছোট, খালি পা, পায়ের গোড়ালীর দিকটা ফাটা, মুখের ভাবটা অনেক দিনের দুঃখ বেদনার ঘা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া আর মলিন, চোখ দু'টো যেন সমুদ্রের ভারে ভারী—মুক্তি পেলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে। রোগা শরীর নিয়ে ট্রেণের আশায় মা দাঁড়িয়ে—হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি।

অধীর, মায়ের পিছনের প্ল্যাটফর্মে ব'সে পড়লো। সামনে দিয়ে অনেক মেয়ে আর মা চললো—ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে সকলেই উজ্জ্বল, আনন্দিত। অধীর চেয়ে থাকে অবাক হয়ে—এতগুলো মেয়ে, এরা বেশ খুসী, বেশ সপ্রতিভ—বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, ওপাশের মেয়েটী কেমন সুন্দরী, হাসলে টোল প'ড়ে আসে গালে—

অধীর তাকালো মায়ের দিকে, কাপড়ের ভিতর দিয়ে যেন কঙ্কাল চোখে পড়ে—সংসারের অভাব অনটনে আর অত্যাচার, অবিচারে লাল রং পুড়ে তামাটে হয়েছে, মাথার এক বোঝা কালো চুলের বদলে ছোট ক'রে

খাড়া খাড়া রুঁখো চুল—ট্রেণের আশায় চাতকের মত দাঁড়ালো একটা কঙ্কাল —ভাব নেই, ভাষা নেই, যেন কলের পুতুল ট্রেণটাই হোল মুক্তি-সমুদ্র, ট্রেণ না এলে বোধ হয় আর বেঁচে থাকবার মায়ের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

টিকিটের ঘণ্টা পড়লো। মা যেন চমকে উঠলেন। অধীরের দিকে তাকালেন ভয়-ব্যাকুল চোখে, যেন ট্রেণ চ'লে গেল, ট্রেণে আর তাঁদের যাওয়া হোল না—মেয়ের বিয়েও হোল না—এ যেন একটা চরম ব্যর্থতা।

—টিকিট কাটতে হবে তো? পয়সা লাগবে কত? মা কাপড়ের খুঁট থেকে পয়সা খুলতে থাকেন। অতিমাত্রায় ব্যস্ত ভাব মায়ের।

—আমার কাছে তো টাকা আছে, অধীর মাকে আশ্বাস দেয়।

মা যেন শুনতেই পাননি। কত লাগবে? মা ক্লান্ত আর ভীত চোখে অধীরের দিকে তাকান। যেন পৃথিবীতে তিনি একা—কেউ নেই তাঁর দিকে চাইবার, তাঁকে সাহায্য করবার। বিরাট জন-সমুদ্রে তিনি একা—এই একটা মস্ত সুযোগ—এটা হারালেই সব যাবে।

অধীর গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ালো। বললো,—আমার কাছে তো টাকা আছে, আমি টিকিট নিয়ে আসি।

মা যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। একি, অধীরের কাছে টাকা আছে, সে টিকিট নিয়ে আসবে! যেন বিশ্বাস হয় না পৃথিবীতে কেউ মায়ের আপনার আছে।

টিকিট নিয়ে এলো অধীর। মা তাকিয়ে আছেন ট্রেণের আশাপথ চেয়ে আকুল প্রতীক্ষায়। ট্রেণের শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক দূরে—হয়তো আরও পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে। মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, পোঁটলাটা হাতে তুলে নিয়ে মা গাড়ীতে উঠবেন; যেন একটা পা গাড়ীর পা-দানিতে দিয়েছেন আর একটা প্ল্যাটফর্মে, এমনি ভাব মায়ের।

—এখনও ট্রেণ আসতে দেরী আছে মা।

—দেরী আছে? মা যেন অকূল সমুদ্রে পথ দেখতে পান। যেন জীবনে

ঐখনও যে বেঁচে রয়েছেন, এখনও যে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে, সেটা বুঝতে পারেন।

—ও, কত দেরী হবে ট্রেণের ?

—এই তো, এলো আর কী—

—যদি দেরী হয়—যদি তারককে না পাওয়া যায় বাসায়, তবে কি হবে !

হাসি আসে মায়ের কথায়। মামা তো আর বাসা ছেড়ে বিদেশে কোথাও যাচ্ছে না—হয়তো গিয়ে দেখবো বেড়াতে গিয়েছেন, সন্ধ্যার পর ফিরবেন।

—হ্যাঁ, তাই তো ফেরে। ওর আবার সন্ধ্যার পর কোথাও—মা অধীরের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে যান। যেন অধীর ধরতে পেরেছে, মায়ের এ কথাগুলো বানানো, শুধু নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া। যদি সত্যিই তারক কোথাও গিয়ে থাকে—যদি তার ফিরতে এক মাস দেরী হয়।

ট্রেণ এসেছে।

অধীর অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন এই জন-সমুদ্রের মাঝে। হয়তো বা অজানা আতঙ্কে মা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মত শক্ত হ'য়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাওয়ার মত।

—ওঠো তাড়াতাড়ি ! অধীর মাকে একরকম জোর ক'রেই ট্রেণে ওঠায়—যেন নব্বই বছরের এক অথর্ব্বকে ধ'রে তুলছে।

—ঐখানে গিয়ে বস।

মা যেন বসবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। সারা গাড়ীটায় লোকের ভীড় নেই বললেই চলে। প্রতি বেঞ্চেই মাত্র দু'চার জন লোক—পিছনের বেঞ্চটাতে এক ভদ্রমহিলা গোটা দু'তিন ছেলে মেয়ের সাথে। একটী মেয়ে বড়, ষোল সতের হবে, বিয়ে হয়নি।

—আসুন না, বসুন এখানে। ভদ্রমহিলাটি বলেন।

মা যেন এবারে সম্বিৎ ফিরে পান। যেন এতক্ষণ গাড়ী ভরা লোক দেখে তিনি বসবার জায়গা পাওয়া যায় কেমন ক'রে সেই কথাই ভাবছিলেন।

মা গিয়ে বসেছেন একপাশে জড়সড় হ'য়ে, সঙ্কুচিত হ'য়ে। ভাবটা—বেশী জায়গা নিলে যদি কেউ তাঁর মেয়ের বিয়েতে বাগ্‌ড়া দেয়, বাধা দেয়!

—ভাল হ'য়ে বসুন না, জায়গা তো ঢের রয়েছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মা একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখেন—কেউ দেখছে কিনা তাঁকে। কেউ দেখছে কিনা যে, তিনি বেশী জায়গা নিয়ে ভাল ক'রে বসছেন। সুতরাং তাঁর মেয়ের বিয়ে যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করা হবে।

মায়ের অবস্থা দেখে অধীর হেসে ফেলে। বলে, পুঁটলীটা আছে তো?

মা চারদিকে এলোমেলো তাকান—হয়তো কথাটা তিনি বুঝতে পারেন নি।

—এই তো তোমার হাতেই রয়েছে।

মা হাতের দিকে চেয়ে লজ্জা পান—সত্যিই যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছেন। হয়তো পুঁটলীটা ফেলে এলে অধীর রাগ করতো, অধীর হয়তো তাঁকে ভাইএর বাসায় নিয়েই যেত না—ভাগ্যিস ওটা সঙ্গে আছে!

—কি আছে আপনার পুঁটলীতে?

—এর মধ্যে এই···কাপড় আছে। যেন অনেক ভেবেচিন্তে উত্তর দিচ্ছেন মা।

—কোথায় যাবেন?

—ভাইএর বাসায়।

—বেড়াতে বুঝি?

—না—হ্যাঁ, হ্যাঁ বেড়াতে। মেয়ের বিয়ের কথা বলতে যেন মায়ের আটকে গেল। যদি ভদ্র-মহিলা ব'লে বসেন—আপনার ভাই তো এখানে নেই, দিন দু'য়েক হলো তিনি চেঞ্জে গেছেন—ফিরবেন মাসখানেক পরে, তাহলে—

—ওটি বুঝি আপনার ছেলে?—মেয়ে নেই তো সঙ্গে? বেঁচেছেন, মানুষের মেয়ে যেন কখনও না হয়!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন? মেয়ে না হওয়ার কামনায় মা চমকে ওঠেন!

—এই দেখুন না, আমার এই মেয়ে। একেবারে বট-গাছের মত বেড়ে

উঠেছে। এখন বিয়ে না দিলেই নয়! কি বলব দিদি রাত্রে ঘুম হয় না। এত বড় ধাড়ী মেয়ে—দেখুন হাসছে, লজ্জাও করে না?

—বিয়ে হয়নি, বিয়ে হবে না? মা ভীতুর মত শুধোন।

—কে জানে দিদি কবে বিয়ে হবে, কে যে নেবে তা' ভগবান্ই জানেন।

মা ভাবেন, ভগবান্ জানেন। তবে কি তাঁর মেয়ের কথাও ভগবান্ জানেন —অর্থাৎ কবে হবে তা' কে জানে। হয়তো গিয়ে দেখবেন, তারক বাড়ী নেই।

—ট্রেণটা এসে থামলো একটা ষ্টেশনে।

—তাড়াতাড়ি নেমে পড় মা, ট্রেণ ছেড়ে দিলো বোধ হয়।

মা পুঁটলী নিয়ে তড়াক ক'রে উঠে পড়ুন। যাঃ, যাওয়া আর তাঁর হ'লো না ভাইএর বাড়ীতে, মেয়ের বিয়েও হ'লো না।

—এইখানে নামবেন বুঝি?

—হ্যাঁ। অধীর কোথায়, অধীর!

—এই তো আমি। ব'সনা ভাল হ'য়ে, এখনও নামার দেরী আছে।

—তবে যে আমাকে নামতে বললি?

—ও অন্য কেউ।

—ওঃ! মা লজ্জায় লাল হ'য়ে আবার ব'সে পড়েন। সত্যিই বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তিনি। এতটা ব্যস্ততা দেখালে অধীর যে আরও মুষড়ে পড়বে, তার ওপরেই তো সারা সংসারের ভার—

—কোন্ ষ্টেশনে নামবেন? ভদ্র-মহিলা আবার শুধোলেন।

—সামতা।

—সেইখানে বুঝি আপনি থাকেন?

—না, ভাইএর বাসা।

—ওঃ, আমারও ভাইএর বাসা সামতা। কোন পাড়া বলুন তো?

মা যেন ফাঁপরে পড়েছেন—কোথায় থেকে কোথায় এসে গেল কথার মোড়।

—আমিও গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে, ভাইএর ওখানেই এই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করাতে। তা' ভাইই বলুন আর যাই বলুন কেউ কারও নয়। বললে, আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ দিদি। আমরা আর কি করতে পারি বলো, যে দিন কাল পড়েছে—

মায়ের মুখ, ততক্ষণে সাদা হ'য়ে গিয়েছে। কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে ওঁর দেহ থেকে—যেন হঠাৎ চাবুক খেয়েছেন কোথাও!

অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ

জগদীশ গুপ্ত

সরোজাক্ষ সেন বিবাহ করিয়াই আতঙ্কে আপ্‌সোসে সারা হইয়া গেল। প্রেমের আকর্ষণ দুর্ব্বার এবং দুরতিক্রম্য হইয়া তাহাকে দিয়া বিবাহ করাইয়াছে, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে-কোনো নামধারী সংকটের আশঙ্কা বিস্মৃত হইয়া মানুষ যে রূপসম্ভোগ করিতে চায়, এই সত্য তার পক্ষেও সত্য। অংশুময়ীর রূপও অসামান্য—তার রূপের তুলনা দুর্লভ—অসংখ্য লোকের পক্ষেই দৃশ্যমান্ বিষয় হিসাবে তা' অপরূপ এবং অনিবার্য্য লোভের সামগ্রী।

বিবাহের পূর্ব্বে অংশুময়ীর প্রেম এবং রূপের উপর একাধিপত্য স্থাপনের গর্ব্বও তাহাকে যুগপৎ আবিষ্ট এবং আকুল করিয়াছিল, এ কথাও সে মনে মনে বিশেষভাবেই স্বীকার করে। সংখ্যাতীত ব্যক্তিকে হতাশার তিমিরে ডুবাইয়া

দেওয়ায় তার নির্ম্মল আনন্দ জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ মনে মনে সে নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও সে নিজের কাছে অস্বীকার করে না। অপূর্ব্ব তন্ময়তার পর, এ জয়ের মতো উল্লাসকর উপভোগ্য জয় জগতে খুব অল্পই আছে; পুরাণে এবং ইতিহাসে অনন্ত রূপৈশ্বর্য্যশালিনী রমণীর রমণীয় দেহ অধিকার এবং হৃদয় জয় করিবার জন্য যুদ্ধ-ঘোষণা আর রক্তপাতের সঙ্গে যত হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে, হীরকের খনি অধিকার কিংবা তার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্যও তেমনটি কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

হীরকের খনির চাইতেও মূল্যবান্ এবং লোভনীয় এবং হীরকের চাইতেও অতুলনীয় রূপসমন্বিত যে দেহ তাহাই করতলগত হওয়ায় সরোজাক্ষের অন্ততঃ কিছুদিনও আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় নির্ব্বিকল্প পুলকে মগ্ন থাকা উচিত ছিল, নতুবা পূর্ব্বরাগের দিনে এত উদ্বেল উত্তেজনার আর একাগ্র আগ্রহের কি কোন অর্থ হয়! অপরাপর অভিপ্সু ব্যক্তিগণকে ঘূর্ণিত করিয়া দূর-দূরান্তে ছিটকাইয়া দিয়া বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টির সন্মুখে জয়পতাকা উড়াইবার আর সেই সূত্রে মনঃপীড়াক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিঃশ্বাসের অভিশাপ কুড়াইবারই বা কি দরকার ছিল যদি স্ত্রীকে সহ্য করিবার ক্ষমতাই না থাকে! অংশুময়ী অপরের স্ত্রী হইতে পারিত; স্বামীটা সুখী হইত, সুখে থাকিত, এবং সুখী করিত। কিন্তু তা' না হইয়া এ হইল কি? নিজেকে এই দুর্জ্জয় প্রশ্ন করিয়া সরোজাক্ষ ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি প্রেরণ করে, এবং মনে মনে এত সঙ্কুচিত হয় যে তা' বলিবার নয়।

অংশুময়ীকে সর্ব্বতোভাবে পাইবার জন্য সে চারিদিক্ বজায় রাখিয়া বীর্য্যবান রণকুশল রথীর মতো লড়িয়াছিল নিশ্চয়ই: কিন্তু সেই প্রাণপণ প্রয়াসের কারণটা কি ছিল তাহা সরোজাক্ষ এখন ভাবিয়া পায় না। অন্যান্য প্রেমাকাঙ্খী-গণের পরাজয় উপভোগ করিবার ইচ্ছা তখন খুবই ছিল, এখনো মনে পড়িলে ক্ষীণ একটু আনন্দই জন্মে; কিন্তু সেই সঙ্গেই তার মনে হয়, রূপশালিনী নারীর হৃদয় জয় করিয়াছিলাম—তাহাই পৌরুষের এবং আকাঙ্খার যথেষ্ট সার্থকতা মনে করা উচিত ছিল। বিবাহ করিতে গেলাম কেন! এমন

অবিমৃষ্যকারিতা আর দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল।...সরোজাক্ষের আতঙ্ক আর আপ্‌সোসের অন্ত নাই।

সরোজাক্ষের আর্থিক অবস্থা আদৌ গৌরবজনক নয়। তার বাবা ছিলেন অধ্যাপক। অকালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি একখানা বাড়ী এবং অনেকগুলি বই রাখিয়া গেছেন, আর কিছু না। পড়িতেন খুব; নিভৃতে থাকিয়া পড়িবার জন্য তিনি এমন কায়দায় বাড়ীর একটা কক্ষ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যার একটি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যায়—তিনি স্বেচ্ছায় না উঠিলে ডাকিয়া তোলা যায় না। সরোজাক্ষও অধ্যাপক এবং এই ঘরটিতেই সে বসে, পড়ে আর বন্ধু-বান্ধব আসিলে বসায়। বোনেরা বলে, দাদার তপোবন। সরোজাক্ষ অধ্যাপক বটে, কিন্তু যথেষ্ট উজ্জ্বল অর্থাৎ মনভরানো ব্যাপার কিছু নয়। বেতন অল্প। মা আছেন; তিনটি ভাই আছে, পড়ে! দু'টি বোন আছে, তারাও পড়ে। এ-সবের পিছনে খরচ ঢের।

অংশুময়ীর বাবা খুব আধুনিক রুচির লোক হইলেও, অর্থাৎ প্রেমমূলক বিবাহই বিবাহের প্রকৃষ্ঠতম সংস্করণ মনে করিলেও, সরোজাক্ষকে নানা কারণে জড়িত এবং নানা দিকে দায়গ্রস্ত, অর্থাৎ বহু পোষ্যের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হইবেও, বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন; ভয় করিয়াছিলেন গরিবানার....

কিন্তু অংশুময়ী সে-ভয় করে নাই; সে বলিয়াছিল,—দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা আমার হবে, এ-শিক্ষা তোমরা যদি আমায় না দিয়ে থাকো তবে কিছু শেখাওনি। পুঁথির বিদ্যে কতো অনর্থক তা' সবাই জানে; পুঁথিগত নীতিমালার কোনো মূল্য নেই। দৈবাৎ কোনো সৌখীন ভাগ্যবান্ এসে আমার পাণিগ্রহণ করবে আর আমি তৎক্ষণাৎ সুখের স্বর্গ আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চাবি হাতে পাবো, এ আশা যদি করে' থাকো তবে অন্যায় করেছ—দূরদৃষ্টির পরিচয় দাওনি'।

তারপর বলিয়াছিল,—টাকার চাইতে সুখ বড়ো। তোমরা আমার

সুইই কামনা করো, এটা বোধ হয় আমি মনে করতে পারি!....চপল ব্যক্তিকে আমি যেমন ভয় করি, তেমনি করি খুব সূক্ষ্ম ধারালো বুদ্ধির লোককে; আবার মোটা-বুদ্ধি লোককেও আমি পছন্দ করিনে। সরোজাক্ষবাবু মাঝারি লোক—সত্যিকারের ভালোমানুষ। যতটা বুদ্ধি থাকলে লোকে সংসারী হ'য়ে সুখে থাকতে পারে, এবং সুখে রাখতে পারে, ঠকতে যেমন ঠকাতেও তেমনি গররাজি থাকে, ঠিক্ তেমনি ধাতের মানুষ। মনটা ভারি কোমল—ভাই-বোন্গুলিকে আর মাকে সুখে রাখতে তাঁর কি আকুলতা! ....বলিয়া সে বাপের মুখের দিকে অতল একটি দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল—

বাবা সম্মতি দিয়াছিলেন।

অংশুময়ী কোনো প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না। অর্থের ঔজ্জ্বল্য, বিস্তৃতি আর সমারোহ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না—প্রেমেরই জয় হইল। সরোজাক্ষ অপরিসীম প্রেম হৃদয়ে অনুভব এবং অপরূপ সৌন্দর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইল....

একটা প্রকৃত সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে কলিকাতাস্থ যাবতীয় কলেজের অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা এবং ছাত্র আর ছাত্রী কর্তৃক 'নাট্যাভিনয়ের' সূত্রে যে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা গ্রন্থিবদ্ধ এবং মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত, আর অকাট্য, অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা অখণ্ডনীয়, হইল।

কিন্তু শীঘ্রই মুস্কিল হইল সরোজাক্ষের। তার অন্তরের অন্তস্থল যে এমন শিথিল আর দুর্ব্বল তাহা সে নিজেই জানিত না; সেখানে দেখা দিল দুর্ণিবার আতঙ্কের কম্পন আর অনুতাপের দাহ; তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, অপরিহার্য্য কঠোর দায়িত্ব বিবাহের অন্তর্ভূত হইয়া সবারই পক্ষে যেমন সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া আছে এবং থাকে, তার পক্ষেও তা' তেমনি আছে এবং থাকবে। এই গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আর নির্দ্দোষভাবে পালন করা যাইবে কেমন করিয়া! ইহাই ভাবিয়া তার বুক দুরু দুরু করে—হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন কষ্টকর হইয়া ওঠে.... •

নানান্ ফন্দি আর উপায় আবিষ্কারকরত সুখঅভ্যস্তা সুন্দরী স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে চিরকাল কেবল অত্যাজ্যা আর অঙ্কশায়িনী ভোগ্যার মর্য্যাদা দিয়া বিলাসিনীর আসনে স্থাপিত করিয়া রাখা ত' একটা হাস্যকর চাপল্য, ছেলেমানুষি—তাহাতে কর্ত্তব্যগত দায়িত্বের চাইতে ভোগাকাঙ্খাদূষিত বিহ্বলতাই বেশি—সেটা উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকারান্তর, বিপাক এবং বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায় তা' জ্বালাময়—সরোজাক্ষের আতঙ্ক সে-হিসাবে নয়; তার চিন্তা, খাঁটি ভদ্রলোকে যে-ধারা অনুসরণ করিয়া নিঃশঙ্ক, অবাধ, অভাবশূন্য, শান্তিময় জীবন যাপন করিতে মনে মনে পরম সচেষ্ট লালায়িত হইয়া থাকে, সেদিক দিয়া সে সফলকাম হইবে কি না! ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবিরাম সিদ্ধান্ত আর অনুভব করে যে, সেদিকে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হওয়া অসম্ভব; কারণ, সে সামর্থ্যহীন; সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে কর্ত্তব্য ও দায়িত্বপালন ক। তার পক্ষে এমনই কঠিন যে, তাহাকে নিয়তই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে—স্ত্রীর বিরাগই সহ্য করিতে হইবে!....মা ও ভাই বোনগুলি যেমন স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক বলিয়া যেন বৃক্ষের শাখার মতো অজ্ঞানতই জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, স্ত্রী তেমন নয়—তাহাকে স্বতন্ত্র স্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া পরিধির অভ্যন্তরে আনয়ন করা হইয়াছে। কাজেই, কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া দায়িত্ব-সম্পাদনের প্রচেষ্টা যত চরম আর প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতে পারে, স্ত্রীর বেলায় ঘটে তা'-ই। স্ত্রী অন্তরের পরম ধন হইয়া আসিতে পারে, কিন্তু নিরঙ্কুশ অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে তার বিলম্ব ঘটে—ভাই ভগিনী জন্মমাত্রেই তা' হয়, জননীর গর্ভচ্যুত হইবামাত্র জননী তা' হন্, কিন্তু স্ত্রী চক্ষের নিমেষে তেমন কিছুই হয় না, দেখিতে দেখিতে একেবারে মিশিয়া সে একাকার হইয়া যায় না। স্ত্রী খণ্ড বস্তু, অংশ এবং অংশীদার; সুতরাং তার সম্বন্ধে দায়িত্ব-পালন যে কেমন গুরুতর কঠোর ব্যাপার তা' নিঃশেষে ধারণা করিতেই পারা যায় না—তাহাতে কত দূরদর্শিতা চক্ষুষ্মত্তা আর অবিরাম সূক্ষ্ম সতর্ক মনঃসংযোগ প্রয়োজন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। তার উপর, 'সন্তানাদি'

জন্মিবে। স্ত্রী স্বামীর চাইতে সন্তানের সুখান্বেষণ করে অধিকতর একাগ্রতা আর অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত, ইহা খুবই সত্য। এখনকার গুরুভার দায়িত্ব তখনকার গুরুভার দায়িত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যোগজনিত একটা অসহনীয় সঙ্কটের উদ্ভব অবশ্যই হইবে—না হইয়া পারে না।

সুতরাং সরোজাক্ষের মনে হয়, এ করিয়াছি কী! স্ত্রী সংগ্রহ করিছি, কিন্তু সে যে নির্ব্বিবাদী অমায়িক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের পক্ষে এমন নিদারুণ সমস্যা তা' আগে মাথায় আসে নাই কেন! সরোজাক্ষের নিজেকে খুব বিপন্ন ক্লান্ত অসহায় আর হঠকারী মনে হয়—তার আতঙ্ক আর আপসোসের অন্ত থাকে না।....স্ত্রীর কাছে মান মর্য্যাদা, যা' মানুষ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির চিরদিন অটুটভাবে রক্ষণীয় তা' কিছুমাত্র বজায় রাখা যাইবে না; কারণ, দায়িত্ববোধ সত্ত্বেও হাতে কলমে ষোল আনা, অর্থাৎ যতটা স্ত্রী প্রত্যাশা করে নিক্তির ওজনে ঠিক ততটা, দায়িত্ব পালন দুঃস্বপ্নের মতো অস্বস্তিকর আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অসম্ভবই হইবে। ফলে স্ত্রী অপদার্থ লঘু খর্ব্ব মনে করিবে, এবং অনুতপ্ত হইবে....ইহার চাইতে যন্ত্রণাপ্রদ দুর্গতি কোনো ভদ্রলোকের আর কি ঘটিতে পারে! সরোজাক্ষ মনে মনে হাঁসফাঁস করে।

অংশুময়ী উপর্য্যুক্ত সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয় বিন্দুবিসর্গও অবগত নয়—সে স্ফূর্তিতেই আছে।

সরোজাক্ষের শ্বশুর অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব পরিচ্ছন্ন লোক; তিনি নিজেও চমৎকার পরিচ্ছন্ন এবং পরের পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর এমন স্পষ্ট লক্ষ্য যে, মাত্র তিন-দিনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাড়ি লইয়া কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি ঐ অশোভন দাড়ি দৃষ্টেই তার প্রকৃতির বিচার করেন, এবং বিতৃষ্ণার দ্বারা তাহাকে গভীর ও গূঢ়ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখেন। তাঁর মতে, আত্মমর্য্যাদা-বোধ আর সুশিক্ষা কার কতটা আছে তারই মাপকাঠি হইতেছে পরিচ্ছন্নতা; এবং গভীরতর কথা হইতেছে ইহাই যে, অপরিচ্ছন্ন লোকের মন ধর্ম্মানুগ নহে। তৃতীয়তঃ, ইহাও তাঁর গভীরতম চিন্তার আবিষ্কার যে, অসবর্ণ এবং স্বগোত্রে

বিবাহ প্রকৃতিগত পরিচ্ছন্নতার দিক্ হইতেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে—রক্তের তেজস্করতা ক্ষুণ্ণ করে বলিয়া উহা সামাজিক একটা পাপ; সে-পাপের ফল অবশ্যই খারাপ; চন্দ্রে রাহুর স্পর্শ যেমন পৃথিবীর আব্‌হাওয়াকে দূষিত করে তেমনি। ঐরূপ বিবাহ মনকে কলঙ্কযুক্ত করে।

সরোজাক্ষ তাঁর স্বজাতি, এবং স্বগোত্রীয় নহে; তার সঙ্গে অংশুময়ীর বিবাহ এই কারণেও অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল।

সে কথা থাক্—

এদিকে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের দরুন প্রতিবেশী পঙ্কজ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়—প্রতিবেশী যুবকগণের মধ্যে সেই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দসই, এবং তাঁর আদরণীয়। অর্দ্ধেন্দুবাবুর বাড়ীর দু'টি বাড়ীর পরই তৃতীয় বাড়ীটা পঙ্কজদের; সুতরাং উভয়ের অবস্থানে নৈকট্য যথেষ্ট। পঙ্কজ খুব যায় আসে—খুব গল্প করে; অন্তঃপুরে যাইয়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে এমন ছেলে-মানুষি করে যে, মনে থাকে না, ছেলেটা এত লেখাপড়া জানে। জ্যাঠাইমা যত হাসেন তত করেন স্নেহ। অংশুময়ীও তার হাস্য-পরিহাস সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়াই উপভোগ করে, পাল্টা জবাবও যে না দেয় এমন নয়।....এ বাড়ীতে নানা দিক্ হইতেই পঙ্কজের আদর যথোচিত।

পঙ্কজ পড়াশুনাতে প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসনীয় ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছে আরোহণের পথে একটি বারও পা না পিছলাইয়া সে শিখরে পৌঁছিয়াছে—এম্, এ পাশ করিয়াছে—তারপর 'ল' পাশ করিয়াছে, এবং তারপর তা আরও কৃতিত্ব ইহাই যে, সে এখন শিক্ষানবিস্ মুনসেফ—দুর্লভ বিচারাসনে অধিকারী সে! কিন্তু ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগণের মত এই যে, পঙ্কজ যতটা শিক্ষ প্রাপ্ত তার চাইতে চতুর সে বেশি, এবং যতটা চতুর সে, তার চাইতে (যোগাড়ে বেশি। সে এতগুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে এবং দেওয়ানী হাকি হইয়াছে কেবল ধীবিশিষ্ট যোগাড়পটুতায়। এইখানেই তার বাহাদুরী; এ তার অনিন্দ্য পরিচ্ছন্নতা আর সুচারু বাক্যচ্ছটা, অর্থাৎ সমগ্র ভাবে এক

অভিজাত বাবুয়ানির ঘটা, সেই যোগাড়ের অঙ্গ, 'ভেক নইলে ভিখ্ মেলে না' যেমন তেম্‌নি একটা বাহ্য ব্যাপার, ভড়ং।

পঙ্কজ না জানে এমন বিষয় নাই—অক্‌সন ব্রিজ হইতে জ্যোরোঅ্যাস্‌ট্রিয়ানিজম্ পর্য্যন্ত তার নখ-দর্পণে—কোনটাকে কি বলিলে কি বুঝায়, এবং কি ভাবে কে বলিলে কোন্ কথা কেন শ্রোতব্য হয়, তাহাও সে জানে আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে। মুনসেফী পাওয়ার পর হইতে সে লোকচরিত্র সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ হইয়াছে। সে এখন শিক্ষানবিস হাকিম; ' মাস মাড়াই হরিসাগর চৌকির হাকিমের আসন অলঙ্কৃত করিয়া, অর্থাৎ জটিল মাম্‌লা মুলতুবী রাখিয়া এবং একতরফা মাম্‌লায় ডিক্রী দিয়া, বাড়ীর ছেলে বাড়ী আসিয়াছে—আবার কবে ডাক আসিবে সেই আশায় সে পথ চাহিয়া আছে…

বাড়ী আসিলে শ্রদ্ধাস্পদ অর্দ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা সে করিবেই—এবারও করিয়াছে, এবং প্রায় দু'বেলাই করিতেছে। এবার তার অধিকাংশ গল্পই জজ্ সাহেব, নামজাদা উকিল, বইয়ের আইন আর বিচারের আইনের পার্থক্য সাক্ষীদের দিগ্-ভ্রম প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ফুটিতেছে ভালো। অর্দ্ধেন্দুবাবু তার রসিকতায় কখনো হাসিয়া অস্থির হইয়া যান্, কখনো তার মেধার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এবং এই সময়েই তিনি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন—তাঁর মনে, অর্থাৎ তাঁর সংস্কারাত্মক বিবেচনায়, হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল….তাহারই বশে তিনি একদিন অংশুময়ীকে সম্মুখে পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন,—স্বজাতি নয় এই ওজরে পঙ্কজের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করাটা বোধ হয় ঠিক হয় নাই অংশু।

অংশুময়ীর পাণিপ্রার্থী হইয়া পঙ্কজ একদা, হাকিম হইবার পূর্ব্বে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর অন্তঃপুরে ঘটকী পাঠাইয়াছিল; কিন্তু পঙ্কজকে পরিচ্ছন্ন এবং গুণালংকৃত জানিয়াও, তিনি সে প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই, যথোপযুক্ত গম্ভীরভাবে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে স্বজাতি নহে।

এখন সরোজাক্ষের সঙ্গে অংশুর বিবাহের পর তাঁর মন সময় সময় প্রচণ্ড দোল খাইতেছে—তুলনা স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে…

কিন্তু অংশুময়ী পিতার ঐ অসমঞ্জস কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল,—তুমি দর্পাত করলেও, আমি করতাম না—মহিমময়ী জজ-গিন্নী হবার লোভেও না। পঙ্কজের সঙ্গে লুডো খেলা চলে, হাসি-তামাশা, গল্প-গুজব করা চলে, সিনেমা থিয়েটারে যাওয়াও চলে, কিন্তু গৃহস্থালী করা চলে না। আমি জাঁক কি সেলাম চাইনে, আমি চাই শান্তিতে সংসার করতে। সুস্থ পারিবারিক জীবনই চাই—ফ্যাসানও চাইনে, লেডি হতেও চাইনে। পঙ্কজ যতই গুণান্বিত পরিচ্ছন্ন হোক আর তার ভবিষ্যৎ গৌরবময় হওয়ার যত সম্ভাবনাই থাক, অনিবার তার মতিগতির অনুসরণ করা আমার দ্বারা চলত না। মানুষের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই প্রগাঢ়তা থাকা উচিত—পঙ্কজের তা' নাই। সময় সময় হঠাৎ তার আকর্ষণে মন অবশ হলেও, চিরদিনের সঙ্গী হিসাবে সে অবিশ্বাস্য আর অযোগ্য। আমাকে ক্ষমা করো—তোমার অনুতাপ অকারণ বলেই অন্যায়, বাবা!—বলিয়া অংশু একটু হাসিল।

সমুদয় অকপট উক্তির মূলে থাকে একটি পরিচ্ছন্ন মন। কাজেই অর্দ্ধেন্দু-বাবু কন্যার উক্তি শুনিয়া খুশীই হইলেন; কিন্তু কন্যা অংশুময়ীর কল্যাণকামী পিতা হিসাবে অর্দ্ধেন্দুবাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাতে দমিত এবং অনুতাপ বিদূরিত হইল কিনা, তা' বুঝা গেল না।

পঙ্কজের সঙ্গে সরোজাক্ষের পরিচয় হইয়াছে, শ্বশুরালয়েই হইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু পঙ্কজকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এমন স্তুতিস্ফীত ভাষায় আর গদগদ স্বরে যেন সে আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক একটি, বহু সাধ্য-সাধনায় তাহাকে প্রসন্নকরত আকাশ হইতে অবতরণ করাইয়া দেওয়ানী হাকিমের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করানো হইয়াছে, এবং এক্ষণে এই বৈঠকখানায় ঐ চেয়ারে বসানো হইয়াছে। কিন্তু কেবল অর্দ্ধেন্দুবাবুর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া নয়, নিরপেক্ষ-

ভাবেই উহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জন্মিয়াছে; এবং ঐ শ্রদ্ধার দরুন এই বন্ধুত্ব স্থায়ীই হইবে, ইহাও উভয়েই অনুভব করিতেছে।

পঙ্কজ আজ পর্য্যন্ত সরোজাক্ষের বাড়ীতে আসে নাই—পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়া অনুরাগবশতঃ আজ আসিয়াছে। তার অভ্যর্থনায় ত্রুটি ঘটিল না—সরোজাক্ষ অকপটভাবে আর গাঢ়ভাবে এবং অংশুময়ী অকপটভাবে আর সহজভাবে তাহাকে সংবর্দ্ধনা করিল…

কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, দুই বন্ধু এক ঠাঁই হইলেই আমরা তর্ক করিতে শুরু করি—সরোজাক্ষ এবং পঙ্কজও তর্ক করিতে শুরু করিয়াছে—

বিষয়,—ইংরেজি বনাম বাংলা ভাষা।

শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষা আপত্তিকর এবং অচল। কারণ, তাহা শিক্ষাকে অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, বিলম্বিত এবং কষ্টকর কঠোর করে। পঙ্কজ এই মত প্রকাশ করায় সরোজাক্ষ প্রতিবাদ করিল। বলিল,—উঁ হুঁ, মোটেই নয়। প্রথম থেকে অর্থাৎ বর্ণপরিচয় থেকে, শুরু ক'রে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যা ইংরেজির সাহায্যে অধিকার করা সহজ। তারপর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—বলুন দেখি, বলবিদ্যা মানে কি?

পঙ্কজ বলিতে পারিল না, হাসিতে লাগিল।

সরোজাক্ষ বলিল,—বলবিদ্যা মানে আর্ট অব রেস্‌লিং নয়, মেক্যানিক্স দেখুন ত' কত সহজে বুঝে ফেললেন! সংস্কার বা অভ্যাস কত দৃঢ়মূল দেখুন ইংরেজির চর্চ্চা যেখানে বহুদিন থেকে হয়ে আসছে সেখানে ইংরেজির তরজমা-করা দুরূহ বাংলা চালানো যেমন পণ্ডশ্রম, তেমনি ক্ষতিকর আর অবিচার।

পঙ্কজ কথা কহিল না—বিবিধ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বোধ হয় যৌক্তিকতা স্বীকার অস্বীকার দুইই করিল।

সরোজাক্ষ বলিতে লাগিল,—তারপর দেখুন, যে ছেলে কি মেয়ে ক, খ পড়ছে তাকে দিয়ে উচ্চারণ করাতে হবে মূর্দ্ধণ্য ণ; মূর্দ্ধণ্য ষ; তালব্য শ;

অন্তঃস্থ য। আজ পর্য্যন্ত আমি ত' মূর্দ্ধণ্য ণ, খুব অবাধে উচ্চারণ করতে পারিনে, অসংকোচে লিখতে ত' পারিই নে—বলিয়া হাসিল। পঙ্কজও হাসিল, অংশুময়ীও হাসিল।

অংশুময়ী বলিল,—কিন্তু বাংলা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা....

—তা' হোক; মায়ের মুখের ভাষায় আমরা তেমন কিছুই শিখিনে; চাল, ডাল, হাঁড়ি, সরা, মুড়ি, সন্দেশ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর নাম শিখি, গাল শিখি, আর নানাবিধ পূজার্চ্চনায় কি কি সামগ্রী প্রয়োজন তারই ফর্দ্দ শিখি। বর্ণনীয় জ্ঞেয় বা অনুভবনীয় বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের শব্দ সংগ্রহ ঐ টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাছাড়া ঈশ্বর বলতে যে অনির্ণেয় সত্তাকে বুঝায় মায়ের মুখ থেকে আমরা ক'জন তার আভাস পাই! কিন্তু ওদের পারিবারিক উপাসনা—

অংশুময়ী প্রবাহে বাধা দিল। বলিল,—কি কথায় কি কথা বলছ!

—বলছি, মাতৃভাষা পাঠ যেখানে শুরু হবে তার সঙ্গে যোগ রেখে মাতৃভাষার ব্যবহার আর উৎকর্ষ আমাদের বাড়ীতে ঘটে না। ইংরেজের তা' চলে। আমাদের ভাষা এবং ভাষাশিক্ষা তাইতেও কিছু খাটো হয়ে থাকে। ইংরেজি আমাদের যতটা অপরিচিত, অনেক ক্লেশের পর অনেকটা দূর এগিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাও ঠিক ততটাই অপরিচিত। সংস্কারগত সহজ বাহন বর্ত্তমানে ইংরেজিই। হায়েষ্ট কমন্‌-ফ্যাক্টর বুঝি কিন্তু গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বুঝিনে। কোইনসিডেন্স—সমাপতন; মোমেণ্টাম্—ভরবেগ; গ্র্যাভিটি—অভিকর্ষ; হরিজনট্যাল—অনুভূমিক; গ্লেজ—চিক্কণলেপ; ওয়াটারপ্রুফ—জলাভেদ্য; ভার্টিক্যাল—উল্লম্ব; লঙ্গিটিউড—দ্রাঘিমা; সাবম্যারীন্—অন্তঃসাগরীয়; কমপ্লেক্স—গূঢ়ৈষণা; সার্টিফিকেট—শংসালেখ ইত্যাদি পরিভাষার উচ্চারণ কষ্ট আর শব্দ গঠনের জটিলতা একবার অনুভব করুন....

কিন্তু পঙ্কজ তা' অনুভব করিয়া কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হইল না। সে অন্যমনস্কের মতো বলিল,—অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসবে। ঐ

শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দ যত আছে সব অপরিচিত বলে' প্রথম প্রথম ভয়ংকর মনে হবেই।

সরোজাক্ষ বলিল,—তা' হতে পারে; কিন্তু আবার দেখুন, কেবল অক্ষর পরিচয় হল, একটি একটি করে সবগুলি অক্ষর লিখতে শিখলাম আর তখনই নিষ্কৃতি পেয়ে কেবল ভাষা-শিক্ষাই চলতে লাগল, বাংলাভাষা তেমন নয়। অ থেকে ঔ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণকে, ক থেকে হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে জুড়তে হলেই তাদের রূপান্তর আর নূতন করে পরিচয়ের প্রয়োজন পুনঃপুনঃ ঘটতে লাগল; তারপর ফলা ইত্যাদি আছে। ক-এর ফলা দিলে, ত যুক্ত করলে ক-এর আর ক-এর আকার কিছুই রইল না—এই রকম অনেক ঝঞ্ঝাট যুক্তাক্ষরের....

তারপর হাসিমুখে জানিতে চাহিল,—বাঙ্গা, অঞ্জন, সঞ্চয়, রসজ্ঞ, শশাঙ্ক, ব্রহ্মা, শব্দগুলো ঠিক ঠিক রেখাবিন্যাস করে লিখতে পারেন?

পঙ্কজ বলিল,—পারিনে।

—তুমি পারো?

অংশুময়ী বলিল,—আমিও পারিনে।

—তা' হলেই দেখা যাচ্ছে, স্থানে স্থানে ব্যাপার খুবই গুরুতর। ইংরেজিতে কিন্তু এমন নয়; বানান্ জানি, লিখতে পারলাম না, ইংরেজির কাঠিন্য এই পর্য্যন্ত। বাংলার কাঠিন্য আর একটু অগ্রসর হল—বানান্ জানি কিন্তু অক্ষর বিশেষের হুবহু ছাঁচটা জানিনে বলে যথাবৎ আকার দিয়ে লিখতে পারলাম না—এ কি কম কষ্ট, আর তা' রপ্ত করাও কি কম অধ্যবসায়ের কাজ! বর্ণপরিচয়ের পর এ গুলোর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। ইংরেজি যে শিখছে তার চাইতে কত বেশি বাধা ঠেলতে হল, আর কত পিছিয়ে পড়লাম তা' একবার ভাবুন দেখি! তারপর দেখুন, সদ্যপ্রসূত, বিসর্গ নেই; সদ্যঃস্নাত, বিসর্গ আছে; সদ্যোজাত, বিসর্গ ও হল....

পঙ্কজ এই সময়ে হঠাৎ একবার হাই তুলিল। বলিল,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

ভারি আপত্তি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন,—ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করায় শিক্ষার্থীর মাথা খাওয়া যাচ্ছে।

—যাদের তা' যাচ্ছে, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলেও তাদের তা' যেত। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি লিখতেন চমৎকার। ভাষার অধিপতি হবার কৌশল তিনি জানতেন, তাঁর যত্নও ছিল অসাধারণ। যাদের তা' নেই তারাই কঠিন মনে করে। একবার ভাবুন দেখি, আপনাদের আইনের সব বই বাংলায় লেখা—পারেন মুখস্থ করতে?

পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—ভাবতে সেটাকে কেমন বিসদৃশ লাগে যেন।

অংশুময়ী বলিল,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন কি কেবল ব্যাড বয়দের পক্ষাবলম্বন করে?

—কি কি যুক্তি তিনি দেখিয়েছিলেন তা' আজ আর মনে পড়ছে না। প্রবন্ধটা আছে? সরোজাক্ষ জানিতে চাহিল।

—আছে।

—নিয়ে আসি। ও-ঘরে আছে বুঝি?

—হ্যাঁ, আলমারীতে।

সরোজাক্ষ উঠিয়া গেল। এতই তার তাড়াতাড়ি যে জুতা পায়ে দিবারই সময় তার হইল না। সরোজাক্ষ ও-ঘরে যাইয়া দেখিল, আলমারীতে তালা দেওয়া আছে। চাবি তাহার পকেটে আছে। যে জামার পকেটে সেই চাবি আছে সেই জামা আছে ঐ ঘরে—যে ঘর হইতে সে আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে ফিরিতে হইল; এবং সেই ঘরের জানালার কাছে আসিয়াই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল সে-দৃশ্যের স্বপ্নও সাংঘাতিক! দেখিল, পঙ্কজ এবং অংশুময়ী টেবিলের উপর দিয়া পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া আছে—পঙ্কজের বাঁ হাতখানা অংশুময়ীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে—উভয়েই চুম্বনরত....

মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সরোজাক্ষের মনে হইল, ফিরিয়া যাই। পরক্ষণেই সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল...

পঙ্কজ আনত চক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অংশুময়ী আনতচক্ষে বসিয়া পড়িল।

সরোজাক্ষ বলিল,—কত সুখী হলাম তা' বলতে পারিনে। বিয়ে করবার কিছুদিন পর থেকেই কেবল একই চিন্তায় আমার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না। আমি আমার ঠিক মনের মতো করে স্ত্রী-পালনের গুরু-দায়িত্ব পালন করবো কি করে! ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছিলাম। আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি—অংশুময়ী আমার নয়, আপনার। আমার দায়িত্ব নেই। বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

খেলনা

শ্রীবিমল দত্ত

সহরের জনতা যেখানে জট্ পাকাইয়া সর্পিল গতিতে পাক্ খাইতে খাইতে দিগ্বিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতেছে—জোয়ারের জলের মত মাতাল জনতা যেখান দিয়া অজস্র তোড়ে অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে—যেখানে যন্ত্র আর যন্ত্রীর অপূর্ব্ব মেলা; বিচিত্র গতিতে চলিয়াছে নানা প্রকারের যান—সেই সহরের কেন্দ্র-স্থলে ভীড় হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া একটি বৃদ্ধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একটি বাক্সের ডালার উপর করিয়া কতকগুলি তুলার হাঁস বিক্রয় করিতে লইয়া আসে। আমি কর্ম্মান্তে গৃহে ফিরিবার সময় প্রত্যহ তাহাকে দেখি তাহার শুষ্ক দড়ির মত চেহারা, কোটর প্রবিষ্ট চোখে এবং অবসন্ন ঔদাসীন্যে ভরা মুখ

দেখিয়া দেখিয়া আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ধনীর বাড়ীর উদ্গতদন্ত দেওয়ালের কার্ণিশে সে বাক্সের ঢাকনিটি কাত করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া, দেওয়ালে ঠেশ দিয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবে!

কত লোকে দেখে হাঁসগুলিকে! কেহ দাম জিজ্ঞাসা করে, কেহ বা 'ভাল করতে পারে নি' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। ছেলে-মেয়েরা কিন্তু উহার দিকে চাহিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।—"দাও নাগো একটা ঐ হাঁস কিনে" বলিয়া বাপ কিম্বা দাদার কাছে বায়না ধরে। কিন্তু বাপ, দাদা পয়সার মূল্য বুঝে; একবার হাঁসগুলির দিকে তাকাইয়া ছেলে-মেয়েদের হিঁচ্ড়াইতে হিঁচ্ড়াইতে টানিয়া লইয়া যায়—"এঃ! পয়সা খরচ করে তুলোর পুঁটলি কিনবে! খোলামকুচি পেয়েছিস পয়সা! চ' চ', না হয় ঐ মনিহারী দোকান থেকে একটা আলুর হাঁস কিনে দেব'খন।"

বৃদ্ধ একটি বক্ষঃভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়—হাঁসগুলিকে আবার ভাল করিয়া সাজাইয়া দেয়—যাহাতে চট্ করিয়া লোকের চোখে ধরে।

এমনি করিয়া অসীম ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতায় বৃদ্ধ সমস্ত দিনে হয়ত দু' একটি হাঁস বিক্রয় করে। যা' দাম পায় তাহাতে মজুরি হয়ত পোষায় না। কিন্তু কি করিবে! যাহোক করিয়া দু'টো দানার সংস্থান তাহাকে করিতেই হইবে।

বৃদ্ধ রোজই হাঁস তৈয়ারী করিয়া আনে। কোনদিন বা একটি মাঝারি ধরনের পুষি বেড়াল, কোনদিন বা ছোট্ট একটি কুকুর-ছানা। কিন্তু বৃদ্ধের এমনই দুর্ভাগ্য যে, অধিকাংশ খরিদ্দারই তাহা হাতে উঠাইয়াই নামাইয়া রাখে—দাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে না। বাস্তবিক হাঁস বা কুকুর কিম্বা বিড়াল কোনটাই বৃদ্ধ নিপুণভাবে তৈয়ারী করিতে পারে না। পারিবেই বা কিরূপে? তাহার চোখে নেই জ্যোতি—মনে নেই উৎসাহ—হাতে নেই কর্ম্মপটুতা। জীবনের হিসাব সে এক প্রকার মিলাইয়াই রাখিয়াছে। দীর্ঘকাল জের টানিবার উৎসাহ তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। যাহোক করিয়া দিন গড়াইয়া গেলেই তাহার এখন হইল।

বৃদ্ধকে রোজই দেখি। ট্রাম, বাস, জনতার চলমান স্রোতের মাঝে সে একাই যেন নিশ্চল হইয়া আছে। খরিদ্দারের আশায় সে পাথরের মূর্ত্তির মত ধীর অধ্যবসায়ের সহিত বসিয়া থাকে। কথার তোড়ে জিনিষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে বা মূল্যের স্বল্পতা জ্ঞাপন করিতে তাহাকে কোনদিনই শুনি নাই। জিনিষের বাহ্য চটকে নয়ন ভুলাইবার মন্ত্র তাহার জানা নাই। সে ভিখারীর মত পথিকের কৃপাপ্রার্থী। এ ত' ব্যবসা নয়, ভিক্ষা!—এমনই দীনহীন তাহার হাবভাব। সে যে জানে—মনে প্রাণে জানে—যে সে পরাজিত।

বৃদ্ধ যেখানে তুলার হাঁস বিক্রয় করে সেখান হইতে কিছু দূরে একটি খোলা মাঠ পড়িয়াছিল। সেখানে একজন দৈব ঔষধ বিক্রেতা তারস্বরে বক্তৃতা করিয়া জনতা আকর্ষণ করিত। কখন বা কোন দীর্ঘ দেহ শ্মশ্রু-গুম্ফবান্ বিদেশী যাদুকর তাহার সরঞ্জামে সাজাইয়া ঢোলে কাঠি মারিত—ঢকাঢক্—ঢকাঢক্—ঢকাঢক্—! দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া যাইত। জমিবে না? এমন প্রকাশ্য স্থানে বিনা খরচে আমোদ পাওয়া যাইতেছে, ভীড় জমিবে না? একটু স্থান সংগ্রহের জন্য ঠেলাঠেলি মারামারির অন্ত থাকে না। এই দুঃখ-দাহ-জর্জ্জর সংসারে খুশীর একটু স্পর্শের জন্য কাঙাল জনতা চুম্বক শক্তিতে সেখানে জমায়েৎ হইয়া যায়। যাদুকরের ভোজবাজী দেখান চলে। কখন বা সেই মাঠে দু' একটি জামা-কাপড় ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী সতরঞ্চি বিছাইয়া জামা-কাপড়ের মেলা করিয়া ফেলে। এমনি করিয়া সেই বেওয়ারিশ মাঠের নিকট হইতে কাজ আদায় করা হয়। প্রয়োজনের অত্যাচারে মাঠটির সবুজ রং ক্রমশঃ ধূসর হইয়া যায়।

বৃদ্ধ দু' একদিন বেশী খরিদ্দারের আশায় এই মাঠটির এক ধারে বসিয়াছিল। কিন্তু এখানে তাহার ভারি নির্জ্জন ঠেকে। এই জনতার মাঝে সে হাঁফাইয়া ওঠে—এ ত' আর চলমান জনতার স্রোত নয়—এ যে আকৃষ্ট জনতার সমষ্টি। এখানে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে এই দুঃখ হয় যে, এতটুকুও চুম্বক-শক্তি তাহার নাই। এই জনতার মধ্য হইতে একটি দু'টিকে আকৃষ্ট

করিবার মত আকর্ষণী-শক্তি তাহার নাই। সে দীন চক্ষে পথিকদের চলা-ফেরা লক্ষ্য করে—চক্ষে ফুটিয়া উঠে ভিক্ষার দীনতা—কাঙালপনার অসহায় ভাব। পরদিন হইতে তাহাকে আবার পরিচিত স্থানে দাঁড়াইতে দেখা যায়।

একদিন এই মাঠে অনেক কাঠ এবং করোগেট-টিন আসিল। বিপুল উদ্যমে কাজে লাগিয়া গেল চীনা মিস্ত্রীর দল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের শ্রী ফিরিয়া গেল। অনাবশ্যক সেই সবুজটুকু গ্রাস করিয়া ছলনাময়ী দানবী নগরী সেখানে মেলিয়া ধরিল তাহার কৃত্রিম শোভা। ইলেক্‌ট্রিক ফিট্ করা কয়েকটি দোকান তৈয়ারী হইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই ভাড়া হইয়া গেল তাহার সব কটিই। কাঁচের বাসন, সাবান, এসেন্স, খেলনা, প্রভৃতি সস্তা জিনিষে দোকান কয়টি ভরিয়া উঠিল।

এই দোকান-শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় দোকান হইল ভূষণ সিংএর খেলনার দোকান দুইটী। ক্রেতা, ক্রয়েচ্ছু এবং দর্শকগণ দোকান দুইটীকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিত। একটিতে বসিত ভূষণ সিং নিজে এবং অপরটীতে তাহার পুত্র কিষণ সিং। ভূষণ সিং হাঁকিত—

"ভোলো বাছো দু'পয়সা
হাঁস্-কবুতর দু'পয়সা
হাতী-ঘোড়া দু'পয়সা
হরেক রকম দু'পয়সা।"....

কিষণ সিং শুরু করে—

"লেবে না লেবে দেখে যাও
গেলাস-ফুলদান দেখে যাও
খেলনা-পুতুল দেখে যাও
দু' দু' আনা দেখে যাও
শস্তাওয়ালা দেখে যাও।"...

একধারে যন্ত্রে প্রস্তুত এমন সুদৃশ্য খেলনা অথচ এত সস্তা—আর একদিকে

বৃদ্ধের অপটু হস্তের তৈয়ারী সেই অসুন্দর তুলার হাঁস—বড়ই বেমানান। ক্রেতা জুটে না বৃদ্ধের। রাস্তার ধুলো উড়িয়া শাদা হাঁসগুলিকে ক্রমশঃ ময়লা করিয়া তুলে। লোকের অবজ্ঞার ধুলি তাহাদের গায়ে কালিমা লেপিয়া আরও কুৎসিত করিয়া দিয়া যায়। সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই মহানগরীর পথে পথে এমনি কতই হইতেছে—কে তাহাদের সংখ্যা করে!

বৃদ্ধ প্রত্যহ আসে—কোন কোন দিন বা দু'একটি বিক্রয় হয়—অধিকাংশ দিনই কিছু হয় না। অথচ পাশেই ভূষণ সিং আর কিষণ সিংএর দোকান পুরাদমে চলে—তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না। বৃদ্ধ তবু রোজই আসে। আপনার মনে কত অলীক স্বপ্নের সুউচ্চ প্রাসাদ গড়িয়া তুলে। সে অনেক দিনের কথা—ঐ মাঠ তখন ছিল না। ঐখানে ছিল শীলেদের ভাঙা বাড়ীটা। বৃদ্ধ প্রতিদিন হাঁস বিক্রয় করিতে আসিত। একদিন সবে সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়াছে এমন সময় একটি সুদৃশ্য মোটর গাড়ী আসিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে থামিয়া গেল। ধনী ভদ্রলোক তাঁহার দুলালী কন্যাকে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। মেয়েটি হাঁস কিনিবার জন্য বায়না ধরায় বাবু গাড়ী থামাইয়া নামিয়া আসিয়াছেন। সেদিনকার তৈয়ারী বারটি হাঁসই ঐ ভদ্রলোক কিনিয়া লইয়া গেলেন। মেয়েটির কি আনন্দ! এখনো চোখ বুজিলে বৃদ্ধ সেই হাসিমাখা কচি মুখখানা দেখিতে পায়। এত জাপানী খেলনা তখন বাজারে আমদানি হয় নাই। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আধ-নিমীলিত চোখে বৃদ্ধ ভাবে—ভাবে তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা।

বৃদ্ধ এইরূপ স্বপ্নে বিভোর, এমন সময় একটা উচ্ছ্বসিত শিশু-কণ্ঠের কাকলিতে তাহার চমক ভাঙে।

—"আরে, কিসিমাফিক চিড়িয়া দেখ্, লখিয়া।"

—"ইত কবুতর, দুলিয়া।"

—"কবুতর নেইরে, হাঁস আছে—নেই বাবু?" বলিয়া বড় মেয়েটি সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকায়।

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া জানায়,—"হ্যাঁ, হাঁসই আছে।" বলিয়া অভ্যাসমত হাঁসগুলিকে আবার গুছাইয়া সাজাইয়া রাখে।

বড়টি আবার জিজ্ঞাসা করে,—"কেতনা-মে মিলি বাবু?"

উদাসীন অবসাদ-ভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে,—"দু' দু' আনা।"

দর শুনিয়া মেয়ে দুইটীর মুখ নিমেষে ম্লান হইয়া যায়। উভয়েই বুঝিতে পারে যে দাম অনেক বেশী, তাহাদের পক্ষে বড় বেশী।

ছোট মেয়েটি বড় মেয়েটির কাছে বায়না ধরে—"দে না লখিয়া একঠো কিন্‌কে।"

বড়টি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে,—"পৈসা নেইরে বহিন্।"

দুলিয়া ছাড়িবার পাত্রী নয়। বলে,—"তোরি সাথ ত পৈসা আছে।"

লখিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে। বৃদ্ধকে বলে,—"দো পয়সা মে, দেগা বাবু?"

দুলিয়াও বলে,—"দে দেও বাবু, হাম্‌লোক গরীব আদমি।"

বৃদ্ধ তাহাদের ছল্‌ছল্ কাতর চোখের দিকে চাহিয়া কেমন বিমনা হইয়া যায়। দুইটী হাঁস বাক্সের ডালার উপর হইতে তুলিয়া তাহাদের হাতে ধরিয়া দেয়। মেয়ে দুইটির কি আনন্দ! একবার উল্টাইয়া দেখে, একবার পাল্টাইয়া দেখে। দেখা যেন তাহাদের ফুরাইতে চাহে না। বৃদ্ধ ইত্যবসরে বাকী হাঁস কয়টি বাক্সে পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

লখিয়া আঁচলের খুঁট হইতে পয়সা দুইটি বাহির করিয়া দিতে গিয়া দেখে, বৃদ্ধ তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া, দু'টি বোন—"পৈসা, বাবু পৈসা" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার নিকট ছুটিয়া যায়, কিন্তু পয়সা লইবার কোন উৎসাহই বৃদ্ধের ছিল না। পয়সার চেয়ে অনেক দামী জিনিষ সেদিন সে পাইয়াছিল।

মেয়ে দুইটির চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বৃদ্ধ কহিল,—"পয়সা নিয়ে তোরা গোলাপী রেউড়ি খাস"। মেয়ে দুইটী একেবারে অবাক হইয়া মুখ

চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকে। বৃদ্ধও টলিতে টলিতে জনতার মধ্যে মিশিয়া যায়। হয়ত এঁদো স্যাঁত-সেঁতে কোন গলির ভিজা অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

পরদিন সহরের রাস্তায় সেই একই দৃশ্যের পুনরাবর্ত্তন—যানবাহনের জটলা, জনতার জট, ভূষণ সিংএর দোকানে খরিদ্দারের ভিড়, কিষণ সিংএর সুর করিয়া বলা ছড়া—সবই আছে। কিন্তু বৃদ্ধ আসে নাই—তাহার সেই শাদা অসুন্দর হাঁসগুলিও লোককে মুগ্ধ করিবার নিষ্ফল প্রতিক্ষায় সাজানো নাই। বিরাট নগরী তাহার সৌন্দর্য্যের মায়াপুরী হইতে যাহাকিছু বেমানান, যাহা কিছু অসুন্দর তাহা নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

যেখানটিতে বৃদ্ধ হাঁস বিক্রয় করিত সেখানে দেয়ালের গায়ে হুকে লাগান একটা গ্যাস, তাহারই পাশে "বিনামূল্যে স্বপ্নাদ্য মাদুলি" লেখা একটা প্রকাণ্ড জাজ্বল্যমান দেওয়াল পঞ্জী দোল খাইতেছে। একজন লোক বক্তৃতা করিতেছে আর কয়েকজন পথিক শুনিতেছে তাই নিবিষ্ট মনে।

ঠেলাগাড়ী

শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি রোদ তখনও ভাল রকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্ কিচ্ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের

বাসি কলার বড়া যা' আমাদের জন্যে রান্নাঘরের জলন্ত শিকায় বড় জাম বাটীতে টাঙানো আছে—তা' কোন অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্ব্বে তা' চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলা-গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিণ্‌রিণে গলার ডাক শোনা গেল—টুনি-ই-ই দা, আ-আ—ও টুনি ...

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখি হয়ে কি একটা হাতে উচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাগ-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই সব সময় ঘড়-ঘড় ঘড়-ঘড় শব্দ। যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে—বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়-ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ ওর পরকালটা যে ঝর্‌ঝরে হয়ে গেল—যা' এখন যা', টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়-ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা', ওসব নিয়ে যা'....

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পেছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূরে থেকে দূরে অস্পষ্ট হয়ে যেত, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কী দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে গেল—ও টুনি-দা?....আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিক নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্‌ ক'রে খিড়কী দোরটা খুলে বার হ'য়ে এলুম্। সকালের পদ্মের মত নির্ম্মল, প্রফুল্ল, তরুণ-নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবিনে টুনি-দা?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না?

নরু চোখের ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে,—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই....

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনে-প্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনি-দা—আমি চাল্‌তে তলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়্‌বি তো টুনি-দা?

দু'জনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুল তলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোনো ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসি মুখে বললে, —আয় পটু-দা, নিতাই-দা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়্‌....গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়্‌ল সকলেই। পটু বললে,—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে,—থাম তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা' কি হবে?

নরু বললে,—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটু-দা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে....বললে, রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ান বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দু'জনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি। সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়। বলে,—সে নৌকোর মাঝির সর্দ্দার হবে, রেল-গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইষ্টিমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক। বলতাম,—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হব। মহকুমার হাকিম হব।....

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙা-মুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যে-দিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—

ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল এখন তুমি…। খোকা বলে,—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনি দা—কোথাও তো যাইনি মা? সত্যি…

কি জানি কেন ওকে বড় ভালবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে-চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্ততঃ ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক এক দিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে,—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বললুম, চড়্ চড়্ গাড়ীতে আয় তোকে ঠেলে গয়লা-পাড়া ঘুরিয়ে আনি….তা' কিছুতে চড়্লো না। বললে,—মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়্বি টুনি-দা?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা?

আমাদের পাড়ায় কেউ চড়্লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা' দুষ্টু। আসবি টুনি-দা?

খোকার চোখের মিনতি ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হত না কোনো মতেই। আমি চড়্তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত। ….সূর্য্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচিমুখ রাঙিয়ে দিতেন….ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলি ধরণের ছিল ব'লে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না….সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্ব্বিবাদে জারী করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারী গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলা-গাড়ীর ঘড়-ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে,—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলা-গাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে,—যাত্রা কবে বসবে রে টুনি-দা?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে,—চড়্‌বি পটু-দা? পটু ঘাড় নেড়ে বললে,—চড়্‌ব, টানবে কে?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে,—কেন আমি?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

পটু বললে,—দুর, তুই বুঝি আমায় টানতে পারিস? টান দিকি কেমন।....

—হয় না আর আমাকে....

—বসো না? টানতে কেমন পারিনে?

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বীরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে,—আমায় একটু এইবার টান?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন দাবী আছে? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম আর আমার পালায় বুঝি কেউ....

আমার ইচ্ছে হল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুনই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইট নিয়ে গাড়ীতে ছুড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্ ক'রে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবটা এই রকম যে, তুইও টুনি-দা এর মধ্যে ?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়ে-চেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়।....পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলা থোলা বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব-ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেলতুম তো বেশ হত, কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিং-কাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন-দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে,—টুনি, তোরা দেশে এলি ?....আমি কোনো কথা বলবার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে ? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে!....বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, থাবি নুন দিয়ে ? ওই পেকে পেকে থাকে কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে।

শরতের অপরাহ্ণ। নির্ম্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখী উড়ে চলেছে।....কার্ণিস্ ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক....উঠানের ছায়া-স্নিগ্ধ বাতাস শুকনো ফুলের গন্ধে ভরপুর।....

খোকার সেই ঠেলা-গাড়ীখানা দেখলুম কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্য্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।...

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সে ছোট্ট খোকাটি ঠেলা-গাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।...নির্জ্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়....আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে নিয়ে আসছে....নারিকেলতলা বেয়ে...পুটুদের বড় দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্ত্তি বাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।....

শ্যামরায়ের মৃত্যু

নরেন্দ্র ঘোষ

শ্যামরায়ের মন্দির। মন্দিরের গা বেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট অশ্বত্থের চারা বেরিয়ে এসেছে, চুন-সুরকি খসে পড়ে পড়ে মন্দিরের প্রাচীনত্ব তথা আভিজাত্যকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলছে। খুব বড় নয়, মাঝারি আকারের মন্দিরটী; আকৃতির চেয়ে মাহাত্ম্যই বেশি তার।

বিগ্রহ শ্যামরায়ের। কিশোর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন—পরিধানে রাখাল বেশ। মন্দিরের ভিতরকার অবস্থাও তার বাহ্যিক আকৃতির মতই। শ্যামরায়ের সিংহাসনের পঞ্জরে উঁইপোকারা দলে দলে বাসা বেঁধেছে, তার পোষাক-পরিচ্ছদ আর আসবাব্‌পত্রে মলিনত্বের ছায়া।

কিন্তু মাহাত্ম্য আছে শ্যামরায়ের। প্রায় একশ বছর আগে বর্তমান পূজারীর প্রপিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য একদিন স্বপ্নঘোরে দেখেছিলেন ঐ শ্যামরায়কে—দেখেছিলেন যে শ্যামরায় যেন তাকে বলছেন, "বড় কষ্টে আছি বাসুদেব। তোদের রাঙা বিলের নাম সুন্দর হলেও তা' আমার থাকবার জায়গা নয়; জল, কাদা, সাপ-খোপের মধ্যে কি করে থাকি বল্ তো? আমায় শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর উদ্ধার কর।"

শ্যামরায়কে পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বাসুদেব ভট্টাচার্য রাতারাতি দেশ-বিদেশে সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করলেন। সে খ্যাতির সংবাদ ঐ এলাকার মানে লক্ষ্মীপুরের জমিদার শিবেশ্বর রায়ের কানে পৌঁছাল। বাসুদেব ভট্টাচার্যকে নিষ্কর ভূমিদান করে শ্যামরায়ের জন্য তিনি একটি মন্দির তৈরী করে দিলেন। যে মন্দিরের বলিরেখা ভেদ করে আজ হৃষ্ট-পুষ্ট অশ্বত্থের চারা বেরিয়ে

এসেছে, ওইটিই সেই মন্দির। দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গেল শ্যামরায়ের কথা। এল অগণন ভক্তের দল। এল অসংখ্য অনুগ্রহ-লোভীর দল। কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারল, কত মানুষের মোকর্দমায় জয়লাভ হল, কত নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচল শ্যামরায়ের কৃপায়। কৃতজ্ঞ ভক্তের দল পরিবর্তে নানা অর্ঘ্য দিল—ঘি, দুধ, ফল, মিষ্টি, দক্ষিণা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুমুল কীর্তনের রোল উঠত শ্যামরায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে—চোখের জল ফেলে ভক্তেরা লাফাত না-তো ঝিম মেরে বসে থাকত। কষ্টিপাথরের শ্যামরায় বহু ভক্তের কৃতজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসতেন। কিন্তু সেদিন আর নেই। একশ বছর আগেকার ইতিহাস এখন ঝাপ্সা হয়ে এসেছে।

মড়ক এসেছিল। শ্যামরায় বর্তমান থাকতেও মৃত্যু-বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েছিল তাঁর গ্রাম্য ভক্তেরা। বেশির ভাগই মারা গেল, যারা বাঁচল তারা শেষে গ্রাম ছেড়ে পালাল। নির্জন গ্রাম্য মন্দিরে শ্যামরায় একা পড়ে রইলেন আর রইলেন তাঁর সেবক বলরাম ভট্টাচার্য—বাসুদেবের ছেলে বর্তমান পূজারী জনার্দনের পিতা।

তখন থেকেই একটু ভাঁটা পড়ল ভক্ত-স্রোতে। তারপর একটা ব্যাপার ঘটল। দশ মাইল দূরে যে মহানগরীটা ছিল তা' ক্রমশ রাহুর মত গ্রাস করে চলল অন্যান্য গ্রাম এবং অবশেষে লক্ষ্মীপুরের প্রান্তে এসে থামল।

তারপরে ইতিহাসের ঘূর্ণ্যমান চাকার সঙ্গে এল নূতন নূতন লোক, গড়ে উঠল বড় বড় অট্টালিকা, নির্মিত হল বড় বড় ফ্যাক্টরী আর জুট-মিল। দামী অর্ঘ্যের স্তূপ কমে এল বটে, কিন্তু নূতন ভক্ত জুটল শ্যামরায়ের। কুলি, মজুর, চোর, দালাল। কিছু দেয় না, শ্যামরায়ের কাছে তারা শুধু নিরন্তর চায়। শ্যামরায়ের চোখের তারা স্তিমিত হয়ে এল। গায়ে জমল ধুলোর আস্তরণ, বেণারসী চেলীর গায়ে পচন ধরল, ভোগ-রোগের দৈব আভিজাত্য কমে এল। সিংহাসনের গা টিপলে এখন মচ মচ করে ভেঙ্গে যায়, মন্দিরের গা থেকে ঝপ

ঝপ্ করে চুন-সুরকী খসে পড়ে, প্রায়ান্ধকার মন্দিরাভ্যন্তরে সংস্কারহীনতার চাপা ও ভ্যাপসা গন্ধ অনবরত থম থম করে।

কিন্তু ভূমিকা থাক।

মন্দির থেকে দশ গজ দূরবর্তী যে পাট-কলটার চিম্‌নী বেয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার মালিক নাগরমলজী একদিন তার অফিস-ঘরে দ্রুত ও উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছিল।

রাহুর মত এই মহানগরীটা যখন দূরে ছিল—তখনকার কথা—প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথাই বলছি। নাগরমলের বাবা সাগরমল আর তার বাবা সুরযমলের কাহিনী। সে কাহিনী সবাই জানে। তিল থেকে তাল আর প্রবালকীট থেকে প্রবাল-দ্বীপ তৈরী করার কাহিনী। ধান-চাল আর পাটের মহাজন থেকে অজস্র জোত, অসংখ্য অট্টালিকা ও বহু জুট-মিলের মালিক হওয়ার অতি দীর্ঘ কাহিনী। জটিল মস্তিষ্কের জট-পাকানো বুদ্ধি, সর্বগ্রাসী লোভের বহুদূর প্রসারিত বাহু আর জালিয়াতির কাহিনীকে সাবিস্তারে বলে ইতিহাসের নিরস ও শুকনো স্বাদ পেয়ে লাভ কি? তারচেয়ে কাহিনীতেই ফিরে আসি।

মিলের ম্যানেজার বাঙালী বাবু। অবিকল সাহেবদের মত মেজাজ তার, জামাটে চেহারাতেও সাহেবী চেকনাই। নাম, মিঃ বাসু।

বাসু বলল, "যুগ বদলেছে নাগরমলজী, মজুরদের তেজ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে"—

নাগরমল হাসল, "যুগ বদ্‌লেছে—তা' বটে—"

বাসু বলল, "মিলের মজুররা আজকাল এক জোট হয়েছে—দিন-রাত দল পাকিয়ে ফুস্‌ফাস্ করে"—

"হুঁ"—নাগরমল মাথা নাড়ল, পাগ্‌ড়ীটাকে খুলে টেবিলের উপর রাখল, তারপরে পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকের ঘাম মুছে বলল, "মি বাসু"—

"বলুন"—

"যুগ বদলায় তা' মানি, কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে কি চলবে ?"

"আজ্ঞে না"—

"মজুর, কুলি, ছোটলোকের দল আজ মাথায় চড়তে চাইলেই কি মাথাটাকে নীচু করে দিতে হবে ?"

"Certainly not"—

"তবে হুঁসিয়ার হোন, খোঁজ নিন কে এদের দলের সর্দার"—

"তা আমি জানি"—

"কে সে ? কি নাম তার ?"

"ত্রিলোচন দাস।"

"সেই কানা লোকটা, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নাগরমল চুপ করে ভাবল খানিকক্ষণ, তার ধবধবে সাদা ললাটদেশে কাল সাপের মত মোটা মোটা কতকগুলো দুর্বোধ্য রেখা আত্মপ্রকাশ করল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নাগরমল।

ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে ফ্যান ঘুরছে, টেবিলের উপরকার কাগজগুলো সশব্দে নড়ছে, দেওয়ালের বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, মিঃ বাসুর টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া ক্ষীণদেহ সরীসৃপের মত ঘরের শূন্যতায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

"মিঃ বাসু"—

"ইয়েস প্লীজ্" ?

"খবর নিন্, আরও ভালভাবে খবর নিন্। খবর নিন্ ত্রিলোচনের দুর্বলতা কোথায়—কোথায় আঘাত করলে এক মুহূর্তে কামিয়াব হওয়া যাবে।"

আবার টাক মুছল নাগরমল, ললাটের কাল সাপগুলো হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেল তার, মুখে দেখা দিল প্রশান্ত হাসি—"সে বলল, ঘাবড়াবেন না বাসুবাবু, হিম্মৎ চাই—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বসন্ত হয়, মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ঘোষণা। শ্যামরায়ের ওখানে অর্ঘ্য পড়ে।

কলেরা হয়, তরল, বিবর্ণ ভেদবমির মাঝে অসহায়ভাবে কাৎরায় ওরা। শ্যামরায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। শ্যামরায়, রক্ষা কর।

দারিদ্র্য, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ। শ্যামরায় বাঁচাও, মঙ্গল কর, রক্ষা কর।

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামরায়ের চরণামৃত বিতরণ করেন, তুলসী চন্দন আর পবিত্র রজ দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বলেন, "শ্যামরায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, শ্যামরায় আমার জাগ্রত দেবতা।"

ত্রিলোচন—কানা ত্রিলোচন। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে বসে গেছে, মুখমণ্ডলে আহত শ্বাপদের হিংসা বাঁ চোখের তারাটাকে বড় বড় করে উত্তেজিত কণ্ঠে সে সবাইকে বলে, "শ্যামরায়, শ্যামরায় বাঁচাবে তোমাদের, ওরে বোকারা, আমার কথা শোন্—বেচারী ঠাকুর-দেবতারা মানুষের কিছু করতে পারে না—আমাদের দুঃখ দূর করার ভার আমাদেরই হাতে—"

সব কাজে সবাই মাথা নাচু করে যে ত্রিলোচনের কাছে, তার মুখে একথা শুনে লোকেরা রাগ করতে পারে না, কেবল হাসে। পাগল, ত্রিলোচনটা পাগল, দশজনের কথা ভেবে ভেবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দশজনের কথাই ভাবে ত্রিলোচন। দিন-রাত ভাবে।

ম্যানেজার বাসু সেদিন মঙ্গলকে ধরে মারল।

ত্রিলোচন গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, "খবরদার ম্যানেজার বাবু—ওসব চলবে না।"

"হোয়াট ?"

বাসু গর্জন করে এগিয়ে এল। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ত্রিলোচনের পিছনে আরও একশজন এসে দাঁড়িয়েছে। একচক্ষু ত্রিলোচন যেন একটা সেনাপতির চেয়ে কম নয়। তার পশ্চাদ্বর্তী বাকী সবাই যেন এক একজন সৈনিক। তাদের চোখে শাণিত ইঙ্গিত, অনর্থের সংকেত।

বাসু পিছিয়ে গেল।

যখন খাটুনীর ঘণ্টা বাড়ল, তখন তার অনুপাতে মজুরী বাড়ল না।

মজুরেরা তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। একটা চোখ না থাকলেই বা কি? একটা চোখ দিয়েই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায় ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন বলল, "শালারা ভেবেছে যে তোদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়"—

"তাহলে কি হবে?"

"কি হবে, তা' কি জানিস্ না হতভাগারা? কাজ বন্ধ কর—ধর্মঘট"—

ত্রিলোচনের একটা কথায় যন্ত্রের গান বন্ধ হয়ে গেল।

সেই ত্রিলোচন যদি ভগবানকে না মানে, যদি সে শ্যামরায়ের মত জাগ্রত দেবতাকে উপহাস করে, তাহলে কি ভাব্‌বে লোকেরা? পাগল, পাগল আমাদের ত্রিলোচন দাস।

খবর এল।

আর একটু হলে নাগরমল লাফিয়ে উঠত, কিন্তু সে নিজেকে সাম্‌লে নিল। বলল, "কাজ হয়েছে বাসুবাবু—কেল্লা মেরে দিয়েছ।"

বাসু বুঝতে পারল না, ডান চোখের ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, "মানে?"

"মানে আপনি যান আর জিতেনকে পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা। কিন্তু আমি বলছিলাম কি জানেন?"

"কি?"

"ত্রিলোচনকে বরখাস্ত করলে কেমন হয়?"

"আপনি পাগল মিঃ বাসু। আরও ধর্মঘট চান? না না, যা বললাম তাই করুন গে।"

জিতেন এল। সাহেবদের পোষা বুলডগের মত তাকে দেখতে। খায় দায়, বসে থাকে, দরকার হলে মনিবের ইঙ্গিতে শত্রুর টুঁটি লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে।

জিতেন অনেকক্ষণ ধরে নাগরমলের কাছে বসে রইল। অনেক কথা শুনল। কথা শেষ হলে হেসে বলল, "শেঠজী—নির্ভাবনায় থাকুন।"

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন, "শোন—শোন আমার জাগ্রত শ্যামের কীর্তি"—

পিতা বলরাম ভট্টাচার্যের চমৎকার কাহিনী। প্রতিদিন নৈশভোগের পরে শ্যামরায়কে শোয়াতেন তিনি—রীতিমত তাকিয়া, বালিশ, লেপ, তোষকের মাঝে। তখন শীতকাল—একদিন একটা ভুল করে বসলেন বলরাম। পারিবারিক কারণে মনটা বিক্ষুব্ধ ছিল বলে তাড়াহুড়ো করে শ্যামরায়কে শুইয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন। খানিক বাদে শুয়ে পড়লেন, ঘুমোলেন। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ যেন লাঠির ঘা খেলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন যে, শ্যামরায় যেন তাঁর গর্ত-খেদানো লাঠি দিয়ে তাঁকে মারছেন আর বলছেন, "লেপটা গায়ে না দিয়েই শুইয়ে এসেছিস তুই, আমার খাতির করতে বুঝি তোর ভাল লাগে না? অত সহজে নিষ্কৃতি পাবি না—খা লাঠির ঘা—কেমন, শিক্ষা হয়েছে? উত্তেজিত, ক্রোধান্ধ শ্যামরায়কে তখন যেন আর চেনাই যায় না।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বলরাম। সবিস্ময়ে দেখলেন যে, দেহের উপর লাঠির ঘায়ে কালচে কালচে দাগ পড়েছে—স্বপ্ন মিথ্যা নয়। তিনি মন্দিরের দিকে দৌড়ে গেলেন। সত্যি শ্যামরায়ের অভিযোগ মিথ্যা নয়।

কাহিনী শেষ হল। বিমুগ্ধ মজুরেরা নির্বাক হয়ে বসে রইল। এমন জাগ্রত দেবতা এই শ্যামরায়।

ত্রিলোচন হেসে বলল, "যত সব আঁকাখুঁরি গল্প বলছো ঠাকুর—মানুষগুলোর মাথা তো খেয়েছ আবার তাদের হাড়গুলোকেও চিবোচ্ছ মাইরি"—

জিতেন বলে উঠল, "ছিঃ ছি, এমন পাপ কথা বলো না"—

অন্যান্য মজুরেরাও আজ একটু ক্ষুণ্ণ হল।

জিতেন বলে চলল, "ঠাকুর দেবতা, ওঁদের নিয়ে অমন কথা বলতে নেই, আর অমন কথা শোনাও মহাপাপ"—ললাটে হাত তুলে সে শ্যামরায়কে প্রণাম জানাল।

জনার্দন বললেন, "হ্যাঁ সত্যি। ত্রিলোচন, অতটা নাস্তিক হওয়া ভাল না।"

অন্যান্য মজুরেরাও শ্যামরায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

ত্রিলোচন উঠে দাঁড়াল। একটা বিড়ি ধরিয়ে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "তোরা যত সব জানোয়ারের দল—তোদের বোঝাবে কোন্ শালা? যাঃ, মরগে—চুলোয় যা হতভাগারা"—

সে চলে গেল।

জিতেন বলল "এটা ভাল না মাইরি, সত্যি বলছি—এটা বাড়াবাড়ি। তুই সবার সর্দার কিন্তু তাই বলে ঠাকুর-দেবতাকে গেরাহ্যি করবি না—তা' কি হয়?"

জনার্দন সায় দিলেন, "ঠিক—ঠিক বলেছ"—

মজুরেরা স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যি, ত্রিলোচন বড় অন্যায় কথা বলে, ওর এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। হলই বা সর্দার, সব কিছুতে সর্দারী করলে কি সহ্য করা যায়?

ব্যাপারটা একদিন আরও বেড়ে গেল।

কলেরা—বস্তিতে কলেরা দেখা দিয়েছে। আর্ত কোলাহলটা ক্রমশ এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে সংক্রামিত হচ্ছে তখন।

শ্যামরায়ের ওখানে গিয়ে সবাই ভীড় করল। "ঠাকুর—চন্নামেরত দাও, বাঁচাও—"

সহ্য হয় না ত্রিলোচনের।

"চন্নামেরত! চন্নামেরততে কলেরা সারবে? ওরে পাগলেরা—বরং চল ডাক্তার ডাকি গে—"

জনার্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রাচীন পূজারী-বংশের বংশধরের মুখে ক্রোধ ঘনিয়ে এল, তাঁর উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ একটা রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গেল।

ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "সাবধান, সাবধান ত্রিলোচন—নাস্তিকতারও সীমা আছে"—

মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ মজুরদের চোখেও বিরক্তি ঘনিয়ে এল। তার সঙ্গে ক্রোধ।

জিতেন বলল, "তোমার বাড়াবাড়ি কিন্তু আমরা আর সইব না ত্রিলোচন"—

এক চোখ পাকিয়ে ত্রিলোচন হেসে বলল, "কি করবি রে? মারবি? মার—কিন্তু যা সত্যি তা' বলতে আমি ডরাইনারে শালা। আবার বলছি শোন, বুদ্ধির মোড় ফেরা—দেবতা-ফেবতাতে কিছু হবে না।"

জনার্দন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, উত্তেজনার আতিশয্যে তাঁর দেহ থেকে উত্তরীয়টা খসে পড়ল, আগুনের মত টকটকে রঙের ঋজু দেহটাকে কঠিন করে তুলে তিনি বললেন, "শ্যামরায়, আমার জাগ্রত ঠাকুর শ্যামরায়কে তুই বিশ্বাস করিস না?"

ত্রিলোচনও যেন গরম হয়ে উঠেছে, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে, ভেংচি কেটে সে বলল, "জাগ্রত না কচু, পাথরকে তেল-চন্দন আর খাবার দিলেই জাগ্রত হয়ে গেল আর কি।"

"খবরদার"—জিতেন লাফিয়ে এগিয়ে এল।

হঠাৎ যেন বীভৎস হয়ে উঠল ত্রিলোচন, "তোমাদের জন্যই তো দেশটা উচ্ছন্নে গেল ঠাকুর—কি আফিংই যে খাইয়েছ এই জানোয়ারগুলোকে, উঃ"—

"খবরদার"—অনুগ্রহ প্রার্থী ভক্ত মজুরেরাও চেঁচিয়ে উঠল।

"তবেরে শালা"—আচম্‌কা জিতেন এবং আরও দু'তিনজন এসে ত্রিলোচনের উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে আর আক্রমণকারীরা অজস্র কিল-চড় বর্ষণ করে চলল তার উপর।

জনার্দন বললে, "থাম, থাম।" মজুরদের ক্ষিপ্ততা দেখে হঠাৎ তাঁর ভয় হল, ত্রিলোচনের উপর একটু সহানুভূতির উদ্রেক হল।

শেষ পর্যন্ত থামল বটে ওরা, কিন্তু তখন ত্রিলোচনের দু'কষ বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলে ও চোখের তারাতে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল, আততায়ী বন্ধুদের দিকে দৃষ্টিপাত করে

মৃদুকণ্ঠে সে হেসে বলল, "শেষ পর্যন্ত মারলি আমাকে, এ্যাঁ? আমায় মারলি?"

কেউ জবাব দিল না।

টলতে টলতে চলে গেল ত্রিলোচন। আড়ালে গেল সে। যেন পরম একটা লজ্জার হাত থেকে সে আত্মরক্ষা করতে চায়, যেন একটা আহত পশুর মত একা একা সে নিজের ক্ষতকে লেহন করতে চায়। হঠাৎ মুষড়ে পড়ল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল ত্রিলোচন—আকাশের বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ তাকে অসাড় করে ফেলেছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা থামে না, মজুরদের শক্তি কমে না। ত্রিলোচন সরে গেছে, তার প্রতাপের ফণা আজকাল আর নেই, তাকে আর আজকাল কেউ আমল দেয় না। তবু নাগরমলের প্রাণে স্বস্তি নেই—মজুরেরা দমে নাই।

কিন্তু নেই?

"বাসুবাবু"—

"ইয়েস প্লীজ্?"

"আরো ব্যাপার আছে—খবর লিন্—খবর লিন্—দেখুন, এখন ওদের কে উস্কানি দিচ্ছে।"

তর্জনীর আঘাতে টার্কিশ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে মিঃ বাসু বলল, "আচ্ছা।"

নাগরমল—কোটি কোটি টাকার মালিক নাগরমল। কুবেরের মতই যার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আর ভুঁড়ি। সেই নাগরমলের বিরুদ্ধে কে উস্কাচ্ছে মজুরদের? ত্রিলোচনের শূন্য স্থান কে পূরণ করল?

নাগরমল অতিরিক্ত ভাতা দিচ্ছে না, কাজে 'নাগা' হলে মাইনে কাটে সে। তার এই জুলুমের বিরুদ্ধে মজুরেরা রুখে দাঁড়াল। কি করে সম্ভব হল তা'? আজ তো ত্রিলোচন নেই, সে আজকাল আহত পশুর মত শুধু আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আছেন জনার্দন ভট্টাচার্য। জাগ্রত শ্যামরায়ের একনিষ্ঠ পূজারী—যাঁর আগুনের মত টকটকে দেহবর্ণে দেবতার জ্যোতিঃশিখা, মাথার কেশে যাঁর অনেক জ্ঞানের শুভ্রতা।

"ঠাকুর—বড় অত্যাচার হচ্ছে"—

"কি অত্যাচার? কার?"

"মালিকের।"

"কি হল?" জনার্দন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মজুরেরা সব নিবেদন করল।

জনার্দন প্রথমে শ্যামরায়ের দিকে তাকালেন, তারপরে তাকালেন ভক্তদের দিকে। বললেন, "এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও, লড়াই কর তোমরা—শ্যামরায় তোমাদের সহায় হবেন।"

নব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল মজুরেরা, তাদের চোখগুলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু আড়ালে ত্রিলোচন বিকৃত হাসি হাসল। পণ্ডিতও আজ তার পথ ধরেছে, কিন্তু শ্যামরায়ের দোহাই কেন? কেন, কেন ঐ পাথরটার দোহাই? পাথর—হ্যাঁ, পাথরই তো। তার চোখ দিয়ে এবার আগুন ঠিকরে বেরোয়। মনে পড়ে নিজের জীবনের কথা। স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আশা—সব ছিল ত্রিলোচনের। একচক্ষু ত্রিলোচনের দু'টো চোখই ছিল। আর—আর সেও এককালে পাথরে দেবতাকে খুঁজত। কিন্তু দেবতাকে ডেকেও যখন স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, সংসার হাওয়ায় মিলাল, আশা শুধু ছাই হল, দু' চোখের একটা গলে গেল, তখন থেকেই ত্রিলোচনের জ্ঞান হল, এক চোখেই সে পূর্ণ দৃষ্টি পেল। ভুল ভেবেছিল সে, এত দিন মিথ্যেই সে বাতাসে প্রার্থনা ভাসিয়েছে, মিথ্যেই সে লবণাক্ত অশ্রুরাশি বর্ষণ করেছে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুরাদৃষ্ট—পাথরের মূর্তি কোনটাতেই কাজে লাগে না। পাথর পাথরই, আর কিছু নয়। অতএব কেন ঐ পাথরটার দোহাই?

ত্রিলোচন না বুঝলেও নাগরমল বুঝল সেকথা। বুঝল যে নেতৃত্ব নয়,

ব্যক্তিত্ব নয়—এখন একটা পাথরের মূর্তিই ওদের উস্‌কাচ্ছে। হঠাৎ বুদ্ধির জগতে বিদ্যুতের মত একটা কথা ঝল্‌সে উঠল।

"বাসুবাবু।"

"বলুন।"

"শহরের সেরা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন।"

"কেন?"

"কাজ আছে।"

"কিন্তু শেঠজী—একটা কথা আছে। মজুরেরা যে আবার বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে—স্ট্রাইক করবে বলে শাসাচ্ছে"—

"কোনও ভাবনা নেই। আপনি ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন আর চারদিকে রাষ্ট্র করে দিন যে, ঐ শ্যামরায়ের মন্দিরের কাছে বিরাট একটা মন্দির গড়ব আমি।"

"মন্দির! মানে টেম্পল্‌?" বাসুর গলায় টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া যেন আটকে গেল।

"হ্যাঁ, মন্দির। কেন, আপনি কি ঠাকুর-দেবতা মানেন না?"

"নিশ্চয়ই, Sure মানি বই কি।"

"তবে যান—"

সবাই শুনল সে কথা। কোটি কোটি টাকার পাহাড়ের উপর যে নাগরমল বসে আছে, সে যদি আজ চার লাখ টাকা দিয়ে একটা মন্দির গড়ে তোলে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু তবু আশ্চর্য হয় মজুরেরা। নাগরমল লোকটার তো ভক্তি আছে! কোটি কোটি টাকা থাকলেই বা দেবতার জন্য লাখ লাখ টাকা ক'জন খরচ করে? এটা কম কথা নয়। শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হয়ে যায় মজুরেরা।

কিন্তু কোন্‌ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবে নাগরমল? কেউ তা' জানে না। শুধু নাগরমল জানে সে কথা।

সন্ধ্যার পরে জনার্দন এসে নাগরমলের কাছে হাজির হলেন। নাগরমল তাঁর পদধূলি মাথায় নিল, বিনয়াবতার হয়ে বলল, "বসুন পণ্ডিতজী—"

জনার্দন প্রশ্ন করলেন, "কি জন্যে ডেকেছেন শেঠজী ?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে নাগরমল বলল, "খোলাখুলি বলব পণ্ডিতজী ?"

"বলুন।"

"আমি মন্দির করছি, জানেন ?"

"শুনেছি—খুব সাধু সঙ্কল্প আপনার।"

"আমি ঐ মন্দিরে আপনার শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"

"পাগল!" জনার্দন সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই জনার্দনের। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ঐশ্বর্য—সব কিছুই আজ ঐ শ্যামরায়। একের পর একটা করে পার্থিব সম্বন্ধ যতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই জনার্দন বুঝতে পেরেছেন যে, এই বিরাট বিশ্ব-জগতে একমাত্র শ্যামরায় ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। সেই শ্যামরায়কে তিনি অন্যের হাতে সঁপে দেবেন! পাগল!

নাগরমল গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "উঠবেন না, বসুন—কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার মন্দির প্রাচীন, আমার নূতন মন্দিরে নববেশে শ্যামরায় বিরাজ করবেন, আর আপনিই হবেন তাঁর পূজারী—"

"না।"

"কিন্তু কেন ?"

"বড়লোকের প্রাসাদে গেলেই দেবতার মাহাত্ম্য বাড়ে না। তাছাড়া শ্যামরায় আমার—আমার বুকের পাঁজরা—"

"কিন্তু আপনার জীর্ণ মন্দির—"

"জীর্ণতাই তো তাঁর মাহাত্ম্য—"

নাগরমল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "পণ্ডিতজী—"

"কি ?" জনার্দনের চোখ জ্বল-জ্বল করছে।

"টাকা দেব আপনাকে—"

"চাই না—"

"হাজার—পাঁচ হাজার—"

"না।"

"দশ হাজার—"

জনার্দন হাসলেন, "টাকা দিয়ে ভগবানকে কেনা যায়? না, আর না, আমি চললাম শেঠজী—"

আর কোন কথা না বলে, কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করে জনার্দন ভট্টাচার্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে দেয়াল-ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটা শোনা যেতে লাগল, একটা অর্বাচীনের খিক্ খিক্ হাসির মত।

জনার্দনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাগরমলের ধবধবে সাদা ললাটদেশে আঁকাবাঁকা কাল সাপদের আবার দেখা গেল। একটা ক্রুর বীভৎসতায় হঠাৎ তার মুখমণ্ডলটা ভয়ানক হয়ে উঠল।

বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার এসেছে। এসেছে সব ওস্তাদ কারিগরেরা। জয়পুর থেকে পাথর এসেছে, বাঙলা বোম্বাই থেকে শিল্পীরা। নাগরমলের বিরাট মন্দির যেন মানুষদের ভক্তি-অনলে ইন্ধন জোগায়।

তাই হল। ছ'মাসের মধ্যে বিরাট মন্দির গড়ে উঠল। শ্বেতপাথর আর কষ্টিপাথরের মেঝে, প্রাচীরগাত্রে পৌরাণিক দেব-দেবীদের অপূর্ব চিত্র কাহিনী। চন্দন-কাঠ, সোনা আর রূপো দিয়ে বিগ্রহের সিংহাসন নির্মিত হল, দেবতার পরিচ্ছদের জন্য এল দামী দামী রেশম। মনে হল যে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুকেও বুঝি টলানো যাবে।

মনের বিদ্রোহ দমিত হয়। অভ্রভেদী মন্দিরের ধোঁয়াটে চূড়াকে দেখে ভয় হয়, ভক্তি হয়। দেবতার কথা, দেবতার অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাগরমলের উপর রাগটা যেন কমে আসতে চায়।

আড়ালে ত্রিলোচন মনে মনে গর্জায়। অন্ধ, ওরা অন্ধ। আফিংয়ের

নেশায় আচ্ছন্ন, সম্মোহিত হয়ে আছে ওরা। ওরা অসহায়, নিজেদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা জানে না বলেই ওরা অমনভাবে মাথা খোঁড়ে।

রাত হয়েছে তখন। শ্যামরায়ের পূজো, আরতি, ভোগ, শয়ান সব শেষ করে জনার্দন বাড়ী ফিরেছিলেন। একশ বছরের শ্যামরায়ের মন-ভোলানো হাসিটা তখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল। এমনি সময় কালো যবনিকা নেমে এল।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে সজোরে একটা রামদা এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ল। কোনো কিছু ভাববার আগে, 'শ্যামরায়' বলে ডাকবার আগেই জনার্দন ভট্টাচার্যের মাথাটা তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল। মাটিতে ইট পড়লে যেমন শব্দ হয়, রাম দত্তদের বাগানে তেমনি একটা শব্দই শুধু শোনা গেল আর লাল রক্তের মদির গন্ধে রাতের অন্ধকার বিহ্বল হয়ে উঠল। আর কিছু নয়।

তারপরেই হঠাৎ একদিন এক অপূর্ব কাহিনী শোনা গেল।

শ্যামরায়ের মন্দিরকে এখন যারা দেখা-শোনা করছিল, নাগরমল তাদের ডেকে পাঠাল।

দীন-ভক্তের মত নম্রভাবে, বিনীতকণ্ঠে সে তাদের এক বিচিত্র স্বপ্নকথা বলল। কাল রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে, যে শ্যামরায়—জাগ্রত দেবতা শ্যামরায়, যেন তাকে করুণকণ্ঠে মিনতি করে বলছেন, "আমায় নিয়ে যা নাগর—আমায় এ ভাঙ্গা মন্দির থেকে উদ্ধার কর—সবাইকে বল্"—

শ্রোতাদের দেহ কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

"আপনারা এবার আমায় কি করতে বলেন?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল নাগরমল। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ওরা, তারপরেই সবাই সম্মিলিতকণ্ঠে বলে উঠল, "নিয়ে যান, শ্যামরায়কে আপনার মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত করুন শেঠজী—"

নাগরমলের কণ্ঠে আবেগ, চোখে জল। সে বলল, "আমি ধন্য হলাম।

তবে ও মন্দিরকেও সারিয়ে দেব আমি, নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করব ওখানকার শূন্য সিংহাসনে—যা টাকা লাগে—আমি, আমিই দেব তা।"

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই দিব্য কাহিনী।

প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে ত্রিলোচন তার কানেও একথা গেল। মুহূর্তে সে আজ শ্যামরায়ের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করল—কি অদ্ভুত সে ক্ষমতা!

থুথু ফেলে সে গাল দিয়ে বলল, "শালা—প্যাঁচার বাচ্চা"—

তারপরে একদিন মহাসমারোহে নাগরমলের মন্দিরে শ্যামরায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সেদিন পাট-কল বন্ধ রইল, মজুরেরা ছুটি পেল।

আঃ, কি অপরূপ দেখাচ্ছে শ্যামরায়কে।

তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্যামরায়ের বয়স হয়েছে—একশ বছর—তবু বার্ধক্যবিহীন প্রস্তরের মাঝে অনন্তকালের কৈশোরকে যেন শিল্পী অমর করে তুলেছে। সোনা, রূপো, জরি, রং আর আলোর উৎসব। কে এককোণে ধ্রুপদ গাইছিল—তার সঙ্গে একজন ঝাঁপতালে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে—সেই গুরু গুরু শব্দে মন্দির যেন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। বহু বছরের বুভুক্ষু শ্যামরায় তাঁর কোটিপতি ভক্তের অর্ঘ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর রসনায় জল এসেছে, তাঁর পরিপুষ্ট ও ধনুকের মত বাঁকা ঠোঁটের কোণে চঞ্চল কিশোরের দুষ্টামীভরা হাসি। অপরূপ!

ত্রিলোচন জ্বলে-পুড়ে মরে। কি করে ওঁদের জাগানো যায়?

দিনের পর দিন কাটে। কি করে—কি করে ওদের জাগানো যায়?

আবার সেই এক ইতিহাস। ব্যাধি, মড়ক, দারিদ্র্য, শ্যামরায় বাঁচাও, রক্ষা করো। চরণামৃত আর তুলসী-চন্দন। প্রস্তরের আশীর্বাদ। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সবাই। আর সেই অবসরে নাগরমলের ভুঁড়ি বাড়ে, ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে সে হতভাগাদের গলা কাটে। আজ আর ভয় নেই—নাগরমল আজ সেই শ্যামরায়ের প্রহরী—যে জাগ্রত শ্যামরায় মজুরদের অনাহার থেকে বাঁচান, মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করেন।

অসহায়ভাবে ছট্‌ফট্‌ করে ত্রিলোচন। কি করা যায়, কি করা যায়? কি করে ওদের জাগানো যায় আবার?

আগুন! আগুন!

শেষরাত্রে কোলাহল ধ্বনিত হল। ছুটে এল শত শত মজুর। "আগুন! শ্যামরায়ের নতুন মন্দিরে আগুন লেগেছে—কেরোসিন তেল আর পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ—দমকল ডাকো, ফোন্‌ করো—'শ্যামরায়কে' উদ্ধার করো—"

এমনি সময়ে ছুটে এল ত্রিলোচন। তার এক চোখ উত্তেজনায় জ্বলছে, সে কাঁপছে। "যাচ্ছি—আমি উদ্ধার করছি শ্যামরায়কে—"

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে ছুটে গেল সে। শ্যামরায়ের প্রকোষ্ঠে শালকাঠের দরজাটা তখন পুড়ে গেছে, আগুন বিস্তৃত হয়েছে ভিতরের দিকে, স্পর্শ করেছে সিংহাসনকে।

ভয়াবহ বীভৎসতায় কুটিল হয়ে উঠেছে ত্রিলোচনের মুখমণ্ডল। দু'টো হাত বাড়িয়ে সে শ্যামরায়কে তুলে নিল। মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "একশ বছর বয়েস হয়েছে তোমার—আর বেঁচে লাভ নেই শ্যামরায়—"

শ্বেতপাথরের মেঝের উপর কষ্টিপাথরের কিশোর মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আগুনের ঝাপটা এসে চামড়ায় লাগছে, পড়ছে ফোস্কা, তবু হাসল ত্রিলোচন। আঃ, আজ সে তৃপ্ত!

সমস্ত মন্দিরে তখন দীপান্বিতা উৎসব শুরু হয়েছে। কাঠের দরজা, জানালার চটাচট্‌ শব্দ শোনা যায়, শ্যামরায়ের সোনা-রূপো দিয়ে মোড়া চন্দন-কাঠের সিংহাসনটা তখন কাগজের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে চন্দনের একটা সুতীব্র সুঘ্রাণ।

লেলিহান হয়ে উঠেছে—ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মত চমৎকার আহার্য পেয়ে সেই অগ্নিরাশি যেন পরিতৃপ্তির রাক্ষসী নিঃশ্বাস ফেলছে। আঃ, আঃ! ধোঁয়া

উড়ছে, আগুনের সর্প-জিহ্বা বাতাসকে লেহন করছে; ত্রস্ত, ব্যস্ত, ভয়ার্ত মজুরেরা দৌড়াদৌড়ি করছে।

বেরিয়ে এল ত্রিলোচন। জামা-কাপড় পুড়ে গেছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দগ্‌দগে ঘা আর ফোস্কা নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ত্রিলোচন।

মজুরেরা সবাই ছুটে এল কাছে।

"পারলাম না ভাই সব, পারলাম না—" বিচিত্র হাসি হেসে বলল ত্রিলোচন।

সবাই তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। তাকে দেখে তাদের ভয় হয়, ভক্তি হয়। শ্যামরায়কে উদ্ধার করা গেল না! হঠাৎ ওরা দুর্বলবোধ করে। এবার? এবার কি হবে?

"ত্রিলোচন—কি করি তবে?"

"কিছু না—শুধু দেখ্—দেখ্ কি চমৎকার আগুন জ্বলছে—"

স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। ঘা, ফোস্কা কিছু যায় আসে না। সেই ভীতি-জনক আগুনের আলো এসে তার মুখের উপর পড়েছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলের উপর এক বিচিত্র বীভৎস হাসির রেশ। আগুনের অপরূপ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুড়ুক, শ্যামরায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হোক। মিষ্টি চেহারার অন্তরালে পাথরের মত নিষ্ঠুর ও নির্লিপ্ত মন যে শ্যামরায়ের তার অনেক বয়েস হয়েছে—শ্যামরায় মরুক। দেবতারা সব রক্তবীজের মত—মরেও মরে না। দেবতারা না মরুক, অন্ততঃ শ্যাম-রায়ের মত দেবতারা মরুক! শ্যামরায়কে আর নয়। নূতন দেবতা চাই এবার—যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না, যাঁকে বিশ্বাস করার জন্য বুদ্ধি ও মানবত্বকে বলি দিতে হবে না।

এক চোখ—মাত্র একটা চোখ ত্রিলোচনের। ডান-চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে গলে গেছে, গায়ে তার ঘা আর ফোস্কা, তবু তার মুখে আজ পরিতৃপ্ত শ্বাপদের উল্লাস। একটা চোখ—মাত্র বাঁ-চোখটা আছে তার। আর সেই বাঁ-চোখের উপর সেই অগ্নিলীলার আলো এসে পড়েছে—ঝক্‌ঝক্ করছে সেটা—অনির্বাণ সূর্যকান্ত-মণির মত।

অদ্ভুত

মনোরঞ্জন হাজরা

এক রকমের মানুষ তো পৃথিবীতে অনেকই দেখা যায়, কিন্তু তাজপুরের হরিদাস সামন্তের মত আর একটিও মানুষ সারা পৃথিবীতে মিলিবে না। প্রমাণ সাইজ লম্বা চেহারা, বেশ মোটাসোটা। মাথার চুলগুলা খোঁচা খোঁচা, এক মুখ দাঁড়ি। দশ হাত একখানি থান পরনে, অধিকাংশ সময়েই খালি পা। চোখগুলা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, চাহনি দেখিলে হাতির কথা মনে পড়ে। সব সময়ই তার এই অবস্থা। ভিন দেশে কোথাও যাইতে হইলে পরনের কাপড়ের উপর কাঁধে ফেলে একখানা উড়নি, পায়ে দেয় শত তালিযুক্ত ক্যাম্বিসের জুতা আর বগলে নেয় ছাতা।

লোকের সহিত হরিদাসের ব্যবহার মন্দ নয়। গ্রামের লোককে সে পারতপক্ষে চটায় না। তবে তাকে যদি কেউ চটায়, তা' হইলে তার আর নিস্তার নাই। সংসারে হরিদাসের স্ত্রী ও একটি ছেলে ব্যতীত আর কেউ নাই। বর্ত্তমানে ছেলেটি গোপালপুরের হাইস্কুলে পড়িতেছে। হরিদাসের একটি বড় ছেলে ছিল বটে কিন্তু তাকে গ্রামের লোক ষড়যন্ত্র করিয়া জলে চুবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য গ্রামের লোক যে বিনা দোষে হরিদাসকে এইরূপ শাস্তি দিয়াছিল তা' নয়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে হরিদাস গ্রামের পঞ্চুদাসকে খুন করিয়া লাস পর্য্যন্ত লোপাট করিয়া দেয়। এ কথাটা সকলেই জানিয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যখন তার কিছু করা যাইবে না, তখন লোকে ঐভাবে তার পুত্রকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ নেয়। সেই হইতে

সে কেমন যেন শান্ত হইয়া গিয়াছে। তা' না হইলে তার দাপটে লোকের টুঁ শব্দটি করিবার জো পর্য্যন্ত ছিল না।

আগেকার দিনে কারও সহিত সংঘর্ষ বাধিলে তার আর রক্ষা থাকিত না। যদি জমি সংক্রান্ত অর্থাৎ 'জমি কার' এই ব্যাপার নিয়া সংঘর্ষ হইত তা' হইলে হরিদাস করিত কি, কয়েকদিনের জন্য গ্রাম হইতে চলিয়া যাইত, তারপর হয় গড়মান্দারণ হইতে নয়তো পাহাড়পুর হইতে সেকালের রাজবংশের পছন্দ করা নানারকম নক্সী ইঁটের গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া আনিয়া রাতের অন্ধকারে আপন জমির শেষে আরও খানিকটা আগাইয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেইখানে পুঁতিয়া দিত। ব্যস, সরেজমিনে তদন্তের সময় হরিদাস শাবল হাতে বাড়ী হইতে বাহিরে আসিত। অবশ্য এমনভাবে শাবল নিয়া আসিত, যাতে অন্য কোন রকম কথা না মনে করিয়া লোকে যেন মনে করিতে পারিত লোকটা বুঝি শাবল নিয়া বাড়ীতে কোন কাজ করিতেছিল, হঠাৎ বাহিরে আসিয়াছে। হরিদাস আগন্তুক তদন্তকারীকে নমস্কার জানাইয়া বলিত, হুজুর গরীবকে রক্ষা করুন।

তদন্তকারী জমির সীমানা দেখিতে গেলে প্রতিপক্ষ যখন আপন সীমানাটুকু তাঁকে বুঝাইয়া দিত, তখন হরিদাস দুই পায়ের ফাঁকে শাবলটাকে দাঁড় করাইয়া করযোড়ে বলিত, আমার একটা নিবেদন আছে হুজুরের কাছে। হুজুর আমি গরীব। অবশ্য আমার পিতামহ, প্রপিতামহ তেনারা আমার মত ছিলেন না। তেনারা যা ক'রে গেছেন আমরা তা' রক্ষে করতেই পাচ্ছি না। হুজুর যদি দয়া করে পায়ের ধূলো দেন বাড়ীতে তাহ'লে দেখতে পাবেন বাড়ীখানা কি!

তদন্তকারী ভদ্রলোক হয়তো বলিতেন, আচ্ছা তদন্ত হয়ে যাক্ যাব'খন আপনার বাড়ীতে।

সে আমার পরম সৌভাগ্য হুজুর, করযোড়ে হরিদাস বলিত, কিন্তু হুজুর বাদী যে সীমানা আপনাকে দেখালে ও সীমানা ঠিক নয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গে গেছেন।' তেনারা আমাকে পথে বসিয়ে যান নি। হুজুর

আমার পিতামহ আমাকে ব'লে গেছেন—আমাদের প্রত্যেকটা জমীর সীমানা ঠিক করা আছে। খুঁড়িলেই দেখা যাবে নিচোয় পিলার গাঁথা আছে।

প্রতিপক্ষ্য বলিয়া উঠিত, মিথ্যে কথা হুজুর।

হুজুরের দয়া হ'লে আমি খুঁড়ে দেখাতে পারি, বলিয়া হরিদাস তদন্তকারী ভদ্রলোকের অনুমতি প্রার্থনা করিত। তদন্তকারী দেখিতেন যদি পুরানো গাঁথুনী বাহির হয়, তা' হইলে তো মিটিয়া যায় গণ্ডগোল। তাই তিনি আজ্ঞা দিতেন, খোঁড়ো—

হরিদাস যেখানে পিলার পুঁতিয়া রাখিত সেখানে আগে খুঁড়িত না। আগে এদিক ওদিক খুঁড়িয়া লোককে প্রতিপক্ষের ব্যক্তব্য সম্পর্কেই বিশ্বাসবান করিয়া তুলিত। তারপর যে জায়গায় পিলার আছে সে জায়গায় কয়েকটি ঘা মারিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিত, ঠেকেছে—ঠেকেছে হুজুর!

তদন্তকারী আসিবার আগেই লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। মাটির নীচে পিলারের গায়ে ঠুং-ঠাং শব্দ শুনিয়া তারা আশ্চর্য্য হইয়া যাইত ও হরিদাসের কথার সত্যতা সম্পর্কে প্রবল সমর্থন জানাইত।

আরে বাপু ডু'শো বছর আগে এই পিলার গাঁথা হয়েছিল। বাংলাদেশে তখনও নবাবের রাজত্ব চলেছে। একি অমনি যা-তা, বলিতে বলিতে হরিদাস পরম উৎসাহভরে শাবল চালাইত। প্রতিপক্ষ বিস্ফারিত নেত্রে দেখিত তার কাণ্ড। তদন্তকারী হরিদাসের পক্ষেই রিপোর্ট দাখিল করিতেন। হরিদাসের জিৎ হইত।

এহেন হরিদাস সম্প্রতি কেমন যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

হরিদাসের পুরাণো আমলের পাকা বাড়ী। গাঁথুনির চুণ-সুরকি উঠিয়া গিয়া হিংস্র বন্যজন্তুর দন্তরাজির মত ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে তার চামচিকা ও আরশুলার বাসা। অপরিচিত আওয়াজ পাইলেই ফট্ ফট্ শব্দে বাহিরে আসে। মেঝেয় সেকালের প্রকাণ্ড কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোষ পাতা, তারই উপর মাদুর বিছানো। হরিদাস দিন-রাত তক্তাপোষের সেই

মাদুরে বসিয়া বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া রাজ্যের কাগজ-পত্র সব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখে। কি দেখে তা' সেই জানে। মাঝে মাঝে শুধু কুমার বংশীলাল বাহাদুরের লোক আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলে আর হরিদাসও তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব উত্তর দেয়।

একদিন সকালে একদল চাষী আসিয়া হরিদাসকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল। হরিদাস নিজের ঘর হইতে না বাহির হইয়া পুত্র শঙ্করকে ডাকিল। শঙ্কর আসিয়া কহিল, ডাকছিলে কেন বাবা?

যাও একবার বাইরে যাও। কারা ডাকছে দেখে এসো। আর গ্যাখো, জিগ্যেস্ করবে তাদের কি দরকার, বলিয়া হরিদাস নিজের কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরেই শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দেখা করে কি বল্‌তে চায়।

হরিদাস চশমাটাকে খুলিয়া কি যেন ভাবিল। তারপর কহিল, যাও ডেকে আনো তাদের—

শঙ্কর চলিয়া গেল।

আসিল শ্রীখণ্ডের একদল চাষী প্রজা। মোড়ল আসিয়া প্রথমে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া কহিল, নমস্কার সামন্ত।

নমস্কার, হরিদাস কহিল। হঠাৎ সকালে কি মনে ক'রে মোড়লের পো?

মোড়ল লোকটার বয়স হইয়াছে। দীর্ঘ চেহারা। একদিন তার প্রতিটি শিরায় শক্তির ঢেউ বহিয়া যাইত কিন্তু আজকাল গায়ের চামড়া একেবারে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তবে লোকটার দিকে সহসা চোখ পড়িলে মনে হয়, এই লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ একজন সামান্য লোক নয়। বাস্তবিক তাই। গোটা শ্রীখণ্ড মৌজার প্রত্যেকটি চাষীকে সে আপন দলের মধ্যে আনিয়া রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ইহাদের নিয়া সে যে-কোন কাজই করিতে পারে। হরিদাসের কথার উত্তরে হাসিতে হাসিতে মোড়ল কহিল, এসিছি একটু দরকারেই সামন্ত।

তা' বেশ, বোসো—বোসো। হরিদাস মোড়লের পিছনকার লোকগুলিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, এসো ভাই সব এসো—গরীবের ভাঙা বাড়ীতে।

মোড়ল কহিল, গরীবই তুমি বটে! সমস্ত চত্বরটাকে গিলে বসে আছো!

হরিদাস হাসিল। তারপর বলিল, মোড়ল সে সব দিন আর নেই। এখন জমিদারের চেয়েও বড় শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে।

মোড়ল বুঝিল হরিদাসের কথা। 'জমিদারের চেয়েও বড় শক্তি তাদের বিরুদ্ধে' কথাটির অর্থ যে কি তা' মোড়লের না জানিবার কথা নয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এতদঞ্চলে কৃষক আন্দোলন চলিতেছে। তাই সে কহিল,, কিন্তু তারা তো তোমার জমি কেড়ে নেয় নি সামন্ত।

তা' নেয় নি, হরিদাস কহিল। কিন্তু নিতেও তারা পারে। তারা সব ভয়ানক লোক। মোড়ল, একদিন আমি মাথার জোরে আর তুমি লাঠির জোরে—আমরা দু'জনে সম্পত্তি অর্জ্জন করিচি। এদের কাছে মাথাও তুচ্ছ, লাঠিও তুচ্ছ।

তাই নাকি, মোড়ল হাসিয়া কহিল। যাক্, এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক্!

তামাক খাও তো আগে। হরিদাস হাঁকিল, শঙ্কর—শঙ্কর?

পরক্ষণেই শঙ্কর আসিয়া হাজির হইল।

হরিদাস কহিল, গিন্নীর নব্‌নেকে বলে দাও দু'কল্‌কে তামাক দিতে এখানে।

আচ্ছা, বলিয়া শঙ্কর চলিয়া গেল।

মোড়ল কহিল, আর বেশি দেরি করব না সামন্ত। শোনো আমাদের কথা। শ্রীখণ্ড মৌজার সামনে সরস্বতীর যে চরটা, শুন্‌ছি ওটা নাকি কুমার বংশীলাল বাহাদুরের সাব্যস্ত করবার জন্যে তুমি ভার নিয়েছ?

হরিদাস যেন চমকাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, শুন্‌লে কোত্থেকে মোড়ল?

শুনিচি হে, মোড়ল হাসিল।

ইতিমধ্যে ভৃত্য নবীন আসিয়া তামাক দিয়া গেল। হরিদাস, মোড়লকে একটা হুঁকা আগাইয়া দিয়া নিজে একটা হুঁকায় কয়েকবার টান দিল। মোড়লও হুঁকায় টান লাগাইতে শুরু করিল।

খানিক পরে হরিদাস কহিল, হঠাৎ সরস্বতীর চরের কথা আজ কেন মোড়ল?

মোড়ল মুখ হইতে তামাকের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, চরটা যে আমাদের সামন্ত!

—মানে?

—মানে আমরা শ্রীখণ্ড মৌজার প্রজারা বংশানুক্রমে ওটা নিষ্কর ভোগ ক'রে আসছি।

হরিদাস হাসিল এবং কহিল, তা' এখন কি ক'রতে চাও?

—ওটা আমাদেরি দখলে রাখতে চাই।

—কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পারবে মোড়ল?

—কুমার বাহাদুর তো এখন তুমিই সামন্ত—তা' তোমার সঙ্গে এই বুড়ো বয়সে না হয় একবার পাঞ্জা কষব!

—হুঁ হুঁ।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। মোড়ল উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় শেষ কথা সে বলিয়া গেল, সামন্ত দু'জনেই বুড়ো হয়িচি। দিনও গেছে বদলে। এখন আর ওদিকে না গিয়ে চল বরং নতুন পথেই পা দিই।

দেখা যাবে'খন। হরিদাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তক্তাপোষের উপর ছড়ানো রাশীকৃত কাগজ-পত্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীখণ্ড তাজপুর হইতে বেশি দূর নয়।

মাত্র দু'খানি গ্রামের ব্যবধান। দিন বদলাইয়া গিয়াছে তাই—তা' না হইলে শ্রীখণ্ড হইতে দু'খানা গ্রাম ডিঙাইয়া আসিয়া হরিদাসকে কেহ এইভাবে

শাসাইয়া যাইতে সাহস করিত না। হরিদাসের মধ্যে আহত সর্পের ক্রুরতা ব্যাকুল আস্ফালনে যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মোড়ল লোকটিকে একদা সে ভয় করিত। তখন মোড়লের গায়ে হাতীর মত ক্ষমতা। লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইলে কেহ আগাইতে সাহস করিত না। হরিদাস তো কখনো তার সম্মুখে পড়েই নাই। বরং সে তাকে সন্তুষ্ট করিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আজ আর মোড়লের সেদিন নাই, তাই হরিদাস তাকে বড় একটা গ্রাহের মধ্যে আনে না, কিন্তু আজ সে তার বাড়ী বহিয়া যেভাবে তাকে 'বুড়ো বয়সে পাঞ্জা কষিবার' ইঙ্গিত দিয়া গেল তা' যেমনই বিরক্তিকর, তেমনই অপমানকর।

তবু অকারণে মোড়ল সম্পর্কে কোথায় যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব তার মনে উঁকি দিতে লাগিল। জীবনে সে কখনো এমন দ্বিধায় পড়ে নাই। মোড়ল বলিয়াছে 'নতুন পথে পা দিবার' কথা। সেই জন্যই কি তার প্রতি মন ঝুঁকিয়া পড়িতেছে? হইবেও বা।

হরিদাস এক তক্তাপোষ কাগজ-পত্রগুলিকে টানিয়া টানিয়া একদিকে জড়ো করিতে লাগিল। কাগজ-পত্রের মধ্যে কয়েকখানা চাঁদ-সওদাগরের কাহিনী সম্বলিত পুস্তক, কয়েকখানা শ্রীমন্ত-সওদাগর সম্পর্কেও রহিয়াছে। হরিদাস ধীরে ধীরে বইগুলোকে কাছে টানিয়া নিল। এক একখানির পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। মাঝে মাঝে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ।

শ্রীখণ্ড মৌজার চর যে আজিকার চর নয়—ইহা বহু পূর্ব্বের এবং পুরুষানুক্রমে ইহা কুমার বংশীলাল বাহাদুরের দখলে তা' প্রমাণ করিবার জন্যই এই পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। কথিত আছে, চাঁদ-সওদাগর তাঁর বাণিজ্য-যাত্রার সময় এই পথ দিয়া-যাইতেন। তাঁর বাণিজ্যযাত্রা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে যে সব কাব্য রচিত হইয়াছে তাতে নাকি এই সব জায়গার উল্লেখ আছে। শ্রীখণ্ডের কিছু দক্ষিণে চণ্ডীতলা গ্রাম—একদা চাঁদ-সওদাগর সেখানে চণ্ডীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রামটির নাম চণ্ডীতলা হইয়াছে। হরিদাস আদালতে এসব কথা প্রমাণ করিবে। আরও সে প্রমাণ করিবে এই শ্রীখণ্ড মৌজার চরটিও সেকালের।

বইগুলো একদিকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়া সে বাগানের দিকে দৌড়াইল। ভৃত্য নবীন সেখানে একটা চালা বাঁধিয়া বাস করে। সেই চালের বাতায় একতাড়া বিবর্ণ পাংশু কাগজ গোঁজা ছিল। সেগুলো বাহির করিয়া নিয়া আবার সে ঘরে আসিল। ডাকিল, শঙ্কর—শঙ্কর ?

শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিদাস কহিল, শিগ্‌গীর নব্‌নেকে ডাকো।

শঙ্কর নবীনকে ডাকিয়া দিল। নবীন আসিলে হরিদাস তাকে তক্তাপোষের কাগজ-পত্র, বই সব কিছু একটা পুঁটুলিতে বাঁধিতে বলিল। তারপর কহিল, আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিগে যা—

আহারাদি সারা হইলে নবীন প্রভুকে অনুসরণ করিল।

দিনান্ত সূর্য্যের রক্তিম আলো পশ্চিমাকাশে পরিব্যাপ্ত।

প্রাসাদের দ্বিতলে কুমার বংশীলালের সুবৃহৎ কক্ষে তখনো বেশ আলো আছে। দীর্ঘকালের ধূলি-ধূসরিত কার্পেটের উপর শুভ্র জাজিম পাতা। তারই এদিক-ওদিকে গোটাকয়েক বড় বড় তাকিয়া। মাঝখানে বসিয়া বংশীলাল। চারিপাশে তার মোসাহেবের দল। বংশীলালকে দেখিলে মনে হয় যে, সে শুধু রাজবংশেরই শিব-রাত্রির সলিতা নহে, সামন্ত-তান্ত্রিকতারও বটে। দীর্ঘাকৃতি মেদবহুল চেহারা তার। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন তার চোখেমুখে। ভ্রূর উপর চন্দ্রাকারে শ্বেত-কুষ্ঠের দাগ। সংসারে তার দায়িত্ব বলিয়া কিছু নাই, কারণ. উপর্য্যুপরি গুটি তিনেক বিবাহ করিয়াও সে সন্তান লাভ করিতে পারে নাই। তাই সারাদিন মোসাহেব পরিবেষ্টিত হইয়া অতীত দিনের আনন্দ-বিলাসের জের টানে শুধু; আর রাজবংশের ভবিষ্যৎ যেমনভাবে তারই জীবনে আসিয়া পূর্ণচ্ছেদ টানিয়াছে, তেমনিভাবে সেও ছেদ টানে ভিতর বাটীর সহিত!

সেদিন এই কক্ষে মোসাহেবের দল ছাড়া আরও একজনকে দেখা গেল, সে হইতেছে হরিদাস। ভৃত্য নবীনের চালা হইতে আনীত সেই একতাড়া

বিবর্ণ কাগজ ইতিমধ্যে বংশীলালের হাতে পড়িয়াছে। বংশীলাল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মত সন্মুখে সেই কাগজগুলি প্রসারিত করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছে—কি দক্ষতার সহিতই না হরিদাস তার কথা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছে! কাগজগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বংশীলাল বলিয়া উঠিল, এ কাজ তুমি শিখেছিলে কোথায় হরিদাস?

হরিদাস গল্প ফাঁদিল। কবে কোন এক বিস্মৃত-অতীতে তার কোন পূর্ব্বপুরুষ দ্বারহাট্টা অঞ্চলের কোন এক নীলকর সাহেবকে জব্দ করিবার জন্য পুরাতন দলিলকে নূতন করিয়া লিখিয়া চালা-ঘরের বাতায় গুঁজিয়া তাতে ধোঁয়া লাগাইয়া লাগাইয়া একেবারে দুই শত বৎসরের পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছিল, তারই কাহিনী সে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গেল। বংশীলাল ও তার মোসাহেবের দল সে কাহিনী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তারি আতিশয্যে সকলে বলিয়া উঠিল, তাহ'লে এই চর নেয় কে?

হরিদাস কহিল, কিন্তু আমার প্রাপ্যটা?

—আরেক দিন এসো না হরিদাস।

—তা' হয় না কুমার বাহাদুর! আমি অনেক খেটেচি। মায় চাঁদ-সওদাগর, শ্রীমন্ত-সওদাগরের কাহিনী সব একেবারে মুখস্ত করে ফেলিচি। মামলা হলে দেখতে পাবেন।

—আচ্ছা আচ্ছা! তোমার বাড়ীতে যদি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিই কাল সকালে?

সামন্ত-তন্ত্রের নাভিশ্বাস কি জিনিষ হরিদাস তা' জানে। পয়সা ফেলিয়া রাখিলে কোনদিনই আর পাওয়া যাইবে না। তাই সে কহিল, না কুমার বাহাদুর!

হরিদাসের জিদ্ দেখিয়া কুমার বাহাদুর ম্যানেজারকে ডাকিলেন।

সহসা বাহিরে আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া অগণিত মানব-কণ্ঠের এক বিপুল গর্জ্জন শোনা গেল। সকলে চমকাইয়া উঠিয়া বারান্দার দিকে ছুটিয়া

গেল। হরিদাসও গিয়াছিল। রাজ-বাড়ীর ফটকের সামনে বিশাল জনতা। সকলের আগে সেই লোল-চর্ম্ম মড়োল। হরিদাস তার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হাসিয়া উঠিল, হা-হা-হা-হা-হা……

বংশীলাল হাঁকিল, হরিদাস ?

হরিদাস ছুটিয়া কুমার বাহাদুরের কক্ষে গেল। ম্যানেজারবাবু টাকা নিয়া দাঁড়াইয়া। হরিদাস জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বংশীলালের দিকে তাকাইল কিন্তু পরক্ষণেই ম্যানেজারবাবুর হাতে টাকা দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দস্যুর মত সে এক থাবা মারিল এবং দ্রুত-পদে সিঁড়ির পথ ধরিল। বংশীলাল হাঁকিল, হরিদাস ?

হরিদাস তখন সিঁড়ির পথে নামিতেছে। নানারকম কাজকরা পাথরের সিঁড়ি। হরিদাস পা দিয়া অনুভব করিতেছে আর ভাবিতেছে ইহার প্রত্যেকটি গাঁথুনিতে আছে—ঐ গর্জ্জনকারী জনতার রক্ত। চীৎকার করিয়া তার বলিতে ইচ্ছা হইল, মোড়ল তুমিই ধন্য।

উহাদের গর্জ্জন যেন থামিবার নয়। ক্রমশঃ যেন চারিদিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। হরিদাস আরও দ্রুত নামিতে লাগিল।

লক্ষাচরের মাঠ

হাড়ে-মাসে মিলিয়া দোহারা লম্বা দেহ। প্রশস্ত বুকের ছাতি ও লোহার মতই শক্ত কঠিন হাতের কব্জি। মাথাভর্তি একরাশ কোঁকড়ানো চুলের গোছা কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। একখানা লাঠির সাহায্যে দু-একশ লোকের মহড়া লইবার শক্তি সে রাখে। লাঠি-খেলায় বিশখানা গ্রামের ওস্তাদ, তাই সে অঞ্চলের সকলেই তাহাকে সর্দার বলিয়া ডাকিত।

সর্দার হইলেও কালুর অন্তঃকরণটা ছিল শিশুর মত স্বচ্ছ ও কোমল। বাব্‌রি-চুল উড়াইয়া সে যখন সর্দারী মেজাজে হাঁক ছাড়িতে ছাড়িতে আগাইয়া চলে, তখন কে বলিবে যে ওই পাথরের মত শক্ত দেহটির ভিতরে ভিতরে সঙ্গোপনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্নেহের উৎস লুকাইয়া আছে। প্রত্যক্ষভাবে তখন মানুষ টের পায় যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত কালু সর্দার বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর উঠানে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়ে—আর পঙ্গপালের মত ছোট ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কেহ তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে কেহ বা পিঠে, কেহ বা বাব্‌রি-চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে আদর করিতে শুরু করিয়া দেয়। কালুর স্নেহশীলতা তখন উপ্‌চাইয়া পড়ে ওই কচি কচি নিষ্কলঙ্ক অবোধ শিশুগুলির উপর। লোক তখন চিনিতে পারে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের এই খেলার সাথীটির ভিতরের মানুষটিকে।

সংসারটি অতি ক্ষুদ্র। একমাত্র বিধবা ভগ্নী ও ছোট্ট ছেলেটি। আপন বলিতে সংসারে আর কোথাও কেহ নাই। অথচ দুই বৎসর পূর্বেও সংসারের এমন শ্রী তাহার ছিল না। দেহ ও মন ঢালিয়া দিয়া যাহাকে একান্ত ভাল-বাসিয়াছিল সেই স্ত্রী অকস্মাৎ মারা গিয়া কালুকে দিশেহারা করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ভগবান সুখী হইলেন না। মাতৃহারা শিশুটিকে যাহার হেপাজতে রাখিয়া কালু নিশ্চিন্তে চলা-ফেরা করিত সেবার মহামারীর এক দম্‌কা হাওয়ায় সেই একমাত্র ভগ্নীটির জীবন-প্রদীপও নিভিয়া গেল। সেই দিন হইতে ক্ষুদ্র শিশুপুত্র হারাধনকে ছাড়িয়া সর্দার এক পা-ও নড়িতে পারে না। অষ্ট-প্রহর তাহাকে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে হয়।

ছোট্ট দুইটি কচি বাহু বাড়াইয়া দিয়া কালাচাঁদের গলাটি জড়াইয়া হারু ডাকে,—"বাব্—বা—বা!"

কম্পিত আগ্রহে শিশুর শুভ্র গণ্ড অশ্রান্ত চুম্বনে রাঙাইয়া দিয়া সর্দার তাহার উত্তর দেয়,—"বাব্—বা—।"

এরপর ছোট্ট ছেলেটিকে সম্মুখে বসাইয়া একটা রবারের বল গড়াইয়া

দিয়া ছেলেকে লইয়া সর্দার খেলা করে। বলের মৃদু আঘাতে হারু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। নাচিয়া নাচিয়া ছোট্ট দুইটি কচি হাতে শব্দহীন হাততালি দেয়।

এমন করিয়াই মা-মরা ওই ছেলেটি পিতার স্নেহ-কোমল পক্ষপুটে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কালু ভুলিয়া গেল তাহার জীবনের নিঃসঙ্গতা ও বিগত দিনের স্তূপীকৃত ব্যথা।

ছোট্ট ছেলেকে ঘরে রাখিয়া আগের মত দেশ-বিদেশে গিয়া আর রোজগারের সুবিধা নাই, তাই সর্দার নিকটেই নড়াইলের জমিদার বাড়ীতে চাকুরী লইল। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহার কার্যের তৎপরতা ও বিশ্বস্ততা বড় বাবুর দৃষ্টি এমন আকর্ষণ করিল যে, নিম্নতম সকল কর্মচারীর মধ্যে কালুই হইয়া উঠিল সবচেয়ে প্রিয় বরকন্দাজ। ব্যাঙ্কে যাইতে কালু, সদর খাজনা দিয়া আসিতে কালু, চেক্ ভাঙাইতে কালু—কালু সর্দার না হইলে যেন বড় বাবুর কোনো কাজই হয় না।

সেবার লাটের খাজনা সদরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

বড় বাবু ডাকিলেন,—"কালু!"

তৈল-পক্ক বাঁশের লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া হারুর হাত ধরিয়া গিয়া কালু সেলাম ঠুকিয়া বলিল,—"হুজুর!"

বড় বাবু বলিলেন,—"আগামী কাল লাটের খাজনা দেবার শেষ দিন। তোমাকে আজকেই যশোর যেতে হবে। শিগ্‌গীর তৈরী হয়ে নাও গে।"

ছোট্ট ছেলে হারাধনকে কাঁধের উপর তুলিয়া সর্দার বলিল,—"কালুর আর তৈরী হওয়া কি কর্তা? অষ্ট-প্রহর সে তৈরী হয়েই থাকে,—তবে অসুবিধা যা' একটু এই ছেলেটাকে নিয়ে।"

সর্দারের কথায় জমিদার একটু হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু কালু, তোমাকে ছাড়া এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নির্ভর করা চলে, কর্মচারীদের মধ্যে তেমন আর একজনও আছে ব'লে আমার জানা নেই। তাছাড়া, এত সময়ও এখন আর নেই, যে ভেবে-চিন্তে কাউকে পাঠাব।"

বলিতে বলিতে আলমারি খুলিয়া জমিদার টাকার তোড়া ও কাগজ-পত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। সদরে গিয়া কাহার নিকট কি কাজ করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া দেরাজ টানিয়া, বড়বাবু আরও পাঁচটা টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমার হারুকে পোষাক আর খাবার কিনে দিও।"

হারুকে কোলে করিয়া লাঠি হস্তে কালু জমিদারের আদেশ পালন করিতে সদলবলে বাহির হইয়া পড়িল। ছেলেকে লইয়া সে গ্রামের একটি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ার কাছে রাখিবার জন্য গেল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যতবারই ছেলেটিকে সে আত্মীয়ার কোলে তুলিয়া দেয়, ততবার হারু তাহার দু'টি কোমল বাহু দিয়া পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠে। ও যে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র এগার দিন পরেই মায়ের সহিত স্নেহের সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বাপের কোলেই বাড়িয়া উঠিয়াছে,—তাই আর কাহারও কোলে যাইতে চাহে না।

সহসা সাথীরা তাহার বলিয়া উঠিল,—"বেলা যে গেল সর্দার, এতটা পথ কখন যাবে?"

আকাশের দিকে একবার চাহিয়া কালু দ্রুত কঠিন হস্তে হারুকে নিজের বক্ষ হইতে নামাইয়া আত্মীয়ার কোলে তুলিয়া দিল। যেমন দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের কান্না দেখিয়া কালু বুঝিল যে, তাহাকে রাখিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বিলম্ব করিলে হয়ত মাঠের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার ধরিতে পারা যাইবে না। অথচ খাজনা দিবার কালই শেষ দিন। কালু নিতান্তই নিরুপায় হইয়া এই দূরের পথেও তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের আশা-ভরসা একমাত্র পুত্রটিকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইল।

বর্ষাকাল। গ্রামের সংকীর্ণ কর্দমাক্ত পথ পার হইলেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। মাঠের উপর দিয়া সুদীর্ঘ একটি পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ষ্টীমার ঘাটে। হারুকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কালু চলিয়াছে লাটের খাজনা পৌঁছাইয়া দিতে, সঙ্গে দুই জন লাঠিয়াল ও আরও একজন বন্দুকধারী সিপাই।

দেখিতে দেখিতে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া পৌছিল। অদূরেই প্লাবিত ভৈরব নদের উচ্ছ্বলিত বন্যার ঘোলা জলে চতুর্দিক থৈ-থৈ করিতেছে! মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত ধান্যের কচি কচি সবুজ পাতার উপর অস্তমান সূর্যের রশ্মি ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

প্লাবিত মাঠের এক-তৃতীয়াংশ পথ তাহারা প্রায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এমন সময় নদীর অনতিদূরের এই সুবিস্তৃত জনমানবহীন প্রান্তরটিকে সন্ধ্যা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়া একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলিল। মাঠটা নিরাপদ নহে। আশে-পাশে প্রায়ই খুন-জখম লাগিয়াই আছে। কিন্তু এই স্থানটা ফাঁকা, কোথাও বন-জঙ্গল নাই যে দুর্বৃত্তেরা অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কালুরও ছোট্ট দলটি তখন নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। ষ্টেশনে পৌছিতে পারিলেই তাহারা এখন বাঁচে!

হঠাৎ অনন্তগ্রাসী অন্ধকারের গর্ভ হইতে মোটরের হেড-লাইটের মতন একটা তীব্র আলোর জ্যোতিঃ ঠিকরাইয়া পড়িয়া এক একবার পথের মলিনতা নাশ করিয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার তাহাকে গাঢ়তর অন্ধকারে ডুবাইয়া ফেলে। মাঝে মাঝে দূরে ঝুপ্-ঝাপ্ বৈঠার শব্দ ফাঁকা মাঠের মৃদু জলো-হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। তারপরে ক্রমশই অতি নিকটে কল্‌কল্ হল্‌হল্ নৌকার দু'ধারে ঢেউ ভাঙার শব্দ। সহসা যোজনব্যাপী নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া লঙ্কাচর মাঠের বুকখানা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এক উৎকট বীভৎস চীৎকারে। আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে কতকগুলি লোক চক্ষের পলকে লাফাইয়া পাড়ে আসিয়া পড়িল। দস্যুরা কালুর সম্মুখে বন্দুক-ধারী রক্ষীটির হাত হইতে বন্দুকটি ছিনাইয়া লইতেই—কালু আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কালু সর্দার ঘাবড়াইবার মত মানুষ নহে। সে তখন দ্রুত-হস্তে মাথার

পাগড়ী খুলিয়া ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় ছেলেটিকে পিঠের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। এদিকে জমিদারের অপর লাঠিয়াল দুইজন—যদিও নামেই মাত্র লাঠিয়াল, তবু তাহারা আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টা করিতে কসুর করিল না। কিন্তু দুর্ধর্ষ দস্যুর লাঠির কঠিন আঘাতে দুইজনই আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। অস্ত্রহীন হিন্দুস্থানী সিপাইটি প্রাণের ভয়ে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

এইবার দস্যুদল তাহাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়া কালু সর্দারকে আক্রমণ করিল। কিন্তু পাঁচ-দশজন লোকের মুষ্টিমেয় শক্তিকে ভয় করিবার মত মানুষ সে নয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহার ওস্তাদের নাম স্মরণ করিয়া বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িল দুর্বৃত্তদের উপর। সর্দারের লাঠির সম্মুখে লড়িবার শক্তি ডাকাতদের মধ্যে একজনেরও ছিল না। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ লাঠির এক একটি আঘাতে—কেহ বন্যার অথৈ জলে আহত হইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল, কেহবা রাস্তার উপরেই ফিন্‌কি দেওয়া রক্ত-স্রোতের মাঝে মৃত্যু যন্ত্রণার করুণ আর্তনাদে নৈশ-আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিল! বাতাস ভারী হইয়া উঠিল মুমূর্ষুর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে, অন্ধকার হইয়া উঠিল আরও ভয়ঙ্কর।

লাঠির সুকৌশল প্যাঁচে ডাকাতের কবল হইতে কালু ক্ষত দেহে জমিদারের টাকার থলিটা বাঁচাইল বটে; কিন্তু অচিন্তিত দুর্দৈবের হাত হইতে তাহার একমাত্র নয়নের মণি হারাধনকে বাঁচাইতে পারিল না। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ সড়কির ফলা আসিয়া কচি দেহটি বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—একটা ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে পড়িয়া তাহার সেদিকে হয়ত খেয়ালই ছিল না। একবার মাত্র 'বাবা' বলিয়াই হারাধন পিতার পৃষ্ঠদেশে নেতাইয়া পড়িল। তাজা গরম রক্তের প্রবল ধারায় কালুর কাপড়খানা রাঙাইয়া উঠিল।

কালু সর্দার অপলক চোখে মৃত পুত্রের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। চোখ তাহার শুষ্ক, মুখে একটা গম্ভীর ভাব—অতলস্পর্শ সীমাহীন সমুদ্রে ঝড়ের পূর্বকার শুব্ধ ভাবেরই মতন বুঝি তাহা ভয়ঙ্কর!

কিছু সময় এইভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর কালু তাহার সঙ্গীদের নাম ধরিয়া ডাকিল। কিন্তু সেই ডাক মাঠের বুকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া অতল অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, সাড়া আর আসিল না। তারপর পুত্রের শিথিল শীতল মৃত-দেহটি বুকের উপর তুলিয়া লইয়া একাকীই আগাইয়া চলিল।

একে অন্ধকার আকাশ। তাহার উপর হঠাৎ অধিকতর পুরু আর একটা বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের কালো আবরণ পড়িয়া নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর ভৈরবের বক্ষ মথিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তথায় ভাদ্রের সীমাহারা কূলপ্লাবী অগাধ জলরাশি। আবর্তের পর আবর্তের প্রতিঘাতে তাহার উপকূলবর্তী এই পথটিও বিধ্বস্ত। হৃদয়ের তীব্র বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া কালু যখন পুত্রের দাহকার্য সমাধা করিল, সুদূর হইতে একটা বাজপক্ষীর উচ্চকণ্ঠ জানাইয়া দিল—রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর।

ষ্টীমার ষ্টেশন।

যাত্রীপূর্ণ ষ্টীমার ততক্ষণ স্রোতের অনুকূলে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পরের ষ্টীমারটা কাল সেই সকাল ছ'টায়। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়া দিয়াছে অথচ নিকটে কোথায়ও থাকিবার মতন তেমন সুবিধাও তাহার নাই যে রাত্রিটা সেখানে কাটাইয়া দেয়। সর্দার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সহসা খানিকটা দূরে পথের সংলগ্ন একটা বাড়ীতে আলোর ক্ষীণ-রশ্মি দেখিয়া কালু সেদিকেই আগাইয়া চলিল। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, তাহার মধ্যে মিট মিট করিয়া একটা তেলের বাতি জ্বলিতেছে, মনে হয় যেন লোকও সেখানে আছে। আস্তে আস্তে সে ডাকিল,—"ঘরে কেউ আছ ?"

প্রথম দু-এক ডাকে তো সাড়াই মিলিল না। পরে একটু রুক্ষকণ্ঠে উত্তর আসিল,— এত রাত্রে এই ভরা গাঙে আর পাড়ি ধরি না।"

কালু বুঝিল,—বাড়ীর মালিক ওই ঘাটেরই একজন পাটনী।

—"পারে যেতে চাই না, একটু আশ্রয় চাই। নড়াইল জমিদার বাবুদের আমি বরকন্দাজ, সকালের ষ্টীমারে যশোর যাব।"

বাবুদের নামে এত রাত্রিতেও সে ওখানে একটু আশ্রয় পাইল।

পরের দিন প্রাতেই জমিদারের কানে এই দুর্ঘটনা উঠিল পলায়িত হিন্দুস্থানী দরোয়ানটির মুখে। টাকার ও কালুর দুশ্চিন্তায় বাবুরা উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে থানায় রিপোর্ট গেল, জরুরী টেলিগ্রাম পৌছিল সদরে কালেক্টর সাহেবের কাছে। ঘণ্টাকয়েক পরে তারের উত্তর আসিল, কালু সর্দারের মারফৎ জমিদারের মালগুজারি—সরকারী মালখানায় যথাসময়ে নিয়মিতভাবে জমা হইয়া গিয়াছে। সংবাদটি পাইয়া জমিদার দুশ্চিন্তার হাত হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

দিনের পর রাত আসে আবার আসে দিন, কিন্তু কালু আর ফিরিয়া আসে না। সংবাদপত্র ও লোকের সাহায্যে জমিদারের অক্লান্ত চেষ্টা চলিল তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল!

তাহার পর কত শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের মধ্য দিয়া মাস, মাসের পর বৎসরও চলিয়া পড়িয়াছে কালের কোলে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত জমিদার নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কালুর আর কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না!

তিন বছর পরের কথা। ভৈরব নদের সেই ছোট্ট জাহাজ ঘাটটির পাড়ে এক শীতের রাত্রে অবতরণ করিল অজয় ও মেনকা। কোলে তাহাদের দুই বৎসরের একটি শিশুপুত্র।

অজয় এই অঞ্চলেরই লোক। পাঁচ বছর পরে সে কর্মস্থল হইতে দেশে ফিরিতেছে—বাড়ী তাহার লঙ্কাচর মাঠের ওপারে।

ঘাটের উপরেই একটা বুড়া অশ্বথ গাছ। নিম্নে তাহার দুই-তিনটি প্রজ্জলিত আগুনের কুণ্ড। কতকগুলি লোক তাহার চতুর্দিকে বসিয়া হাসি-গল্পে সময় কাটাইতেছে। অদূরে যে সব ছোট ছোট অস্থায়ী কুঁড়ে-ঘর দেখা যায়, বোধ করি ঐগুলি গাড়োয়ানদেরই বস্তি।

গ্রামে পৌঁছিতে অন্য কোনরূপ যান-বাহনাদির ব্যবস্থা সেখানে নাই। তাই গরুর গাড়ীর আড্ডায় গিয়া অজয় গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিলে কোনো গাড়োয়ানই সম্মত হইল না। সকলেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল,—"না কত্তা, গায়ে আমাদের অতো তাকত নেই। যে ডাকাতের মাঠ সে, দিনের বেলায়ই যেতে গা কেঁপে ওঠে, আর এখন তো রাত!"

মেনকা বলিল,—"কি ক'রবে এখন, আমার যে বড্ড ভয় ক'রছে?"

অজয় একটু হাসিয়া বলিল,—"ডাকাতি—হেঃ হেঃ! যত সব বাজে কথা। রাত্রিতেই যাব। নইলে এখানে থাক্‌বে কোথায়? তাছাড়া এই কন্‌কনে শীত, খোলা মাঠে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছেলেটা যে বাঁচবে না! দেখছ না, এরই মধ্যে ও তোমার কোলে কাঁপ্‌তে শুরু ক'রেছে?"

অতীত পাঁচ বছর এ অঞ্চলের খবর অজয় রাখিত না। নিকটেই যে সামান্য দু-চার ঘর পরিবার লইয়া একটা বিরল বসতি আছে তাহাতে বাস করে দুলে ও বাগ্দী-শ্রেণীর ছোট জাত। একে তাহাদের শিক্ষার অভাব—তাহার উপর দারিদ্র্যের কশাঘাতই ইহাদিগকে হীন চৌর্য্যবৃত্তি সুযোগ পাইলে ধন-রত্নের বিনিময়ে মানুষের জীবনকেও বিপদাপন্ন করিয়া তুলিতে শিখাইয়াছে। পথিকের ধন-সামগ্রী লুণ্ঠন, কখনও বা বাধাদানে নিহত করা—এরূপ সংবাদ গল্পেরই মত সে যখন চাকুরীর পূর্বে গ্রামের বাড়ীতে থাকিত তখন লোকের মুখে শুনিয়াছে। তাই মনে হয় না যে সেখানে কোথাও থাকা আজ তাহাদের পক্ষে নিরাপদ।

অনেক বলিয়া কহিয়া বক্‌শিসের লোভ দেখাইয়া শেষ পর্যন্ত অজয় একজন কম বয়সী বলিষ্ঠ গাড়োয়ানকে সম্মত করাইল। বিদেশী এই গাড়োয়ানের গায়ে শক্তি আছে এবং সাহসও আছে প্রচুর, সর্বোপরি বক্‌শিসের লোভে কাহারও বাধা না মানিয়াই সে রাজি হইয়া গেল।

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা।

কিছুদূর যাইতেই মেনকা বলিল,—"ওই ঘণ্টাগুলো খুলে ফেল্‌তে বল।

কে জানে ওর শব্দ শুনে হয়ত ডাকাতেরা দূর থেকেও আমাদের সন্ধান পেতে পারে।”

চাঁদের আলোয় অলস মন্থর-গতিতে গরুর গাড়ী লোকালয় ছাড়িয়া যে বিস্তৃত মাঠটায় আসিয়া পড়িল,—সেইটাই লঙ্কাচরের মাঠ।

দিক্-প্রসারিত ফাঁকা মাঠ।

পথের বর্তমান বিপদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও অন্যান্য লোকের মুখে ডাকাতির কথা শুনিয়া পথিক ও চালক একটু ভয়ে ভয়েই চলিয়াছে। সুউচ্চ পথের নিম্নে দুই ধারে কলাই ও যবের ক্ষেত। হিমের ভারে উন্নত গাছগুলি নব-বধূর মত ঘোম্‌টা টানিয়া লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আনত শীর্ষগুলির ডগায় শিশিরের ফোঁটা ফোঁটা জল চন্দ্রালোকে মনে হয় যেন মুক্তার নোলকের মতন দুলিতেছে। কদাচিৎ শস্যপূর্ণ সমতল প্রান্তরের মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আহার সন্ধানে মত্ত একাধিক বন্য বরাহের বিকট গোঙানি, কখনও বা শূন্যে নিশাচর পেঁচকের কর্কশ কণ্ঠ ও ডানার ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিয়াই অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তাহাদের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে!

আরও কিছুদূর এইভাবে চলিবার পর শুক্লা-পঞ্চমীর চাঁদের আলো ম্লান করিয়া দিয়া অন্ধকার মাঠের বুকে নামিয়া আসিল।

অজয় গাড়ীর ভিতর বসিয়া বসিয়া তরল অন্ধকারে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিজের ও মেনকার বুকের ভারটাকে কিঞ্চিৎ লঘু করিবার জন্যই তাহার সহিত নানারূপ হাসি-তামাসা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অজয়ের হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মেনকাও সেইদিকে তাকাইয়া বলিল,—“ওগো শুন্‌ছো, যদি সত্যি সত্যি কিছু ঘটে যায়, তাহ’লে কি হবে?”

—“কি ঘটবে?”

—“ঐ ডাকাত!”—

বাধা দিয়া অজয় বলিল,—“পাগল!”

অদূরে পথের ধারে একটা মরা খেঁজুর গাছের ঝোপ দেখাইয়া দিয়া মেনকা বলিল,—"দেখ্‌ছ না, কে ওই দাঁড়িয়ে র'য়েছে ?"

বলিয়াই মেনকা আঁতকাইয়া উঠিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া অজয়ের গলা এমনভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, অজয় আর হাসিয়াই বাঁচে না।

হাসি শুনিয়া মেনকা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"কি মানুষ তুমি গো, এতে হাসি ? অন্ধকারে ওটা দেখ্‌লে মানুষ ব'লে কার না মনে হয়, বল তো ?"

অজয় বলিল,—"আত্মরক্ষার জন্য তুমি এত ব্যস্ত যে ছেলেটাকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলে। গলাটা ছাড় তো একবার।"

—"না, ছাড়ব না। আমার বুঝি ভয় করে না ?"

অজয় হাসিয়া বলিল,—"আমার গলা ধরে থাক্‌লেই কি ভয়, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে ? দুষ্টু!"

—"যাবেই তো।"

—"কিন্তু গাড়োয়ানটা দেখে ফেল্‌লে কি ভাব্‌বে বল তো ?"

—"কি আর ভাব্‌বে ? ভাব্‌বে, বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভাব্।"

ছেলেটা তখন জাগিয়া উঠিয়া মায়ের কোলে বসিয়া খেলিতে শুরু করিয়া দিল।

অজয় বলিল,—"তোমার চেয়ে দেখ্‌ছি মণ্টুর সাহস ঢের বেশী।"

—"তা' হবে না, ছেলে কার ? নির্ভীক তো হবেই! অচেনা, অজানা মুখ দেখলেও ওর ভয় করে না! তার কোলে ঝাঁপিয়ে ওঠে। দু-বছরের ছেলে কুকুর-বেরালের সঙ্গে খেলা করে! নতুন হাঁটতে শিখে জলে-জঙ্গলে, আঁধারে যেতেও যে ভয় পায় না, তা' কি তুমি জান না ?"

সুদীর্ঘ মাঠ আর ফুরাইতে চায় না। অন্ধকারে দৃষ্টি হারাইয়া যায়। কোথায় যে ইহার শেষ হইয়াছে ঠাওর করিবার উপায় নাই। লক্ষাচরের মাঠের মধ্যস্থলে একটা বহুদিনের পরিত্যক্ত দীঘি আছে। সংস্কার অভাবে

চতুঃপার্শ্ব তাহার অশ্বথ, পাকুড়, তাল, বেতস্ ও নানাজাতীয় জংলা গাছে সমাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো ভয়ে সেখানে প্রবেশ করে না। এমনই ঘন বনে সে স্থানটা আচ্ছাদিত।

নীরব, নিথর রাত্রি। অন্ধকার ক্রমশঃ সূচীভেদ্য হইয়া উঠিতেছে! শীতের আকাশ থম্‌থম্ করিতেছে। সেই ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে এক অজ্ঞাত ভয়ে মেনকার গা-টা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল!

মেনকা বলিল,—"আর কতদূর গো?"

হঠাৎ একটা অজ্ঞাত মানুষের মুখ হইতে উচ্চ—বিকট—বীভৎস হাসির হাঃ, হাঃ শব্দ সেখানকার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া উত্তর দিল,—"আর দূর নাই!"

মেনকা অজয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ও মা!"

গাড়ী তখন দীঘির মাঝামাঝি পথে আসিয়া পড়িয়াছে।

অজয়ের মুখে আর কথা যোগাইল না! আসন্ন বিপদের বিভীষিকায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিল। কোথায়ও কিছু দেখিতে পাইল না।

কিন্তু পর মুহূর্তেই কতকগুলি ভারী পদ-শব্দ শোনা গেল। কাহারা যেন দ্রুত-পদে এদিকেই অগ্রসর হইতেছে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অজয় বৃথাই দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

অনাগত বিপদের দুশ্চিন্তায় নির্বাক অজয়ের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল! শেষে কি-না স্ত্রী-পুত্রকে ডাকাতের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে!

পিছন ফিরিয়া গাড়োয়ান ডাকিল,—"বাবু?"

অজয় উত্তর করিল,—"শুনেছি, জোরে হাঁকাও!"

গাড়োয়ানের কণ্ঠ তখন মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করিতেছে। গলা হইতে শব্দ আর বাহির হইতে চাহে না!

সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আর বিদ্যুৎ প্রবাহের মতই

মরণের অগ্রদূতেরা খড়্গ হাতে হানা দিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল,—"সামাল যাত্রী !"

ডাকাতদের ভীষণ কণ্ঠস্বরে সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

নিশুতি-রাতে জনমানবহীন সেই লক্কাচর প্রান্তরের বুক অসহায় যাত্রীদের মর্মভেদী করুণ আর্তনাদে মুখর হইয়া উঠিল। গাড়ীর উপর হইতে প্রাণভয়ে ভীত গাড়োয়ান লাফাইয়া পড়িল পথের নীচে; কিন্তু মমতাহীন হিংস্র ডাকাতের নির্দয় অস্ত্রের মুখ হইতে সে রেহাই পাইল না। মুহূর্তে মাথাটি তাহার একটি মাত্র আঘাতেই দেহ ছাড়িয়া একটু দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল!

দস্যু-সর্দারের বড় সাক্‌রেদ মোঙ্‌লার হাতের প্রজ্বলিত মশালের তীব্রতায় আলোকিত মাঠের মর্মস্পর্শী এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যে মেনকা মণ্টুকে বুকে চাপিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল!

সবল হাতের দু-টানেই গাড়ীর টিনের আচ্ছাদন ঝন্-ঝন্ শব্দে খুলিয়া ভাঙিয়া পড়িল। মশালের আলোর জ্যোতিঃ খড়্গের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া সূর্য-কিরণের মতই চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। টাট্‌কা রক্তের ধারা তখনও বহিয়া পড়িতেছে তাহার গা দিয়া। কম্পমান অজয় ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে ডাকাতের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল,—"কে? কালু! তুমি...."

এর বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

কালুর শ্রুতি-শক্তি তখন এক অতীত স্নেহের প্রবাহে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের কথায় সাড়া দিবার মত জ্ঞানও আর তাহার নাই।

অকস্মাৎ তাহার উত্থিত খড়্গ শিথিলভাবে নামিয়া আসিতেই বিস্ময়াভিভূত মোঙ্‌লা দেখিতে পাইল—ছোট্ট শিশুটির পানে নিবদ্ধ দৃষ্টি সর্দারের চক্ষু অশ্রু-বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অস্ত্রের সন্ধান বরাবরই লক্ষ্যভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোনো দিন কোনো কারণেই ব্যর্থ হয় নাই—আজ তাহার এমন কেন হইল?

কালু তখন উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল,—"ওরে মোঙ্‌লা, আমার হারাধনকে—ফিরে পেয়েছি।—আমার হারাধন—হারুরে...."

মোঙ্‌লা বলিল,—"সে কি সর্দার! পাগল হ'লে নাকি?"

— ওরে না রে না, পাগল হইনি। দেখ্‌ছিস না, অবিকল সেই মুখ!"

সহসা অত বড় শক্তিশালী হিংস্র দানবের হাত দুইটি কাঁপিয়া উঠিল—ছোট্ট একটা শিশুর সম্মুখে। মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে খড়্গ কোন এক সময় মাটির উপর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রবল রক্ত-পিপাসা—মুহূর্তে যেন কোথায় উড়িয়া গেল। পাহাড়ের বুকে একটা খরস্রোতা ঝরণার মতই স্নেহের শতধারা তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বহিয়া চলিল একটা অতীত স্মৃতির উদ্দেশে।

আপনার অজ্ঞাতে দুর্দান্ত ডাকাতের রক্তমাখা হাত দুইটি কম্পিত আগ্রহে মণ্টুর দিকে আগাইয়া গেল।

দানবের এই আকস্মিক ভাব্‌বিকার লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুভয়ে নির্জীব অজয়ের প্রাণে সাড়া আসিল। পাশেই সংজ্ঞাহীনা মেনকার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া অজয় মণ্টুকে ডাকাতের প্রসারিত হস্তে তুলিয়া দিল। কোলে উঠিয়াই সর্দারের গলার কণ্ঠীগাছ লইয়া মণ্টু খেলিতে খেলিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। উৎক্ষিপ্ত সে হাসির ঝরণায় পুত্রহারা পিতার স্নেহ বুভুক্ষু হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

মণ্টু অজয়ের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"বা—বা—বা!"

শিশু কণ্ঠের সেই আধ আধ ডাক সর্দারের কানে অমৃতের পরশ বুলাইয়া দিল। হারাধনও একদিন এমনি করিয়া ডাকিয়াছে। তারপর কোথা হইতে যেন কি হইয়া গেল!

সাহস পাইয়া অজয় বলিল,—"আমাদের ছেড়ে দাও সর্দার। আমাদের সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ কিছু নেই, যা' আছে আমি নিজে হাতে তোমায় তুলে দিচ্ছি।"

কালু খানিকক্ষণ অজয়ের দিকে চাহিয়া পরে মোঙ্‌লাকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে জল নিয়ে আয়, মা আমার ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে!"

কালু সর্দারের বুকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মতই যে করুণার

নির্ঝরিণী লুকাইয়া ছিল, মোঙলার সাকরেদী-জীবনের এই কয় বছরে তাহাকে দেখিয়া ইহার বিন্দু-বিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। তাই আশ্চর্য হইয়া একবার সর্দারের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার আদেশ পালন করিতে গেল।

মণ্টু আবার ডাকিয়া উঠিল,—"বা—বা—বা!"

কালু, মণ্টুকে জোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। যেন সেই কতদিনকার পলাইয়া যাওয়া বুকের নিধি—মাতৃহারা সেই হারাধনকে আজ তাহার অতৃপ্ত বক্ষে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে!

মেনকা চোখ মেলিয়া চাহিতেই কালু সর্দার বলিল,—"মা, তুই ভয় পাস্‌নি। আমিও তোর ছেলে।"

—শেষ—

